

নারায়ণ সান্যাল

প্রবীণ প্রাকার্ষিক



ভারতীয় ভাস্কর্য

মি থু ন

নারায়ণ সান্যাল

বেঙ্গল পাবলিশাস প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : অগস্ট, ১৯৮০

এই গ্রন্থের রচনাকাল : ১৯৭৬—১৯৭৯

(C) শ্রীতীর্থরেণু সান্যাল

প্রকাশক :

মৈনাক বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কলিকাতা—৭০০০৭০

মুদ্রক :

শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত

ভারত ফোটোটাইপ কুর্টিডও

৭২/১, কলেজ স্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০৭০

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

[চিত্র : ২৭ এবং চিত্র : ২৮ শিল্পী শ্রীইন্দ্র দুগারের আঁকা । গ্রন্থের
অন্যান্য চিত্র লেখক কর্তৃক অঙ্কিত ।]

দাম ৯ পঁচিশ টাকা

শিল্পায়মিক

শ্রীদ্বিজেন্দ্র মৈত্রকে --

•

সূচীপত্র

এক : প্রস্তাবনা	১
দুই : প্রাচীন সভ্যতার শিল্পচেতনায় যৌনতত্ত্ব	৪
তিন : কেন মিথুন ?	১০
চার : লীসন-এর আর্টটি যুক্তি	১৪
পাঁচ : আরও তিনটি সম্ভাব্য যুক্তি	২০
ছয় : কলিঙ্গ স্থাপত্য-উদ্ধৃতির বিবর্তন ও মিথুনবাদ	২৭
সাত : আমাদের কলিঙ্গ-সমীক্ষা	৩৩
আট : যুগলমূর্তি	৪১
নয় : উত্তেজিত মিথুন	৫০
দশ : শৃঙ্গাররত মিথুন	৫৬
এগারো : পাশ্চাত্য-শিল্পে : ন্যূড	৬৩
বারো : মৈথুনরত মিথুন	৭৯
তের : খাজুরাহোতে মৈথুনবাদ	৯১
চৌদ্দ : যৌথ-যৌনাচার	১১০
পনের : মৈথুনবাদ কি অগ্নীল ?	১১৬

চিত্রসূচী

চিত্র	পৃষ্ঠা	বিষয়	চিত্র	পৃষ্ঠা	বিষয়
১	৫	প্রাগৈতিহাসিক মিথুন	২৮	৫৩	উত্তেজিত মিথুন, কোনার্ক
২	৬	পুরুষ-দেহকাণ্ড, হড়প্পা	২৯	৫৪	হরপাৰ্বতী, পরশুরামেশ্বর
৩	৭	মাতৃমূর্তি, প্রাগৈতিহাসিক	৩০	৫৪	ঐ, পার্শ্বনাথ, খাজুরাহো
৪	৭	ভূদেবী, মিশর	৩১	৫৫	ঐ, খিচিং, উড়িষ্যা
৫	৭	ঐ, মেসোপটেমিয়া	৩২	৫৫	অর্ধনারীশ্বর, ঐ
৬	৭	ঐ, সিরিয়া	৩৩	৫৬	শৃঙ্গাররত মিথুন, আহিওল
৭	৮	নারীমূর্তি, মোহেন-জো-দাড়ো	৩৪	৫৭	ঐ, কোনার্ক
৮	৮	মথুরাযক্ষী	৩৫	৫৮	ঐ, ঐ
৯	৯	সংচাঁ-বৃক্ষিকা	৩৬	৫৯	ঐ, ঐ
১০	৩৯	বোনতা ও কালের ক্রম, কলিঙ্গ	৩৭	৫৯	ঐ, ঐ
১১	৪১	যুগলমূর্তি, ভারত	৩৮	৬০	ঐ, ঐ
১২	৪১	ঐ, উদয়গিরি	৩৯	৬১	চুয়নরত, ঐ
১৩	৪২	ঐ, সংচাঁ	৪০	৬১	ঐ, ঐ
১৪	৪২	রাজা-রাণী, উদয়গিরি	৪১	প্রেট—I	এ্যাপোলো, ক্রিটিয়াস
১৫	৪২	ঐ, অজন্তা	৪২	"	লিওনার্দো, নোটবুক
১৬	৪৩	কার্লে-দম্পতি	৪৩	"	এ্যাপোলো, পলিক্রিটাস
১৭	৪৩	যক্ষ-মিথুন, ভুবনেশ্বর	৪৪	"	এ্যাসকুইলিন ভেনাস
১৮	৪৫	কিন্নর মিথুন, কোনার্ক	৪৫	"	আদিমতম এ্যাপোলোমূর্তি
১৯	৪৬	পুরুষ-প্রতীকী রেখদেউল	৪৬	"	ক্রিডিয়ান ভেনাস
২০	৪৭	স্ত্রী-প্রতীকী পীড়দেউল	৪৭	প্রেট—II	শায়িতা ভেনাস, জর্জনে
২১	৪৮	রেখ-পীড় মিথুন	৪৮	"	ঐ, ঐ, টিশিয়ান
২২	৪৮	কাথর-দেউল, কলিঙ্গরীতি	৪৯	"	যৌথবলাংকার, গ্রীকশৈলী
২৩	৫০	উত্তেজিত-মিথুন, আহিওল	৫০	প্রেট—III	গ্রেসেরী, বুবেল
২৪	৫০	ঐ, ঐ, ঐ	৫১	"	মাস' ও ভেনাস
২৫	৫১	ঐ, ব্রহ্মেশ্বর, ভুবনেশ্বর	৫২	"	ঐ
২৬	৫১	ঐ, ঐ, ঐ	৫৩	প্রেট—IV	ভৃঙ্গার, দঃ আমেরিকা
২৭	৫২	ঐ, লিঙ্গরাজ, ঐ	৫৪	"	স্থিত : স্থিতল আসন

চিহ্ন	পৃষ্ঠা	বিষয়	চিহ্ন	পৃষ্ঠা	বিষয়
৫৫	প্লেট—IV	বলাৎকার, গ্রীকশৈলী	৭০	৯৫	উত্তেজিত-মিথুন, লক্ষণ, খাজুরাহো
৫৬	"	উগ্রানবন্ধ, নাগর	৭৪	৯৫	ঐ, পার্শ্বনাথ, ঐ
৫৭	৬৬	প্রমাণেরা, বস্তুচেন্নী	৭৫	৯৬	পুষ্পধন্যা, খাজুরাহো
৫৮	৬৭	ভেনাসের জন্ম, ঐ	৭৬	৯৬	অভিসারিকা, ঐ
৫৯	৭০	কাসিনার যুদ্ধ, মিকেলান্জেলো	৭৭	৯৭	সীমাস্তনী, ঐ
৬০	৭২	মহাপ্রাচীন, মিকেলান্জেলো	৭৮	৯৭	কবরীবন্ধনরতা, ঐ
৬১	৭৩	পিতাপুত্রকে ঐ	৭৯	৯৯	রণক্লান্ত সেনাদল, ঐ
৬২	৭৩	পুত্রপিতাকে, ঐ	৮০	৯৯	আলিসনবন্ধ মিথুন, ঐ
৬৩	প্লেট—V	ডেভিড, মিকেলান্জেলো	৮১	৯৯	চুষন-তৃষিতা, ঐ
৬৪	"	লা সূর্য, আগর	৮২	১০০	যৌনতা ও কালের
৬৫	৮৪	ভারতশিল্পে চীনাচারের			ক্রম, খাজুরাহো
		প্রবেশ	৮৩	১০১	বেঙ্জীয় বিন্যাস, লক্ষণ
৬৬	৮৬	বল্লসত্ত্ব ও হেবল্ল, তিব্বত	৮৪	১০২	ঐ, বিশ্বনাথ
৬৭	৮৬	ঐ ঐ	৮৫	১০৩	ঐ কাণ্ডারীয়
৬৮	৯১	কাণ্ডারীয় মহাদেও, প্যান	৮৬	১০৭	যৌথযৌনাচার ঐ
		ও স্কোচ, খাজুরাহো	৮৭	১১৮	ঘাসের উপর ভোজ, মানে
৬৯	৯২	শালভজিকা, লক্ষণ, খাজুরাহো	৮৮	১১৯	প্যারিসের বিচার, রাফায়েল
৭০	৯৩	বংশীবাদিকা, বিশ্বনাথ, ঐ	৮৯	১২০	Fete Champetre জর্জনে
৭১	৯৩	কণ্টকমোচনরতা, পার্শ্বনাথ, ঐ	৯০	১২৩	পশুমেথুন, ইরোটিকা
৭২	৯৪	প্রতীকারতা, কাণ্ডারীয়, ঐ	৯১	১২৪	প্যান ঐ ঐ

এক

॥ প্রস্তাবনা ॥

ভারতীয় মন্দিরে, বিশেষ করে খাজুরাহো এবং কলিঙ্গের নাগর-দেউলে অবস্থিত মিথুন মূর্তিগুলির সঙ্গে বোধকরি মিশরীয় পিরামিডে সম্মুখস্থ স্ফিংস্-এর তুলনা করা চলে। আরতনে সমান না হলেও সংখ্যাধিক্যে এই মিথুন-মূর্তিগুলি একইভাবে দর্শকে আকৃষ্ট তথা অভিভূত করে। কিন্তু তুলনার মূল সেখানে নিহিত নয়—উভয়ক্ষেত্রেই ঐ অনুপম শিম্পসৃষ্টিগুলির উপস্থিতির হেতু চির-রহস্যাবৃত। কেন ওরা ওখানে আছে, কী ওদের বস্তুব্য, তা কেউ অনুমান করতে পারে না। তফাৎ এই যে, স্ফিংস্-এর সৃষ্টিকর্তা কয়েক সহস্র বছর ধরে দর্শকদের প্রশংসা-বাক্যই শুধু শুনছেন, অপরপক্ষে ভারতীয় ভাস্করের ক্ষেত্রে নিন্দা ও প্রশংসা বর্ষিত হয়েছে সমান অনুপাতে। এই মিথুনমূর্তিগুলির তথাকথিত অশ্লীলতার বিষয়ে বাগবিস্তার তো বড় কম হয়নি—অস্তুত গত দেড়শ বছর ধরে। নব্য ভারতের একজন সর্বভারতীয় জননেতা একবার ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন—পুরী ও কোনার্কের মন্দিরের ঐ অশ্লীল মূর্তিগুলি ভেঙ্গে ফেলা উচিত। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সেই বিবৃতিপাঠে শিম্পাচার্য নন্দলাল লিখছিলেন, “কিছুকাল পূর্বে পুরী ও কোনার্কের মন্দিরের বহির্ভূতস্থিত বদ্ধকাম (ঐগুলিকে দুর্নীতিপূর্ণ না বলে আদিরসাত্মক বলা উচিত। শিম্পবস্তুর শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নীতির দিক থেকে নয়, রসের দিক থেকে। রসের ব্যাভিচার ঘটলেই শিম্পের পক্ষে তা ‘দুর্নীতি’। রসের ব্যাভিচার ঘটিলে ‘শিম্প’কে সামাজিক সুনীতি প্রচারের কাজেও লাগানো যায়। যথার্থ শিম্পসৃষ্টি তা নয়) মূর্তিগুলি নষ্ট করবার কথা হয়েছিল। সাংঘাতিক প্রস্তাব। ঐগুলি গেলে শিম্পসৃষ্টির কতগুলি শ্রেষ্ঠ নিদর্শনই চলে যায়। নিশ্চয় করে বলতে পারিনে, পুরী-কোনার্কের ভাস্কর শিম্পী কেন এমন বিষয় নির্বাচন করেছিলেন। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। মানুষের জীবনে যে নবরসের লীলা এটি তার অন্যতম রস—আদি রস। এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, রসসৃষ্টি হিসাবে মূর্তিগুলি খুবই উচ্চশ্রেণীর।” ১

বহুত গত দেড়শ বছর ধরে এ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। বাঙালয়, ইংরাজীতে, অন্য বিদেশী ভাষায়। বহু নিন্দা ও প্রশংসা-বাক্য আমরা শুনেছি। তবু আমার মনে হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে একটা সার্বিক আলোচনার প্রয়োজন এখনও আছে। পাঠক আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন, আমার মনে হয়েছে—বৈজ্ঞানিক এবং নৈর্ব্যক্তিক নিষ্ঠায় ‘মিথুনবাদ’কে ঠিকমতো যাচাই করা হয়নি, না বাঙালয়, না ইংরাজীতে। ধরুন একটা শব্দ : ‘মিথুনমূর্তি’—যা আমাদের আলোচনার মৌল উপাদান তার উপযুক্ত সংজ্ঞার্থ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয়নি। যে কোন বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার প্রতিটি পারিভাষিক শব্দের সুনির্দিষ্ট অর্থ থাকার প্রয়োজন। সমকোণী ত্রিভুজ, পরমাণু, আলো-বছর অথবা $\sqrt{-১}$ বলতে আমি যদি এক রকম বুঝি, আপনি অন্যরকম বোঝেন তাহলে বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা সম্ভবপর নয়। স্বীকার করাছি, ‘চারুশিম্প’ জিনিসটাকে সবসময় বৈজ্ঞানিক সুনির্দিষ্টতায় সীমাবদ্ধ করা যায় না—তার অনেকটাই ‘সাব্জেক্টিভ’ বা ব্যক্তিগত বুদ্ধি বা অনুভূতির উপর নির্ভরশীল, তবু ‘শিম্প-আলোচনা’ পরিভাষার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ বা ডোফিনিশান থাকবে না কেন? $\sqrt{-১}$, ঈশ্বর, অলোক-তরঙ্গ, এমনকি পরমাণুও তো পণ্ডিত্রিয়-গ্রাহ্য সত্তা নয়, তার উপলব্ধি আমাদের মননে, আমাদের ধী-শক্তি—তাহলে শিম্প-ব্যবহৃত শব্দগুলিও বৈজ্ঞানিক সুনির্দিষ্টতায় বাঁধা যাবে না কেন? একটা উদাহরণের মাধ্যমে বস্তুটা বোঝাবার চেষ্টা করি :

শিল্প-প্রবন্ধে কোনও লেখক যখন এই ‘মিথুন-মূর্তি’ শব্দটি ব্যবহার করলেন তখন হয়তো তিনি বোঝাতে চাইলেন— দুটি পাশাপাশি দাঁড়ানো অপ্রগল্ভ নরনারী (চিত্র—১৬),—হ্যাঁ, তারা ‘মিথুনমূর্তি’ তো বটেই, অথচ আমি পাঠক, আমার মানসপটে হয়তো ভেসে উঠল খাজুরাহোতে দেখা দুটি স্ত্রী-পুরুষের ঘনিষ্ঠতম দৈহিক সঙ্গমদৃশ্য (চিত্র—৫০) ; আচ্ছ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, তারাও ‘মিথুন’। ফলে লেখক তাঁর প্রবন্ধে যে বিশেষণগুলি ব্যবহার করেছেন তা আমার কাছে অসঙ্গত মনে হতে পারে। লেখক ও পাঠক মননের এক সমতলে দাঁড়াতে পারলেন না, ভুল বোঝাবুঝি হল—এবং তা হল এই শব্দটির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ নির্ধারিত না থাকায়। পাশাপাশি দাঁড়ানো স্ত্রী-পুরুষের যুগলমূর্তি থেকে যৌনসম্ভোগরত নারী-পুরুষ, এমনকি কামকৌরুরত একাধিক নরনারীর যৌথ যৌনাচারদৃশ্যকেও পূর্বাচার্যরা এই একটি মাত্র শব্দের দ্বারা সূচিত করছেন : মিথুনমূর্তি। এভাবে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা হয় না। শিল্পীর কাছে সৃষ্টির সময়ে এই সুনির্দিষ্ট পরিভাষা হয়তো নিম্প্রয়োজন, কিন্তু শিল্প-সমালোচকদের কাছে বাগর্থ সম্পৃক্ত হওয়ার নিত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ শিল্পী ভাষার বেসীতি করেন না, তাঁর ভাব-বিনিময়ের মাধ্যম রঙ ও রেখা ; অপর পক্ষে শিল্প-সমালোচক সেটিকে তোল করতে চান ভাষার তুলাদণ্ডে। মুশ্কিল হচ্ছে এই যে, বাঙলা তো নয়ই এমন কি ইংরাজী নিবন্ধেও ফাগু’সন, হ্যাভেল, কানিংহাম, কুমারস্বামী থেকে শুরু করে স্টেলা ক্রামারিশ, ডঃ মুলক্রাজ আনন্দ পর্বস্ত কেউই মিলন দৃশ্যগুলির রূপধারণকে বোঝাতে, তাদের যৌনতার মাত্রার পরিমাণ সূচক বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। ইংরাজি প্রবন্ধে এই *mithuna* শব্দটির বিশেষণ হিসাবে *amorous*, *thyphallic*, *orgiastic*, প্রভৃতি শব্দ স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট অর্থে নয়। ফলে এই সব প্রগাঢ় পণ্ডিতেরা তাঁদের প্রবন্ধে যে নিম্না বা প্রশংসা-বাক্য প্রয়োগ করেছেন তা কখন কোন্ জাতের মিথুনকে উদ্দেশ্য করে বলা তা সব সময় বুঝে ওঠা যায় না।

দ্বিতীয়ত আমার মনে হয়েছে, কোন কোন পূর্বসূরী যখন মিথুনমূর্তিগুলির বৌদ্ধিকতার সন্ধান করেছেন তখন একথা সচেতন ভাবে চিন্তা করে দেখেননি যে, এই শিল্প অনুভাবনার কালের ব্যাপ্তি সহস্রাধিক বৎসর, এর ভৌগোলিক ব্যাপ্তি একটি উপমহাদেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। এমন একটি বিশাল, ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী শিল্প অনুভাবনাকে বিচার করতে বসে একটি বা দুটি হেতু আরোপ করা সঙ্গত নয়। কালের সঙ্গে যুগ-চেতনা, দেশের সঙ্গে আঞ্চলিক শিল্পবোধ, সামাজিক অবস্থা, ধর্মচেতনা, রাজশক্তির রুচি ও মানসিকতা প্রভৃতি নিয়ত পরিবর্তনশীল এমন কতকগুলি বিষয় শিল্পের সঙ্গে অঙ্গান্বীভাবে সম্পৃক্ত যে, ‘মিথুনবাদ’কে বুঝে নিতে হলে, ব্যাখ্যা করতে হলে, তার ধারাবাহিকতাটিকে বিচার করতে হবে—হয়তো ভিন্ন যুগে, ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে, ভিন্নজাতের রাজশক্তির মানসিকতার তার বিভিন্ন প্রেরণা ছিল। ছিল, কি ছিল না, তা বুঝে নেবার উপায় : এই বিবর্তন ধারাটিকেই প্রথমে তোল করে দেখা।

তার পূর্বে একটি প্রয়োজনীয় বক্তব্য রাখি। ভারতীয় মন্দিরের এই সব বহুকাম মূর্তিগুলির সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত শিল্প আলোচনা করতে হলে প্রথম কাজ হচ্ছে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ উদ্ভাবন করে বাগর্থকে সম্পৃক্ত করা। তাই পরবর্তী অংশে বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত মিথুন-মূর্তিকে বোঝাতে আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করব, বিশেষ বিশেষ অর্থে। যথা :

- ১) **যুগল-মূর্তি** : স্ত্রী ও পুরুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অথবা বসে। বড় জোর হাত ধরাধরি করা ছাড়া তারা পরস্পরকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করছে না।
- ২) **উদ্ভেজিত মিথুন** : আলিঙ্গনাবদ্ধ, চুষনোদ্যত অথবা প্রাক্‌মিলন-কৌরুরত নরনারী, যাদের নিম্ন-যৌনাজ্ঞাপ্রকট।
- ৩) **শৃঙ্গাররত মিথুন** : ঘনিষ্ঠতর প্রাক্‌মিলন শৃঙ্গারে রত—যখন শিল্পী তাদের মূল নিম্ন-যৌনাজ্ঞা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে প্রকট করেছেন।

৪) **মৈথুনরত মিথুন** : তৃতীয় ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে নরনারীর গোপন সন্তোগদৃশ্য—স্বাভাবিক, বিপরীত, অথবা বাৎসরিক বর্ণিত অন্যান্য রীতিনীতি, যখন তাদের নিম্ন-যৌনাত্মক আবশ্যিকভাবে প্রকট। **Cunnilingus, Fellatio**, অথবা পশুমৈথুনরত নরনারীকেও এই পর্যায়ভুক্ত ধরা হয়েছে।

৫) **যৌথ যৌনাচার** : যে সঙ্গমদৃশ্যে একাধিক নারী অথবা একাধিক পুরুষ কামক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করছে। তৃতীয় ব্যক্তি সক্রমক অথবা অবলোকন-কামের অক্রমক অংশীদার যাই হোক না কেন।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ঐ পাঁচজাতের মিথুন সম্বন্ধে একে একে আলোচনা করা হয়েছে। আপাতত সামগ্রিক ভাবে ‘মিথুনবাদ’ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে নেওয়া ভালো। প্রথম তিন জাতের মিথুন, অর্থাৎ যুগলমুর্তি, উত্তেজিত মিথুন এবং শৃঙ্গাররত মিথুনের ব্যবহার ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রায় সর্বত্র এবং সর্বযুগে দেখা যায়। ভারত-বৃদ্ধগয়া-সাঁচীর যুগ (খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) থেকে শেষ হিন্দুযুগ পর্যন্ত সমস্ত যুগেই তারা খোদিত হয়েছে, এবং সেটা হয়েছে কাশ্মীর থেকে কুমারিকা আর কামাখ্যা থেকে স্বাক্ষর। অপর পক্ষে মৈথুনরত মিথুন এমন ব্যাপক ভাবে সর্বযুগে ব্যবহৃত হয়নি। দাক্ষিণাত্যে বা উত্তর ভারতে দু একটি বিক্ষিপ্ত উদাহরণ পাওয়া সত্ত্বেও বলা চলে এই শিল্প অনুভাবনার ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছে কলিঙ্গ এবং খাজুরাহোতে—মোটামুটি নবম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। শেষ পর্যায়ের মিথুন—যাকে যৌথ যৌনাচার বলেছি, তার ব্যাপ্তি আরও কম। খাজুরাহোর কয়েকটি মন্দিরের একশ বছরের শিল্পস্ফুরণে এবং কোনার্কের দ্বাদশবর্ষ ব্যাপ্ত ক্রিয়াকাণ্ডেই তা বিধৃত। ভাষান্তরে বলা যায়, চতুর্থ ও পঞ্চমজাতের মিথুন ভারতীয় ভাস্কর্য-চিন্তায় ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়নি—কয়েকটি স্থানীয় শিল্পস্ফুরণে প্রতিফলিত মাত্র। খাজুরাহো ও কলিঙ্গের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দাক্ষিণাত্যে নীত ও গৃহীত হয়েছে তা দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু ব্যাপক অর্থে ঐ দুটি অনুভাবনা নয়।

কলিঙ্গ পরিদর্শনের পর যখন খাজুরাহো পরিদ্রষ্টা করতে যাই তখন সেখানকার কয়েকটি মন্দিরেও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করি। সেখানেও যে সিন্ধাস্ত্রে এসেছি তাও পরবর্তী একটি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। ইলোরায়, সিন্ধারে, নাসিকে, বালাসনে, মাদুরায়, হালোবিড মন্দিরের সংলগ্ন সংগ্রহশালায়, বেলুরে, কাশীর নেপালী পোখরা মন্দিরে, এমনকি এই বঙ্গদেশেই মৈথুনরত বন্ধকাম মূর্তির সাক্ষাৎ পেয়েছি—ব্যাপকভাবে নয়, ব্যতিক্রম হিসাবেই। সেগুলির বিষয়ে একক প্রচেষ্টায় গভীরভাবে গবেষণা করে উঠতে পারিনি।

সে যাই হোক, ভারতীয় ভাস্কর্যকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আগে প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার—নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে শিল্পীদের সচেতনতা আদৌ অভূতপূর্ব নয়। সৌরমণ্ডলের এই তৃতীয় গ্রহে মানব-সভ্যতা যদিচ প্রজননের প্রক্রিয়াটিকে দেশকালভেদে সঙ্গোপনে রাখার নির্দেশ দিয়েছে, তবু সেটাকে কোথাও অস্বীকার করা হয়নি, না ব্যবহারিক জীবনে, না শিল্পে। সেটা সম্ভবপরও ছিল না। সৃষ্টিতত্ত্বের মূলেই যে ক্রিয়া, জগত-প্রপঞ্চের শৈল্পিক রূপায়ণে তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা চলে না। তাই দেখতে পাই, মানব সভ্যতার একেবারে উষ্মযুগ থেকে এই তত্ত্বটি দেশকালভেদে শিল্পীর ভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে। ভারতীয় ভাস্কর্যের এই ভাবনাকে বিচার করার পূর্বে সেজন্য প্রথমেই আমাদের যাত্রা করতে হবে ঐ চিন্তাধারার গঙ্গোত্রী উৎসের সন্ধানে।

দুই

॥ প্রাচীন সভ্যতার শিল্পচেতনায় যৌনতত্ত্ব ॥

বিগত শতাব্দীতে জনৈক ব্রিটিশ ধর্মযাজক উড়িষ্যার মন্দিরগায়ে এই তথাকথিত অশ্লীল মূর্তিগুলি দেখে সঙ্কোচে লিখেছিলেন, “এই সব মিথ্যা দেবদেবীকে উদ্বেদ করে বাইবেলকে এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে সর্বপ্রথমে এই মন্দিরগুলিকে ধ্বংস করতে হবে। মন্দিরগায়ে যেসব চিত্র ও ভাস্কর্য উৎকীর্ণ করা আছে তা দর্শনমাত্র শালীনতাবোধ স্বতই অধোবদন হয়। এই মন্দির এবং তার অভ্যন্তরস্থ পাপের প্রতীক এই শিবলিঙ্গকে সর্বাপেক্ষে ধূলিসাৎ করা প্রয়োজন।” ২

উনবিংশ শতকের এই ধর্মাক্ত পাদরীর এ অভিমতে অবাক হবার কিছু নেই। কারণ খ্রীষ্টধর্মের বিনিমোদেই কামকে অস্বীকার করা হয়েছে। নরনারীর পারম্পরিক আকর্ষণই বাইবেল মতে ‘আদি পাপ’; ধর্মের প্রবর্তক তাঁর মাতৃগর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন কামকে অস্বীকার করে, immaculate conception-এর আধিভৌতিক পথে। ক্যাথলিক ধর্মযাজক ও যাজকাদের জন্য কঠোর ইন্ড্রিয় সংযমের নির্দেশ দেওয়া আছে। হিন্দু সন্ন্যাসীর জন্যও আছে সমতুল্য নির্দেশ—বিশ্বত্ম সন্ন্যাস-গ্রহণ হিন্দুধর্মমতে মানবজীবনের চতুর্থ পর্যায়—গুরুগৃহবাস, গাহস্থ্যশ্রম এবং বানপ্রস্থ অতিক্রমণে তার প্রারম্ভ। সন্ন্যাস কামকে অস্বীকার করে নয়, স্বীকার করে; অবদমনে নয়, চরিতার্থ করে। প্রথমে ভোগ, পরে ‘তাস্তেন ভূজিথা’—না হলে সৃষ্টি থাকে না। জনকাদি গৃহী সন্ন্যাসীরাই শুধু নয়, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি থেকে কৃষ্ণ-বুদ্ধ প্রভৃতি মহামানবদেরও এই ঐতিহ্য। শঙ্করাচার্য বা বিবেকানন্দ প্রভৃতি ব্যতিক্রমের ব্যতিক্রমই।

ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ যাতে না হয় তাই এই পর্যায়েই উল্লেখ করে যাই, উনবিংশ শতকের এই ধর্মযাজকই কিন্তু খ্রীষ্টান সমাজের একমাত্র প্রতিনিধি নয়। তা যদি হত তাহলে দুশ বছর ইংরাজ শাসনের পরে এই মূর্তিগুলি আমরা দেখতে পেতাম না। কানিংহাম, ফারগুসন, হ্যাভেল প্রমুখ গত শতাব্দীর মনীষীদল বাইবেল নির্দেশে আদি পাপের এই প্রতীকচিহ্নগুলি ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা তো করেনইনি, বরং সেগুলি সযত্নে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

সে যাই হোক—নরনারীর মিলন প্রসঙ্গে ধর্মাক্ত খ্রীষ্টান যাজকের মতে শালীনতাবোধ অধোবদন হোক আর না হোক, এই জৈবিক বৃত্তিটিকে শুধু হিন্দু-ধর্ম নয়, পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচীন সভ্যতা অনস্বীকার্যভাবে গ্রহণ করেছিল। বীশু খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্বযুগ থেকেই দেশকালভেদে এ তথ্যটা শুধু তত্ত্ব হিসাবেই নয়, শিল্প ভাবনাতে সৌন্দর্যের পূজারতিরূপেই প্রতিফলিত—এ জগৎ প্রপঞ্চে জীবসৃষ্টির আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে। তাই প্রায় প্রত্যেকটি প্রাচীন সভ্যতায় এ সত্যটা প্রতিফলিত—লৌকিক আচার অনুষ্ঠানে, গাথায়, কাব্যে, ধর্মীয় আচারে, লোক শিল্পে। যদিও শিল্পবস্তু হিসাবে তার কতখানি কী ভাবে রূপায়িত হবে, কতটা অপ্রকট থাকবে তা স্থির হত দেশকালের চেতনায়। মিশরে, সুমেরিয় সভ্যতায়, গ্রীসে, রোমে, চীনে আদিরসকে অস্বীকার করা হয়নি। কখনও কখনও যৌথ নৃত্যের আসরে, মন্দিরার স্রোতে মদনদেবের উপাসনা করা হত সাড়ম্বরে। ক্ষেত্র বিশেষে সামাজিক বাধানিবন্ধের বেড়া ভেঙ্গে মানব-চরিত্রের আদিম উদ্ভাসকে সাময়িকভাবে নির্মূর্তিত দেওয়ার সামাজিক অনুমোদনও ছিল। বিশেষ উৎসবসময়ে বিবাহিত নরনারী বৈচিত্র্য-সন্ধানী হলেও সমাজ চোখ বুজে থাকত।

‘ফ্যালিসিজম’ বা ‘ফ্যালিজম’ শব্দটাকে যদি বাংলায় লিঙ্গপূজা বলি, তবে তা মানব সভ্যতার একেবারে আদিযুগের—বস্তুত ইতিহাস নয়, সেটি নৃতত্ত্বের বিষয়ভূক্ত। মানুষ যখন কাপড় পরতে শিখল, শীত নিবারণ নয়, লাজবস্ত্র রূপে পরিধেয়ের

প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন হল তার পূর্বযুগ থেকেই সে জননেত্রির পূজারী। পৌরুষের প্রতীক ঐ পুংলিঙ্গ এবং উর্বরতার প্রতীক স্ত্রীজননেত্রিয়। ভূদেবী এবং মাতৃদেবী (Mother goddess) এর পরিকল্পনাও সেই যুগের।

প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগে গুহার ভিতর খোদাই করা চিত্র—১-এ দৃষ্ট মৈথুনরত মিথুন মূর্তিতেই রয়ে গেছে তার প্রমাণ। নায়ক ও নায়িকার মস্তক এই বন্ধকাম শিম্পকর্মের দুই বিপরীত মেরু। এই গুহা-ভাস্কর্যের বয়স অন্তত সাত আট হাজার বছর—অর্থাৎ তখনও মানুষ নগর পত্তন করেনি—মোহেন-জো-দড়োর জন্ম হয়নি। তবু অজ্ঞাত শিম্পার বক্তব্য বুঝে নিতে আমাদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে না।



চিত্র—১

প্রাগৈতিহাসিক
মৈথুনরত মিথুন

গ্রীক সভ্যতায় মদিরা ও মদনানন্দের অধিদেবতা ছিলেন ‘ডায়ানিশাস’, এবং তাঁর শক্তিরূপা সৌন্দর্যের দেবী ছিলেন ‘আফ্রোদিত’। তাঁদের সম্মান হয়েছিল—পুত্রসন্তান—নাম : ‘প্রায়্যাপাস্’। সর্বশ্রেষ্ঠা রূপসী সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর গর্ভজাত এই পুত্রটি কিন্তু—আশ্চর্যের কথা, কুৎসিত দর্শন। আর মজার কথা এই যে, রূপ না থাকলেও শাস্ত্রমতে তার জননেত্রিয়টি ছিল সুবৃহৎ এবং নিয়ত-উত্থিত। এ কম্পনার ব্যঞ্জনাটি প্রাজল। প্রসঙ্গত আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে ঐ গ্রীকদেবতাটি, আজও টিকে আছেন। কারণ পুরুষাঙ্গের নিয়ত-উত্থিত অব্যাবাহিক অবস্থার রোগকে আজও বলা হয় : প্রায়্যাপিজম্। আফ্রোদিত ছাড়াও গ্রীকদের ছিলেন আর একজন প্রজনন-দেবী। স্বয়ং জিয়ুস-এর ভগ্নী, ডিমিটার। তিনি ছিলেন জগন্মাতা। আশ্চর্যের কথা—তিনিও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। আমাদের মা কালীর মতো।

মিশরীয় সভ্যতায় ডিমিটারের প্রতিরূপা ছিলেন—আইসিস্। হোরাস-এর জননী; প্রেম ও প্রজননের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। রোমক সভ্যতায় দেখাছি—

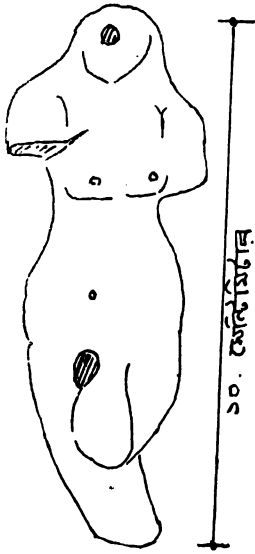
‘সেই ট্যাডিসান সমানে চলেছে,’—গ্রীক দেবতা ডায়ানিশাস-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন ‘ব্যাকাস্’ এবং আফ্রোদিত রূপান্তরিত হয়েছেন সৌন্দর্যের দেবী ‘ভেনাস্’-এ।

গ্রীস, মিশর ও রোমের এই সব দেবদেবীর উপাসনার আয়োজন ছিল মদিরা-পিচ্ছিল মদনমন্দিরের অভ্যন্তরে। প্রাপ্ত-যৌবন নরনারীর বাধাবন্ধনহীন যৌনক্রিয়াই ছিল তার পূজার উপাচার। ঐ চিন্তাধারা ক্রমে অনুপ্রবেশ করল এশিয়া মাইনরে। হয়তো কথাটা ঠিক হল না—হয়তো সেখানে স্বকীয় চিন্তায় স্বতন্ত্রভাবে জন্মলাভ করেছিল মদনপূজা। মোট কথা আমরা দেখতে পাচ্ছি—অনুরূপ অনুষ্ঠান অব্যাহত আছে পাইরিজিয়া, লিডিয়ায়। পাইরিজিয়ার রাজা মিডাস্-এর উপাস্য ছিলেন : সাবাজিন। তিনিও প্রেম-প্রজননের অধিদেবতা। প্রাচীন সভ্যতায় যৌন দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে এই ধরনের সংযমহীনতা দেখেই একদিন নীতিবাগীশ জন মিল্টন তাঁর ‘প্যারাডাইস লস্টে’ ধিক্কারে মুগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। ৩

গ্রীক পুরাণে বর্ণনা আছে—কী ভাবে দেব ডায়ানিশাস ইউফ্রেতিস্ নদী অতিক্রম করে আসিরিয়া এবং ব্যাবিলোনিয়াকে পদানত করেন। পথে ডামাস্কাসরাজ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে বার্থ ও নিহত হন। “একটি ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করে দেব ডায়ানিশাস্ ইউফ্রেতিস্ নদী অতিক্রম করেন এবং ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। সমগ্র রাজ্যটি জয় করে সে দেশে নতুন নতুন নগরীর প্রতিষ্ঠা করে তাঁর প্রভাব বিস্তার করেন।” ৪

বলা বাহুল্য গ্রীক পুরাণে বর্ণিত দেব ডায়ানিশাস্-এর এই অভিধান আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের ঐতিহাসিক উপাদানে গঠিত। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সেকেন্দার শাহই এ প্রাচ্যখণ্ডে ঐ চিন্তাধারার ভগীরথ। গ্রীক আক্রমণের বহু পূর্ব যুগ থেকেই—বহুত মোহেন-জো-দড়ো এবং হড়প্পার আর্থ অনুপ্রবেশের পূর্বযুগ থেকেই প্রেম ও প্রজনন তত্ত্ব বৃহত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

প্রাচীন ভারতে মিথুনবাদ ও প্রজননতত্ত্ব : গৌরীপটু-বিধৃত শিবলিঙ্গের পরিকল্পনার মধ্যেই সূচীতত্ত্বের মূল প্রতীকটি নিহিত এবং সে পরিকল্পনা যে কত প্রাচীন তার পরিমাপ হয়নি। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে শিব হচ্ছেন অনার্য



চিত্র—২
পুরুষ-দেহকাণ্ড, হড়প্পা

দেবতা। হিন্দুধর্মের আদি গ্রন্থ ঋক বেদের প্রথম সূক্ত উক্ত হবার পূর্বেই প্রাকার্য ভারতবর্ষে শিব ও শক্তির উদ্ভব হয়েছিল। হিন্দু সভ্যতায় হড়প্পাতে প্রাপ্ত চুনা পাথরের এই (চিত্র—২) ছোট মূর্তিটি বর্তমানে নয়াদিল্লির সেন্ট্রাল এশিয়াটিক এ্যান্টিকুইটিজ্ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। উচ্চতায় এটি মাত্র দশ সেন্টিমিটার। এই পুরুষমূর্তিটির শুধুমাত্র দেহকাণ্ড বা খড়্টিই পাওয়া গেছে। কিন্তু তাতে কয়েকটি ‘সকেট’ বা ছিদ্র আছে—হাত পা মাথা প্রভৃতি সংযুক্ত করার জন্য। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, জানুয়ারের সংযোগ স্থলেও অপর একটি আবাশ্যিক অঙ্গ সংযোজনের উদ্দেশ্যে অনুরূপ একটি ছিদ্র আছে। দেহকাণ্ডের পরিকল্পনায়, বিশেষ করে বামজানুর উৎক্ষেপে মনে হয়—এটি নৃত্যরত একটি পুরুষের মূর্তি। তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংস্থাপন স্বতই দাক্ষিণাত্যের একটি অতি পরিচিত দেবতার কথা—আমাদের স্মরণে এনে দেয় : তাণ্ডবনৃত্যরত নটরাজকে।

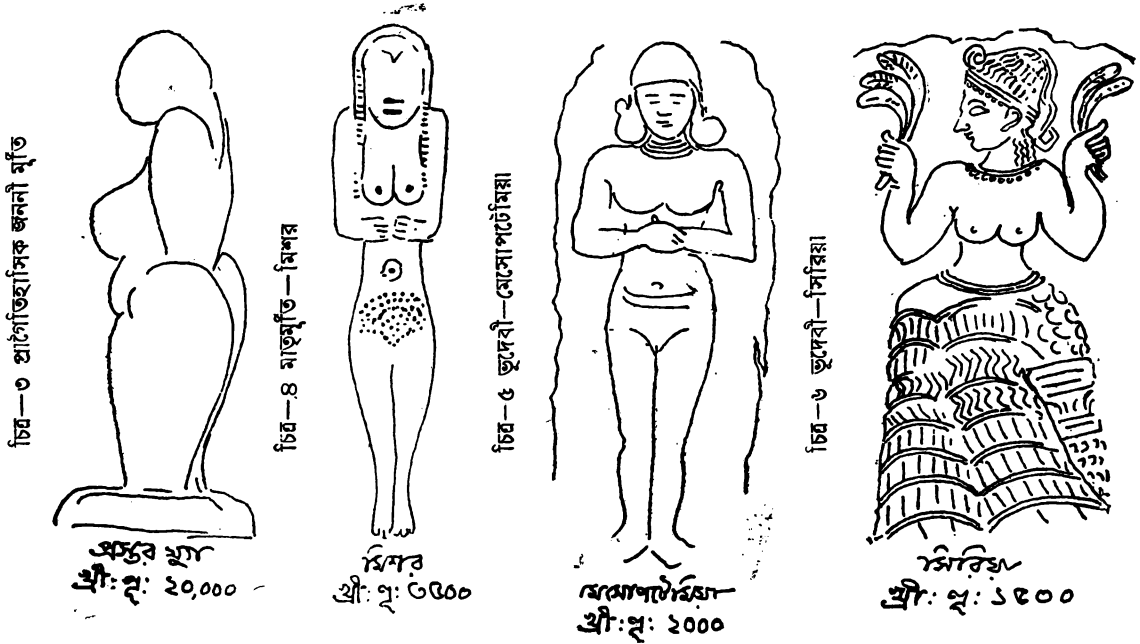
স্বীকার করি, দুটি শিল্পবস্তুর মধ্যে অন্যান্য চার হাজার বৎসরের সময়ের ব্যবধান। তাদের যোগসূত্র সন্ধান করতে স্বতই সঙ্কোচ আসে। তবু বলি, যে কথা আপনাদের আমার বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে ঠিক সেই চিন্তাই বিচলিত করেছিল প্রখ্যাত শিল্প-বিদ্যার পণ্ডিত ডক্টর বেঞ্জামিন রোল্যান্ডকে—“Even in its present fragmentary state, the figure is imbued with a vital, dynamic quality and a suggestion of movement impaired by the violent axis dislocation

of the head, thorax and hips, exactly the same device employed to suggest the violence of Shiva's dance in the great Hindu bronze of Chola period.” ৫

অর্থাৎ, “বর্তমানে দৃষ্ট ঐ খণ্ডমূর্তিটির ভিতরে এমন একটা শক্তিশালী গতিময় ব্যঞ্জনা আছে—দেহ অক্ষের উৎক্ষেপে, মস্তক-বক্ষ-নিতম্বের পারস্পর্যে এমন একটি ব্যঙ্গ্য আছে যা স্বতই চোলযুগের হিন্দু ভাস্কর্যের বিখ্যাত শিবভাস্কর্যের রুদ্ররসকে আমাদের স্মরণে এনে দেয়।”

দেশকাল নিরপেক্ষভাবে মানুষ স্বীকার্যতঃ চিনতে শেখে মায়ের রূপে। স্তনদায়িনী জননী। ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্তির পরে তার দৃষ্টি বদলায়—সে স্বীকার্যতঃ অন্য একটি রমণীর রূপের বিষয়ে সচেতন হয়, তাকে কামনার ধন হিসাবে চিনতে শেখে। বিশ্বভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই জননী সন্তার বিষয়ে বিশ্বভাস্কর্য অবহিত হয়েছিল। শুধু গর্ভদায়িনী জননীই নয়—মাটি বা খরিদ্রীকেও সে সভ্যতার প্রথম যুগ থেকে মা রূপে চিহ্নিত করেছে। সেই যখন পশুপালনের যুগ থেকে সে কৃষিকার্যে অভ্যস্ত হতে শিখছে তখন থেকেই ভূ-দেবীর পরিকল্পনা সে করতে শিখছে। জননী

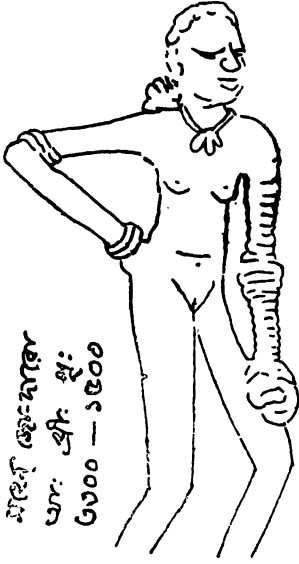
স্তন্যদান করেন, খরিদী দেন শস্য। দুজনেই মা। স্ত্রী জাতিকে জননীরূপে চিন্তা করার মানসিকতাটা বুঝে নিতে আমরা এখানে পরপর চারটি উদাহরণ পেশ করছি। প্রথম উদাহরণ (চিত্র—৩) প্রাচীন প্রস্তরযুগের একটি পোড়া মাটির জননীমূর্তি—তার বয়স অন্তত বিশ হাজার বছর। অথচ সেটিতে এমনই একটা বিশ্বজনীন তথা সর্বকালীন আবেদন আছে যে, অনায়াসে



ভুল হতে পারে যে, এটি বিংশ-শতাব্দীতে গড়া কোনও ভাস্করের কীর্তি। যেন সেটি কলকাতা, দিল্লী, প্যারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক যে কোন প্রদর্শনীতে এ বৎসর প্রদর্শিত হয়েছে। মূর্তিটিতে নাক-মুখ-চোখ না থাকায় কোনও ক্ষতি হয়নি—জননী-সন্তান পূর্ণ ব্যঞ্জন। এতে বিধৃত—গুরু নিত্য এবং অমৃতরসধারা পুষ্ট স্তনে। দ্বিতীয় উদাহরণটি (চিত্র—৪) নীলনদের প্রাচীনতর সভ্যতার—গ্রীকজন্মের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বে নির্মিত। সমভঙ্গ্যে দণ্ডায়মান। এ মাতৃমূর্তিতে দেখাচ্ছিল মিশরীয় ভাস্কর স্তন এবং নাভি গহ্বরকে সুচিহ্নিত করেই ক্ষান্ত হননি—উদরের নিম্নাংশে একাধিক ছিদ্র উৎকীর্ণ করেছেন। বোধ করি জননী যে বহুবার গর্ভধারণ করেছেন তারই প্রতীক ব্যঞ্জন। তৃতীয় উদাহরণ (চিত্র—৫) মোসোপটেমিয়ার ভূ-দেবী। ইউফ্রেতিস-টাইগ্রিস-বিখ্যাত শস্যশ্যামলা ভূ-খণ্ডের জননী মূর্তিটিও সমভঙ্গ্য। পূর্ব উদাহরণের পর কিন্তু হাজার-দেড়হাজার বছর কেটে গেছে। চতুর্থ উদাহরণটি (চিত্র—৬) সিরিয়া থেকে সংগৃহীত—বয়সে আরও পাঁচশ বছরের অনুজ্ঞা ইনি। এবার দেখাচ্ছিল ভূ-দেবীর দুই হাতে শস্য—তিনি সালস্কারা এবং পটুবস্ত্রভূষিতা।

পঞ্চম উদাহরণ যেটি সংগ্রহ করেছি সিন্ধু-সভ্যতা থেকে (চিত্র—৭) তাকে কিন্তু মাতৃমূর্তি বলা যাবে না। ব্রোঞ্জ নির্মিত মোহেন-জো-দাড়োর এই মূর্তিটি প্রায় কিশোরীর। সে সালস্কারা বটে কিন্তু গুরুনিভাষনী বা স্তন-গর্ভবিনী নয়। তার বিচিত্র ঠামের মধ্যে কী একটা নতুন জাতের ব্যঞ্জন। সেই নতুন জাতের অনুভাবনটিকে হৃদয়ঙ্গম করতে আমরা এবার পর পর তিনটি নারীমূর্তির আলোচনা করব : মোহেন-জো-দাড়ো, মথুরা-যক্ষী ও সাঁচী বৃক্ষিকা।

মথুরা যক্ষী (চিত্র-৮) মোহন জো-দড়ো-সুল্লরীর অপেক্ষা দুই-তিন সহস্রাব্দের অনুজ। একটি ধাতব মূর্তি,

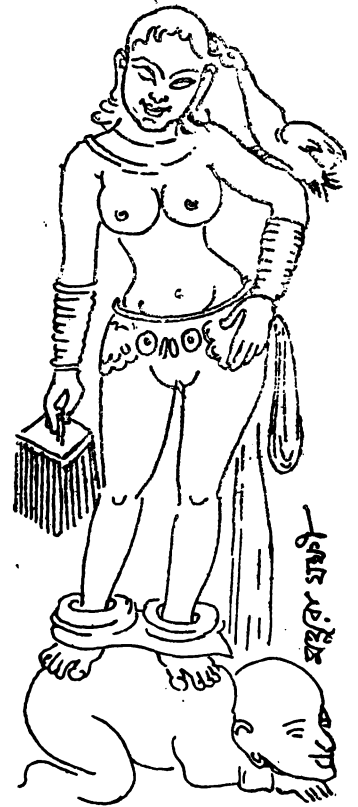


চিত্র-৭

ব্রোঞ্জমূর্তি, মোহন-জো-দড়ো

অপরটি প্রস্তরের। প্রথমটি 'ফ্রি-স্ট্যাটিউং' বা গ্রিমারিক, দ্বিতীয়টি 'অল্টো-রিলিভো' বা অর্ধোৎকীর্ণ, প্রাচীরগাঠের বেরিয়ে-থাকা মূর্তি। প্রথমটি ক্ষীণাঙ্গিনী, প্রায়-কিশোরীর। দ্বিতীয়টি পূর্ণযৌবনা রমণীর। প্রথমোক্তের লঘু-নিতম্ব, শীর্ণ বাহুদ্বয় এবং অপরিণত স্তনযুগল বিকট-যৌবনা মথুরাযক্ষীর যৌবনভারনয় তনুশ্রীর সঙ্গে যেন এক সুরে বাঁধা নয়। তবু মনে হয়, কোথার কী যেন একটা মিল আছে। মিলটা ওদের দুজনের মণিবন্ধে বলয় প্রাচুর্যের জন্য নয়, দেহ বঙ্গরীর আভ্রা ঠামের জন্য নয়, —সে সমর্ম্মতার মূল যেন আরও গভীরে নিহিত। ওরা দুজনেই মাজায় হাত রেখে—ইংরাজিতে যাকে বলে 'akimbo'-ঠামে দর্শকের দিকে রহস্যময়ী দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। ওদের একই জাতের আসা, কোঁচকময়ীর কটাক্ষে একই জাতের লাস্য, হাস্যময়ীদ্বয়ের জীবনদর্শনেও যেন একই জাতের ভাষা। ইংরাজিতে এ্যাকিষো ঠামের অর্থই হচ্ছে : I'm waiting for your next step। তা হোক, তবু ইংরাজী ভাষা জন্মগ্রহণ করার বহু পূর্বযুগের এই দুটি মাজায়-হাত-দিয়ে-দাঁড়ানো স্ত্রীমূর্তির ভঙ্গিমার মধ্যেও আছে প্রতিপক্ষের পরবর্তী পদক্ষেপের প্রতীক্ষা। কেন? কী ওরা বলতে চায়? কিসের প্রতীক্ষা ওদের?

প্রথমটি প্রাচীনতর, অনেক দূরের মানুষী। তাই দ্বিতীয়াকেই আমরা ঘনিষ্ঠভাবে বিচার করে দেখতে পারি। দেখছি, মথুরা যক্ষীগীর পদতলে মৃত্যু-অসুর পিন্ট হচ্ছে, সে মৃত্যুঞ্জয়ী! না, ব্যক্তিগত জীবনে মৃত্যুকে সে জয় করেনি—আপনার-আমার মতো সেও মরণশীল। তবু দার্শনিক বাগস* যাকে বলেছেন জীব বিবর্তনের পথে জীবন অমৃত Elan Vital, সেই অমৃতের সন্ধান সে পেয়েছে। ব্যক্তিগত নয়, প্রজাতিগত জীবনে। যৌবনের সিংহস্বারে দাঁড়িয়ে সে নন্দন-তত্ত্বের মূলকথা, প্রজনন-তত্ত্বকে জেনেছে। মৃত্যু যদি হয় এই মরণশীল দুনিয়ার শেষ কথা, তবে প্রজননের পথে নবজীবনের সূত্রপাতও নন্দন তত্ত্বের শেষতর কথা! ওর দক্ষিণ হস্তে একটি পিঞ্জর—কিস্তু তার পোষমানা শূকপক্ষীকে সে পিঞ্জরাবদ্ধ করেনি, পাখিটি আছে ওর কাঁধে। ও জানে, পিঞ্জর নিষ্প্রয়োজন, প্রেমের অচ্ছেদ্য অদৃশ্য বন্ধনে ওর প্রেমাস্পদ ওর সঙ্গে হাত মেলাবে—মৃত্যুকে অতিক্রম করার খেলায় নবজন্মের অভিসারে। নন্দন-তত্ত্ব সেই শিক্ষাই ওকে দিয়েছে। তাই শিল্পী ওর পদতলে পরাভূত: মৃত্যু অসুরকে উৎকীর্ণ করেই ক্ষান্ত হননি, এই নায়িকার উপরের অলিন্দে রূপায়িত করেছেন একটি যুগলমূর্তি। তাদের আনন্দ-ধন প্রেমরসই: দর্শককে বুঝিয়ে দিচ্ছে—মৃত্যু-অসুরকে অতিক্রম করার কোন্ মন্ত্রে এই যক্ষী দীক্ষিত। মৃত্যু যদি



চিত্র-৮ মথুরা যক্ষী

হয় মরজীবনের অন্তরস, তবে ঐ রসিকা সন্ধান পেয়েছে অ-মরজীবনের আদিরসের। আর সেজন্যই ও দর্শকের দিকে তাকিয়ে হাসছে। যেন বলতে চায় : Yes ! I'm waiting for you !

মদনসমুদ্র জীবনতরী ভাসাতে ভীত দর্শককে ডেকে ঐ নায়িকা তার বিলোল কটাক্ষ আর মোহময়ী লাস্যে যেন বলতে চায় :

কিম্ তত্র পৃচ্ছয়তে যুস্মাকম্ খলু প্রেমনির্মাণজালে

মদনসমুদ্রে স্তননিতম্বজঘনয়োর্ধানপাশাণী মনোহরাণী ॥

মৃচ্ছকটিকের বিদূষক বলছেন, 'সমুদ্রযাত্রায় জলযানের কথা কেন চিন্তা করছেন মহারাজ ? বসন্তসেনার স্তননিতম্বজঘন-যান থাকতে এ শৃঙ্গার-সাগর উত্তরণে আর ভয় কি ?'



চিত্র—৯

সাঁচী বৃক্ষিকা

তিনটি উদাহরণেই নায়িকামূর্তির অঙ্গে প্রচুরতর অলংকার আরোপ করা সত্ত্বেও ভিন্নকালের তিনজন শিল্পী নায়িকায়ের স্তম্ভজনেত্রের বিজ্ঞাপনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি।

না, এরা তিনজন আর 'মা' নয়, প্রেমসী !

মিথুন—২

চিত্র—৯-এ দেখতে পাচ্ছি, সাঁচীস্থপের পূর্বতোরণস্থিতা এক বৃক্ষিকাকে, অর্থাৎ বনদেবীকে। বয়সে এ ঘেরোটি মোহন-জো-দড়োর কিশোরীর অপেক্ষা দু-আড়াই হাজার বছরের অনুজা, মথুরা-বৃক্ষণীর তুলনায় দু আড়াই শত বছরের প্রাচীন। অর্থাৎ কালের ক্রমিকে এ আছে ওদের দুজনের মাঝামাঝি। এর ভঙ্গিমা অন্যরকম হলেও মূল বাজনার্টি অভিন্ন। ওর আলিঙ্গনে শালবৃক্ষটি মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। ওর বাম চরণ স্পর্শ করে আছে সেই পুষ্পিত শালবৃক্ষের কাণ্ড। ও আমাদের স্মরণে এনে দিচ্ছে সেই কালকে যখন 'অশোকতরু উঠত ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে'। দেখছি, যৌবনের জয়মালা এই বৃক্ষিকারও করায়ত্ত। তার দেহ-বল্লরীতে প্রাণ-প্রাচুর্য মনোমুগ্ধকর। অলংকারের বাহুল্য ওকে পীড়িত করেনি—কটিদেশে প্রলম্বিত রত্নহার এবং হস্তপদাদির মণিবলয় সত্ত্বেও তার নারীত্ব সুপ্রকট।

উপস্থাপিত তিনটি উদাহরণে পাচ্ছি প্রমাণ—কীভাবে প্রাগৈতিহাসিক মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ধ্যানধারণা পরবর্তী যুগের নারীত্ব বিকাশের বাজনায় বৃণাস্তরিত হয়েছিল। নারীত্ব এবং জননী-সন্তাকে পূজা করার, অন্তত অভিনন্দন জানানোর মনোভাব তিনটি শিল্পনিদর্শনেই সুপ্রকট। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব এই ধ্যান-ধারণা থেকেই প্রতীচ্যে ও প্রাচ্যে দুটি ভিন্নজাতের শিল্পভাবনা কীভাবে জন্ম নেয়। প্রতীচ্যে : 'নৃড' এবং প্রাচ্যে : মিথুন। আপাতত লক্ষণীয়—উপস্থাপিত

তিন ॥ কেন মিথুন ॥

আগেই বলেছি, মিশরীয় স্ফিংস-এর মতো ভারতীয় মন্দিরে বিভিন্ন জাতির মিথুন মূর্তিগুলি চিরপ্রশ্নের বেদীসম্মুখে বিরট নিরন্তররূপেই বিরাজমান। আদিসূরী রাজেন্দ্রলাল বা ফার্গুসন কলিঙ্গ দেউলে তাদের উপস্থিতির কোন হেতু নির্দেশ করে যেতে পারেননি। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বললেন, “This is the most perplexing feature of Qrissan Architecture ও [উড়িষ্যা স্থাপত্যে এইটাই সবচেয়ে দুর্বোধ্য বিষয়]। অধ্যাপক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, “The presence of indecent figures on religious edifice is still a puzzle” [ধর্মমন্দিরের বহির্গায়ে ঐ নীতি-বিগর্হিত মূর্তিগুলি আজও এক অমীমাংসিত প্রশ্ন] ৭। লক্ষণীয়, ঠিক কোন জাতির মূর্তিকে তিনি নীতি-বিগর্হিত বা indecent বললেন, তা আমরা বুঝতে পারলাম না। অনুমান করতে পারি—চতুর্থ ও পঞ্চম জাতির মিথুনমূর্তি, যাদের আমরা ‘মৈথুনরত মিথুন’ এবং ‘যৌথ যৌনাচার’ বলেছি, সেগুলিই ঠাঁর চোখে ভাল লাগেনি।

প্রায় ষাট বছর আগে এই বিষয়টি নিয়ে একটি দীর্ঘ আলোচনা ‘মানসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্বসূরীদের মতামত সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে যখন অনুসন্ধান করছিলাম তখনই ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি নজরে পড়ে। তদানীন্তন দিকপাল পণ্ডিতেরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, আচার্য ব্রজেন্দ্রলাল শীল, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁদের বক্তব্য রাখেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠককে ‘মানসী’ পত্রিকার ১৩২০ সালের আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন এবং ১৩২১ সালের আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যাগুলি দেখতে বলব। এখানে আমি সেই আলোচনার সংক্ষিপ্তসার সঙ্কলন করছি :

বিপিনবিহারী গুপ্তমশাই রোগশয্যায় শায়িত রামেন্দ্রসুন্দরকে এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করেন। আলোচনার সেখানেই সূত্রপাত। পরে বিতর্কমূলক বিষয়টি নিয়ে গুপ্তমশাই অক্ষয়কুমার ও ব্রজেন্দ্রলাল প্রভৃতির সঙ্গেও আলোচনা করেন। মানসী পত্রিকার ঐ সাতটি সংখ্যায় তার বিশদ বিবরণ আছে।

গুপ্তমশাইয়ের প্রশ্নটি ছিল—“কিন্তু উড়িষ্যায় জগন্নাথদেবের মন্দিরগায়ে বীভৎস erotic figures এর সমাবেশ কেন হইল, এই প্রশ্ন উত্থিত হইবামাত্র আমরা তাহাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। অনেকে স্থির করিয়াছেন যে, উহা আর কিছু নহে, কেবলমাত্র হিন্দুর জাতীয় চরিত্রাপকর্ষের নিদর্শনস্বরূপ হিন্দুর দেবমন্দিরে চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সত্যই কি তাহাই?”

রোগশয্যায় শায়িত রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদী প্রত্যুত্তরে বললেন, “আপনি আজ যে প্রশ্নের উত্থাপন করিলেন, সে সম্বন্ধে আমি একটু ভাবিয়া দেখিয়াছি। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরগায়ে ঐ সকল বীভৎস মূর্তি থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের নরনারী পুত্রকন্যা সমভিব্যাহারে সেই মন্দির দর্শন করিতে আসেন; কখনও কাহারও কোন স্বিধাবোধ হয় না। শুধু জগন্নাথদেবের মন্দিরে কেন, ভুবনেশ্বরের মন্দিরে, কোনারকের সূর্যমন্দিরের ভগ্নাবশেষে এই প্রকার বীভৎস মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়।—নিশ্চয়ই উড়িষ্যার শিম্পকলায় উহা একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় গ্রীষ্মক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি একখানি পুঁথি পাইয়াছেন; বোধহয় খ্রীষ্টীয় দশম, কি একাদশ শতাব্দীর হইবে, তাহাতে শিম্প শাস্ত্রের নিয়মাবলী বিবৃত রহিয়াছে; মন্দির নির্মাণ-সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত আছে। মন্দির গাত্র সুশোভন

করিবার জন্য এইরূপ erotic figures-এর আবশ্যিকতা সেখানে লিপিবদ্ধ করা আছে । ৮ যতদূর স্মরণ হয়, স্যার উইলিয়াম হন্টার তাঁহার উড়িষ্যার বিবরণীতে এই সকল মূর্তি বৈষ্ণবধর্মসম্পৃক্ত বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন । তিনি বলেন যে, জগন্নাথের মন্দির বৈষ্ণবদিগের প্রধান মন্দির, প্রধান তীর্থ, কাজেই সেখানে বৈষ্ণব সাধনা, পদ্ধতির অনুরূপ আদি-রসাত্মক চিত্র চিত্রিত হইবে, ইহার আর বিচিত্র কি ?

“কিন্তু স্যার উইলিয়াম হন্টারের এই সিদ্ধান্ত বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করা যাইতে পারে না । প্রধান আপত্তি এই যে, রামলীলা, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি বৃন্দাবনলীলার কোন কিছুই আভাস এই সকল মূর্তি সমাবেশের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না । কোন প্রকারেই এগুলিকে কোন একটি বিশিষ্ট ধর্মভাবের সহিত সম্পর্কযুক্ত বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে না । এই চিত্রগুলি এতই জঘন্য, এতই অশ্লীল যে, ইতর-সাধারণ নরনারীর কূৎসিত পাশবতা ব্যতীত আর কিছু বলিয়া মনে হইতে পারে না । এগুলির প্রতি দৃষ্ট নিক্ষেপ করিলে বোধহয় কোন বৈষ্ণবের মনে ধর্মভাব জাগিয়া উঠিবে না । দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ইহা যদি বৈষ্ণব ব্যাপারই হইবে তবে ভুবনেশ্বরের শিবমন্দিরে এবং কণারকের সূর্যমন্দিরের গায়ে এরূপ মূর্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল কেন ?

“হন্টারের কথা ছাড়িয়া দিই, বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার অনুমান অমূলক । আর একটা মত পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক । কেহ কেহ এই মূর্তিগুলির সহিত লিঙ্গ-পূজার (Phallic worship) সম্পর্ক পাতাইতে পারেন । লিঙ্গপূজা জগৎব্যাপী একথা সত্য । সভ্যতার আদিম যুগে মানবের সর্বাপেক্ষা প্রধান ব্যাপার ছিল—সৃষ্টিভৃত্য...”

এরপর দ্বিবেদী মহাশয় সভ্যতার আদিম যুগ থেকে লিঙ্গ পূজার প্রচলন কী ভাবে বিস্তার লাভ করে তার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন । মিশরের আইসিস্—অসাইরিস্—এর লিঙ্গপূজার উপাখ্যান, আসিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, প্যালেস্টাইন, গ্রীকদের ডায়োনেসীয় উৎসব, রোমানদের ব্যাক্তাস্ পূজা ইত্যাদি বিস্তারে বর্ণনা করে এই উপসংহারে আসেন যে, উড়িষ্যার বন্ধকাম মূর্তিগুলির সঙ্গে লিঙ্গ পূজার সম্পর্ক নেই ।

দেখা যাচ্ছে, বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয় এর পর তাঁর বন্ধু গৌরহরি সেনকে নিয়ে হাজির হলেন পণ্ডিত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র দরবারে । ৯ কথা প্রসঙ্গে বললেন, “রামেন্দ্রবাবুর থিওরিটা ভুল হইল কি ঠিক হইল, সে সম্বন্ধে আপনার বক্তব্যটা শুনিতে ইচ্ছা হয় ।”

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বললেন, “ও সম্বন্ধে আমার নিজের কিছুই বলিবার নাই, কিন্তু আমি এ কথা লইয়া উড়িষ্যার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সদাশিব শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি । তাঁহার একটি থিওরি আছে : যেটি খুব সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু কিছু গলদও আছে ।

“উপরিষ্ট কার্যের চিত্রই উড়িষ্যার মন্দিরগায়ে বেশী মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায় ।...চিত্রিত পুরুষগুলো বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রতিকৃতি । শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, বৌদ্ধ যুগের শেষাংশে নিশ্চয়ই এমন সময় আসিয়াছিল, যখন বৌদ্ধ ধর্মটাকে হেন্স, জঘন্য, কদর্ঘ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল ; তখন সাহিত্যে চিত্রকথায়, ভাস্কর্যে বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রদায়কে কামপরবশ পশুতে পরিণত করিয়া জনসাধারণের মনে ঘৃণার সঞ্চার করিবার চেষ্টা হইয়াছিল । এ চিত্রগুলি আর কিছু নহে—preaching in sculpture ; মিস্ত্রীরা বাটালি লইয়া খোদাই করিয়া জগৎ-সমক্ষে প্রচার করিতে চাহে যে, বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর জীবন অত্যন্ত জঘন্য ও কদর্ঘ । কিন্তু মন্দির গায়ে কেন ? কারণ এখানে প্রত্যহই বহু সংখ্যক নরনারী সমবেত হইয়া থাকে । প্রচারের পক্ষে এমন সুযোগ অন্যত্র নাই ।”

পণ্ডিতাগ্রগণ্য অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় অথবা সদাশিব শাস্ত্রী মহাশয়ের এ ব্যাখ্যায় আমাদের কিন্তু একাধিক আপত্তি আছে ।

প্রথম কথা, মন্দিরের গায়ে যে মূর্তিগুলি দেখতে পাই তা যে বৌদ্ধ-সম্মাসীর এ কথা আদৌ বোঝা যায় না। দাড়ি ও জটাওয়ালা সঙ্গমরত একাধিক পুরুষমূর্তি আছে। মূণ্ডিতমস্তক পুরুষমূর্তি ঐ সব মিথুনে নেই। দাড়ি ও জটাওয়ালা মূর্তি বৌদ্ধ-সম্মাসীর তা দর্শকেরা কেমন করে বুঝবে? বৌদ্ধ সম্মাসীর যে প্রত্যাশিত প্রতীক—মূণ্ডিত মস্তক, ত্রিরাশমণ্ডিত যশ্টি, দীর্ঘায়ত কর্ণ, বৌদ্ধ মুদ্রা প্রভৃতির সন্ধান পাইনা। সুতরাং মহামহোপাধ্যায় সদাশিব শাস্ত্রী কেমন করে এমন সিদ্ধান্ত করলেন তা আদৌ বোঝা যায় না। তাছাড়া যে যুগে মহাযান বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দানা বেঁধে উঠছিল এ মন্দিরগুলি সে-যুগে নির্মিত হয়নি। সে-যুগে হলে এমন একটা প্রচারের যথার্থ্য তবু অনুমান করা যেত—ব্রাহ্মণ্যধর্ম থেকে বৌদ্ধরা যখন মানুষকে নিজ ধর্মে দলে দলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তখন একটা প্রতিশোধস্বপ্নে ব্রাহ্মণ্যসম্প্রদায়ের ভাঙ্করের মনে জাগলেও জাগতে পারে—কিন্তু এই মন্দিরগুলি যখন নির্মিত হয় তখন অস্তুত উড়িয়া থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রায় বিতাড়িত—বিহারে এবং গোড়ে পালরাজাদের ছত্রছায়ায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক আকারে প্রতিপালিত হচ্ছিল বটে কিন্তু কলিঙ্গ তা করেকটি সম্মারামে—পুষ্পাগিরি, রত্নাগিরি, বাউদ, আউদ প্রভৃতি করেকটি বিহারে তা কোনক্রমে টিকে আছে। তখন সেই মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেবার এ উগ্র বাসনা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় কথা—মৈত্রেয় মহাশয় এবং ত্রিবেদী মহাশয় দুজনেই বিচার করছেন **subjective** দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তাঁদের **hypothesis** হচ্ছে মূর্তিগুলি ‘জঘন্য, ন্যাকারজনক, বীভৎস, অশ্লীল’ ইত্যাদি। কিন্তু কার আছে? কোন দর্শকের কাছে? যাবতীয় সাধারণ দর্শকের রামেন্দ্রসুন্দরের মত সুন্দর দৃষ্টি অথবা অক্ষয়কুমারের মত অক্ষয় দেবদুল্লভ চরিত্র নেই। এবং আমার বিশ্বাস—জিজ্ঞাসিত হলে তাঁরাও স্বীকার করতেন—মূর্তিগুলির মুখভাবে, দেহ সৌকুমার্যে বীভৎসতার বাস্পমাত্র নেই। যৌনক্রিয়া অতিরিক্ত তাদের সৌন্দর্য অনস্বীকার্য! তাহলে?

যে প্রশ্নগুলি আপনার আমার মনে জেগেছে সেটিই শেষ পর্যন্ত বললেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ। বিপিনবিহারী অতঃপর তাঁরই দ্বারস্থ হয়েছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর মূলতঃ বৈজ্ঞানিক, অক্ষয়কুমার ঐতিহাসিক এবং ব্রজেন্দ্রনাথ দার্শনিক। ফলে দেখছি, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ নৈর্যাত্তিক বিচারে একটা নূতন দিগন্তের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন:

“উড়িয়ার মন্দির গায়ে চিত্র সম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু বাহা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার মতভেদ আছে। ঐ যে ভিতর ও বাহির, স্বর্গ ও নরক উহা ঠিক ঐভাবে দেখা যায় কিনা, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। নরক বলিলে যে বিভীষিকার ভাব মনে উদয় হয়, ঐ চিত্রগুলি দেখিয়া তাহা হয় কি? হইতে পারে, বিশুদ্ধ-চিত্ত সাধুসমাজের চিত্তে ঘৃণার উদ্বেগ হয়, কিন্তু আপামর সাধারণ বোধহয় নেহাৎ ঘৃণার চক্ষে দেখেন না; মানুষের মধ্যে যে পশুটি সুপ্ত হইয়া আছে, সে যে আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিবে না, এমন কথা বলা যায় না। যুরোপের **cathedral** গুলি সম্বন্ধে কিন্তু ঐ স্বর্গ-নরকের খিওঁরি খাটে। সে সকল মন্দিরগায়ে শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপার চিত্রিত হইয়াছে; তাহা দেখিলে খ্রীষ্টানের মনে ভীতি উৎপাদন করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; সে চিত্রগুলা বাস্তবিকই বীভৎস। খ্রীষ্টানের নরকের ও **purgatory**র চিত্র তাহার গীর্জাঘরের গায়ে খোদিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে উহা বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সে-সকল চিত্রে বিভীষিকার দিকটা ফুটিয়া উঠিয়াছে; কারিগরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমি জগন্নাথ মন্দির সম্বন্ধে বলিতে চাহি যে, উহার তাৎপর্য সম্পূর্ণ অন্যরূপ।

“শিষ্টা নানা প্রকার চিত্রে প্রাচীর অলঙ্কৃত করিত। হয়তো বা স্বর্গ-নরকের চিত্র অঁকিত, বুদ্ধের জাতক গল্পের বা খ্রীষ্টের লীলা প্রসঙ্গ খোদাই করিত; সাংসারিক ধর্মবিবর্জিত চিত্রও থাকিত (**naturalistic, secular, positive**),

যেমন যুদ্ধ, ব্যবসায়, বাণিজ্য ইত্যাদি। গ্রীক ও রোমক সৌখের গায়ে এরূপ চিত্র দেখা যায়। কিন্তু জগন্নাথের চিত্র সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। ইহার কারণ কি? উড়িয়া অঞ্চলেই বা ইহার বাহুল্য দেখা যায় কেন?

“বৌদ্ধ মঠে সাধনার যে সকল পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহার পর্যালোচনা করিলে একটা তান্ত্রিক রহস্যের উদ্ঘাটন করিতে পারা যায়। ভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইবার জন্য সন্ন্যাসীদের এই প্রকার জঘন্য পাশব ব্যাপার চিন্তা করিতে হইত। মধ্যযুগে যুরোপের-মঠগুলিতে সন্ন্যাসীদের এইরূপ সাধনার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। গৃহীর জন্য এ সাধনার ব্যবস্থা হয় নাই, সন্ন্যাসীদের জন্য হইয়াছিল।...মিস্ত্ররা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের এই তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতি তাহাদেরই অনুজ্ঞাক্রমে খোদাই করিয়া মন্দিরগায়ে প্রকটিত করিত। তদবধি mural decoration এ ঐ চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতির ধারা রহিয়া গেল। হিন্দু-সভ্যতার প্রধান লক্ষণ এই যে, সে বাহির হইতে সহজে কোনও একটা নতুন ভাব গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু একবার গ্রহণ করিলে আর বর্জন করিতে পারে না। এ স্থলে অবশ্যই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, বর্জন করাইবার machinery যুরোপে যে রূপ ছিল, আমাদের দেশে সে রূপ ছিল না। প্রতাপাশ্রিত পোপ ছিল না, inquisition ছিল না, State ছিল না। সে যাহাই হউক, এই বর্জন করিবার ক্ষমতা না থাকার দরুন অনেক দোষ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দেশের মধ্যে এই চিত্রাঙ্কণ-পদ্ধতি একবার গৃহীত হইলে আর তাহাকে বর্জন করা দুঃসাধ্য হইল।

“কিন্তু দেশের লোকে আপত্তি করিল না কেন? দ্রাবিড় জাতির মধ্যে যৌন সম্পর্ক অনেকটা উচ্ছৃঙ্খল (promiscuous) ছিল। তাহাদের চোখে এরূপ চিত্র জঘন্য বা হেয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না।” ১০

চার

॥ লীসন-এর আটটি যুক্তি ॥

গত দশকে মিস্টার ফ্রান্সিস লীসন তাঁর 'কামশাস্ত্র' গ্রন্থে ১১ পূর্বসূরীদের নির্দেশিত হেতুগুলি সংকলনের চেষ্টা করেন। তিনি আটটি সম্ভাব্য হেতুর সন্ধান পান। শ্রেণীবদ্ধভাবে সেগুলি তিনি লিপিবদ্ধ করে আমাদের কাজ অনেকটা এগিয়ে দিয়েছেন। উপসংহারে অবশ্য ঐ আটটি হেতুর কোনটি গ্রহণযোগ্য তা তিনি বলেননি—তাঁর নিজস্ব কোনও মতামতও দাখিল করেননি। গ্রন্থ শেষে তিনি পাঠকের বিচারবুদ্ধির উপরেই সবটা ছেড়ে দিয়েছেন। আমরা লীসন সাহেবের অনুসরণে আটটি হেতুর উল্লেখ এবং তার বিচার করে দেখতে পারি। তাতেই পূর্বসূরীদের বক্তব্য শ্রেণীবদ্ধভাবে আলোচিত হয়ে যাবে :

- ১) ONENESS : [একমেবাদ্বিতীয়ম্] : মিথুনগুলি শক্তির প্রতীক—স্ত্রী পুরুষের মিলনে একই পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান—'ঔ'-এই মন্ত্রের মতো।
 - ২) BLISS : [আনন্দ] : মিথুনগুলি পরম আনন্দের প্রতীক—অপার্থিব তুরীয় রসোপলব্ধির প্রচেষ্টা—পার্থিব মাধ্যমে বিধৃত।
 - ৩) TEMPTATION : [প্রলুব্ধিকরণ] : নিছক কামভাবের উদ্রেক করতেই মিথুন মূর্তিগুলি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। প্রকৃত সাধককে পরীক্ষা করাই মূল উদ্দেশ্য।
 - ৪) INNOCENCE : [সরলতা] : শিম্পীরা সরল ভাবে ঐ গুলি নির্মাণ করেছেন—নৃত্যগীত, শিকার, যুদ্ধের মত কামকৌলিও জীবনের এক পর্যায়, আবশ্যিক পর্যায়, এই সরল বিশ্বাসে।
 - ৫) PROTECTION : [তুক-হিসাবে] : দর্শকের বা অপদেবতার কু-দৃষ্টি থেকে মন্দিরকে রক্ষা করতে 'তুক'-হিসাবে ঐগুলি খোদিত।
 - ৬) ATTRACTION : [আকর্ষণ] : সাধারণ যাত্রীকে মন্দিরের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য।
 - ৭) EDUCATION : [যৌন শিক্ষা] : সাধারণ মানুষকে যৌনশাস্ত্রে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে এগুলি কামশাস্ত্র সম্বন্ধে সচিব পাঠ।
 - ৮) TANTRA : [তন্ত্রশিক্ষা] : বামাচার, তান্ত্রিক অথবা বজ্রযানীদের বিভিন্ন আসনের সচিব বিজ্ঞাপন।
- অতঃপর আমরা এই আটটি সূত্রকে বিচার করে দেখতে পারি :

১) 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-সূত্র : হ্যাভেল সাহেব বলেছেন "In the upanisads sexual relationship is described as one of the means of apprehending the divine nature and throughout oriental literature it is constantly used metaphorically to express the true relation between the human soul and God. ১২ [উপনিষদ বলেছেন, ঈশ্বরিক সত্তার অনুভূতিলাভের অন্যতম পন্থা যৌন সংসর্গ ; তাই সমগ্র প্রাচ্য সাহিত্যে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় মানবাত্মা ও পরমাত্মার সত্যস্বরূপ উদ্ঘাটনে এই প্রতীকটিকে বারে বারে ব্যবহার করা হয়েছে।]

হ্যাভেল সাহেবের ঐ মন্তব্যটি সর্বাঙ্গকরণে মেনে নিতে কোনও বাধা দেখি না—কিন্তু ঐ উক্তিটিকে মৈথুনরত মিথুন মূর্তিগুলির সাধারণ্যে ধারা ব্যবহার করেছেন তাঁদের প্রতি আমাদের বক্তব্য—প্রথমত মন্দিরগাঠে যা রচিত হয়েছে তা ‘সাহিত্য’ নয়, তা নয়নেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শিল্পবস্তু। দ্বিতীয়ত ঐ উক্তিতে প্রতীক (metaphorically) শব্দটি এ স্থলে নিরর্থক হয়ে যাচ্ছে। সাহিত্যের প্রতীক প্রয়োগ এবং মন্দির গাঠের মৈথুনরত মিথুন এক বস্তু নয়। এখানে প্রতীকের কোন অবকাশ নেই—‘মৈথুনরত-মিথুন’ অথবা ‘যৌথ যৌনাচারের’ প্রত্যক্ষ বিজ্ঞাপনে নেই সেই প্রতীক ব্যঞ্জনা যা পাই শিবলিঙ্গের পরিকল্পনায়।

হ্যাভেল-সাহেবের ঐ উক্তিটির পরে মিস্টার লীসন বলেছেন—“Like the magic syllable AUM” [ঐন্দ্রজালিক শব্দাংশ ‘ঔ’-এর মতো]। এই মতটি লীসন সংগ্রহ করেছিলেন মার্গ পত্রিকায় প্রকাশিত Mr. Alain Daneileu-এর একটি প্রবন্ধ থেকে। যুক্তির মূল উৎস্য ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি শ্লোক :

“তদেতান্মিথুনমোমিত্যেতান্মিথুনসংসৃজতে যদা বৈ মিথুনৌ

সমাগচ্ছত আপন্নতো বৈ তাবন্যোন্যাস্য কামম্ ॥১।১।৬”

মার্গ পত্রিকায় লেখক তার অনুবাদে বলেছেন, “The union of the sexes is equivalent to the magic syllable AUM. When the two sexes come together, each fulfils the desire of the other [বিপরীত লিঙ্গের মিলন ঐন্দ্রজালিক শব্দাংশ ‘ঔ’-এর সমার্থক। যখন বিপরীত লিঙ্গদ্বয় সংযুক্ত হয় তখন একে অপরের কামনার অবসান ঘটায়।]

আপাতদৃষ্টিতে অনুবাদটি ত্রুটিহীন মনে হতে পারে, কিন্তু উপনিষদকারের মৌল বক্তব্যের পারস্পর্য লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, অনুবাদ ঠিক হয়নি। ঠিক পূর্ববর্তী শ্লোকটির আলোচনা করলেই বোঝা যাবে এখানে ‘মিথুন’ শব্দটির ব্যঞ্জনা ভিন্নপ্রকার। সেখানে ‘Sex’ বা ‘লিঙ্গযোনির’ মিলন অর্থে ‘মিথুন’ শব্দের প্রয়োগ হয়নি। ঠিক পূর্ববর্তী শ্লোকটি হচ্ছে :

“বাগেব ঋক প্রাণঃ সাম ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীতম্ভা

এতান্মিথুনং যদ্বাক চ প্রাণশ্চ ঋক চ সাম চ ॥” ১।১।৫

অর্থাৎ—“বাক্যই ঋক, প্রাণই সাম, ‘ওম’ এই অক্ষর উদগীত। বাহ্য বাক ও প্রাণ, অথবা ঋক ও সাম—তাহাই মিথুন।”

সুতরাং ‘ঋক ও সাম’-এর মিলনকে, ‘বাক ও প্রাণ’-এর এই সংযোগকে—যা নাকি ঐ ঔ মন্ত্রে উদগীত—তাকে প্রকাশ করতে ঐ ‘মৈথুনরত-মিথুন’ মূর্তিগুলি খোদিত এ কথা মনেপ্রাণে গ্রহণযোগ্য? ‘ঋক-সাম’ মিথুনে, ‘বাক-প্রাণ’ মিথুনে আর যাই থাক ‘Sex’ নেই।

ডক্টর কুমারস্বামী একস্থলে বলেছেন, “ভারতীয় শিল্পে যৌন-প্রতীকের মাধ্যমে জগৎপ্রপঞ্চের লীলার প্রকাশ—পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনে বিশ্বছন্দের অনুবর্তন।” মানাছি; নিঃসংশয়ে মানাছি। কিন্তু প্রথম চারটি পর্যায়ের মিথুন ভাস্কর্য অতিক্রমণে যখন ‘যৌথ-যৌনাচারে’ এসে ঠেক তখন যে হালে পানি পাই না। একাধিক নারী পুরুষের এ জাতের যৌথ-সন্তোগের কথা তো ভারতীয় শাস্ত্রে সাহিত্যে কোথাও নেই। বাল্মীকী, কালিদাস, ভাস থেকে বৈষ্ণব পদকর্তার, বস্তুত আ-ভারতেন্দ্রে কোন ভারতীয় কবিই নারীদেহের বর্ণনায়, শৃঙ্গার-রস পরিবেশনে এবং যৌন সন্তোগের চিত্র চিত্রণে কখনই তো সজ্জ্বলিত হননি—কিন্তু কই এক রাজা যৌথভাবে তাঁর একাধিক রানীর সঙ্গে কামক্রিয়ায় রত এমন বর্ণনা পড়েছি বলে তো মনে করতে পারছি না। যৌথ যৌনাচার না আছে সাহিত্যে, না শাস্ত্রে। না উপনিষদে, না কৃষ্ণলীলার, এমন কি—আজ্ঞে হ্যাঁ, না বাৎসর্যনের

কামশাস্ত্রে। যাক, এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। আপাততঃ আমাদের সিদ্ধান্ত : ডক্টর কুমারস্বামীর ঐ বৃত্তি প্রথম চারটি পর্যায়ে মিশ্রিত নেই সীমাবদ্ধ এবং ‘একামেবাবিধীতীয়ম্’ সূত্রে কলিঙ্গ-মন্দিরের যাবতীয় মিশ্রনের ব্যাখ্যা চলে না।

২) **আনন্দ** : অনুবৃত্তভাবে পূর্বাচার্যরা যখন বলেন, মদনানন্দের পথেই ভূমানন্দের আশ্বাদন সম্ভব—উপনিষদের এই নারিক নির্দেশ, তখন আমরা বলব এটা আংশিক সত্য, ‘হোল-ট্রুথ’ নয়। পশ্চিমজাতের যৌথ-যৌনাচারে যে সম্ভোগসুখ—যদি আদৌ থাকে—তবে তাকে সেই অর্থে ‘আনন্দ’ বলব না, যে অর্থে উপনিষদকার বলেছেন ‘আনন্দাক্ষেব খল্লিমানি ভূতানি জায়ন্তে’, বলেছেন, ‘আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভোতি কদাচন, ন বিভোতি কুতশ্চন ॥’

যৌথ যৌনাচার অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করে দেখব—তাই আপাতত সে প্রসঙ্গ মূলতুর্বি থাক।

৩) **প্রলুক্কিকরণ** : এ মতের বস্তু্য বিশেষভাবে বোঝা যায় মিস্টার রাউনের একটি উদ্ধৃতি থেকে। ১৪ পূরী মন্দিরের প্রধান পুরোহিত নারিক ঐ বিদেশী পর্যটককে বলেছিলেন, “জগন্নাথ মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশের পথটি মানবজীবনের পথের সঙ্গে তুলনীয়। পথের দুধারে নির্বিচারে সাজানো আছে ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনার নানান উপকরণ, যাকে তোমাদের ধর্মপ্রচারকেরা বলেন, ‘দুর্নীতিপূর্ণ, অশ্লীল।’ কিন্তু ফ্রয়েড কি অশ্লীল? সত্য কখনও অশ্লীল হতে পারে?...তীর্থযাত্রী যদি বহিরঙ্গের ঐ সব ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনার আবর্তে পড়ে যায়, তবে মন্দিরের বাহির দ্বার থেকেই তাকে ফিরে আসতে হবে। মন্দির প্রবেশে সে অনধিকারী। তার চিত্তশুদ্ধি হয়নি।”

তত্ত্বটা মনে নিতে পারছি না। একাধিক কারণে। প্রথম কথা : মলমূত্রাদি ত্যাগও আবশ্যিক জৈব পর্যায়—নিঃসন্দেহে সেগুলি জৈব সত্য; সত্যই। কিন্তু শিম্পরাঙ্গ্যে ঐ সব জৈবিক বৃত্তির প্রতিফলন বিশ্বশিম্পী সর্বদেশে সর্বযুগে পরিহার করে গেছেন। কোপেনহেগেনের মূত্রত্যাগরত বালকের প্রতিমূর্তি ‘ম্যানিকিন পীস্’কে একমাত্র ব্যতিক্রম হিসাবে ধরে নিলে বিশ্বশিম্পের কোথাও ঐ জাতের জীবন সত্যকে সার্থক শিম্পের উপজীব্য হতে দেখি না। ‘সত্য’ যে অর্থে শিব ও সুন্দর, সে সত্যের ব্যঞ্জনা অনেক ব্যাপক—প্রতিটি জৈবিক বৃত্তি সে অর্থে শিম্পে সুন্দর নয়, শিব নয়। ফ্রয়েডের থিয়োরি নিশ্চয় অশ্লীল নয়—যেহেতু তা একটি জৈবিক সত্যের বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা। তাঁর অমর গ্রন্থ ‘Psychopathologie des Alltagslebens’, যাতে নর ও নারী নামধেয় জন্তু—আজ্ঞে ইঁদা, জন্তুই—স্তন্যপায়ী ‘হোমো-স্যাপিয়ন্স্ স্যাপিয়ন্স্’—ভাদের তথাকথিত যৌনবিকৃতির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা সমন্বিত। ফলে নিশ্চয়ই তা অশ্লীল নয়; কিন্তু ঐ গ্রন্থটি অবলম্বনে যদি কোন প্রযোজক একটি নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করেন, তবে নিঃসন্দেহে সেই নাট্যপ্রচেষ্টা যৌন-‘বিকৃতি’ই দেখাবে—এবং নিছক বিকৃতি কোন শিম্পপদবাচ্য হতে পারে না, বৈজ্ঞানিক সত্য হলেও।

দ্বিতীয়ত হিন্দুধর্ম উদার এবং সহনশীল। তীর্থযাত্রীকে—মনে রাখবেন, আমি সত্যানুসন্ধানী সংসারত্যাগী সম্রাসীর কথা বলছি না, মন্দিরদ্বারে সমাগত মানুষের বৃকোদরভাগের কথা বলছি—শতকরা পঁচানব্বইভাগ যাত্রীর কথা বলেছি—সেই সাধারণ তীর্থযাত্রীকে হিন্দু শাস্ত্র, হিন্দু ধর্ম, তার লৌকিক আচার কখনও এভাবে পিছন থেকে টেনে ধরতে চায় না। সকল অবস্থাতেই সে মুক্তিকামীকে সাহায্য করে। অযুত-নিযুত তীর্থযাত্রী যখন সংসারের যাবতীয় কামনা-বাসনাকে সাময়িকভাবে জয় করে বিশুদ্ধচিত্তে মন্দিরের প্রবেশদ্বারে এসে দাঁড়ায় ঠিক তখনই তার চোখের সামনে সেই ভুলে-থাকা অধ্যায়গুলি পুনরায় মেলে ধরার নির্দেশ কোনও হিন্দুশাস্ত্রে নেই। শাস্ত্রকার জানেন, সংসারে পাক আছে—আমরা সেই পাকের মধ্যেই বাস করতে বাধ্য, তাই সংসারীকে শাস্ত্রজ্ঞানীরা বলেছেন—পাকাল মাছের মত হতে। পাক গুলিয়ে সমস্ত জলটা দূষিত করার এ আয়োজনটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাই মিস্টার টমাসের মতটিই এ-ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে : “This is a modern interpretation inspired by Western notion of the indecency of sex, and it

is doubtful if this was the real intension of the builders of the temples." ১৫

[পাশ্চাত্য-চিন্তায় বৌনতাকে যে অশালীন মনে করা হয় সেই চিন্তাধারা থেকেই সাম্প্রতিককালে এই মতটি উদ্ভাবন করা হচ্ছে। এ জাতীয় চিন্তা মন্দির নির্মাতাদের মনে আদৌ ছিল কি না সন্দেহ জাগে।]

৪) **সরলতা**: মিস্টার লীসন তাঁর সংকলন-গ্রন্থে এই ভাবনাটিকে অপেক্ষাকৃত ভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন, কারণ একটি ছোট অনুচ্ছেদে এই মতবাদের উল্লেখমাত্র করে প্রসঙ্গান্তরে এসেছেন। আমাদের মতে ব্যাপক-অর্থে এই মূর্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এটি আমরা পরে পৃথকভাবে আলোচনা করব।

৫) **‘ভুক’-হিসাবে**: মিস্টার লীসন তাঁর গ্রন্থে এ বিষয়ে তিনজন পূর্বাচার্যের মত উদ্ধৃত করেছেন। তিনজনই প্রতীচোর পণ্ডিত—যাঁরা বলতে চেয়েছেন যে, অপদেবতা বা কু-লোকের দৃষ্টিপথ থেকে মন্দিরকে রক্ষা করতে এই কদর্ভ মূর্তিগুলি উৎকীর্ণ, ঠিক যেভাবে আজও হিন্দু এবং মুশলমান রাজমিস্ত্রি কারও ভদ্রাসন গেঁথে তোলার সময় একটি বাঁশের ডগায় ঝাটা-চুবাড়ি-জুতো বেঁধে দেয়; অর্থাৎ: বুড়ি নজরবালে ভেরা মু-কাল।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে কোনও প্রাচ্য শিল্পশাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করে দেখাতে পারেননি—না নাগর-শিল্প, না দ্রাবিড়-শিল্প। তাঁরা এ কথাও বলেননি, “In the middle Ages many churches (in Europe) had phalluses on their outer walls to protect them from evil influences, but in almost all cases these were destroyed afterwards as ‘depraved’.” ১৬

তাঁদের সূত্র হচ্ছে—এ দেশীয় কিছু আর্শাক্ত গ্রাম্য লোকের মুখের কথা।

মূর্তিটি গ্রহণযোগ্য নয়। এমন একটা ব্যাপক শিল্পচেতনা, যার ব্যাপ্তি একটি উপমহাদেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত, এমন একটি দীর্ঘস্থায়ী শিল্পপ্রকাশ—মিথুনবাদ—যার সময়ের ব্যাপ্তি প্রায় সহস্রাব্দকাল, তার পিছনে কয়েকজন গ্রাম্য লোকের কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নেই তা কেমন করে মেনে নেব? মানছি, হয়তো এ-জাতীয় চিন্তা কোনও মিস্ত্রিকে প্রভাবিত করেছিল বা করে। আপনার-আমার ভদ্রাসন গেঁথে তোলার সময় মিস্ত্রিদের এই কুসংস্কারকে আমরা মেনে নিই। কেন? কারণ, জানি—আয়োজনটা সাময়িক, স্থায়ী নয়। এই মিস্ত্রিই যদি বলত, ‘বাবুমশাই, শুধু গৃহপ্রবেশের দিনে নয়, আবহমানকাল আপনার ভদ্রাসনের মাথায় এই ঝাটা-জুতো বাঁধা থাকবে তাহলে তার সে আবদার আমরা মেনে নিতাম না। সুতরাং এই সাময়িক অথবা আঞ্চলিক কুসংস্কারটাকে—যা সংগ্রহ করে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ মত ঘোষণা করেছেন সেটাকে মেনে নেওয়াটা হবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ হিসাবে মেনে নেওয়া: আর্চ ডিউক ফার্ডিনান্ডের হত্যাকাণ্ড।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি, খ্রীউঁমলা অগ্রবাল বলেছেন “Passages in the Utkal-Khand, the Agni Purana and the Brihat Samghita support the view that such obscene figures were intended to protect the structures against lightning, cyclones or other visitations of nature” ১৭

[উৎকলখণ্ড, অগ্নি পুরাণ ও বৃহৎ-সংহিতার কোনও কোনও প্লোকে উল্লেখ আছে যে, এই অঙ্গুল মূর্তিগুলি বজ্রপাত, বজ্রা বা এই জাতীয় প্রাকৃতিক দুর্ভোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খোদিত।] কিন্তু এই সকল গ্রন্থের কোথায় এ জাতীয় প্লোক লেখিকা দেখতে পেয়েছেন তাঁর উল্লেখ না থাকায় আমরা তা যাচাই করে দেখতে পারি।

৬) **আকর্ষণ**: Alain Daneilou এই মত প্রতিষ্ঠা করতে লিখেছেন, “এই জাতীয় মূর্তির সন্ধান সাধারণ মানুষ মন্দিরের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে, পোতা থেকে মন্দির চড়ার সর্বদ্য অবশেষ করে চলে। এভাবে প্রদক্ষিণ করতে করতে

এবং সেই সঙ্গে ফুল ও ধূপের গন্ধে, আরতির আলোয়, শব্দস্বচ্ছন্দাধ্বনিতে ক্রমশঃ তার মন বদলে যায়—সে মন্দিরের পবিত্র আবহাওয়ায় ধরা দেয়। ১৮

যুক্তিটা মেনে নিলে ধরে নিতে হয় মন্দির নির্মাতাদের না ছিল তত্ত্বজ্ঞান, না সাধারণবুদ্ধি। তত্ত্বজ্ঞান আমাদের বলে—শুধুমাত্র মন্দির পরিষ্কারণ, তাও কোনও ধর্মপ্রেরণায় নয়, নিত্যান্ত কলুষাচিন্তার বশবর্তী হয়ে—কখনও মুক্তির সন্ধান দিতে পারে না, যতক্ষণ না মুমুকুর মনে মুক্তির ইচ্ছা স্বতঃউৎসারিত হয়। অপরপক্ষে যার বিন্দুমাত্র সাধারণ বুদ্ধি আছে সেই অনুমান করবে ‘পোতা থেকে মন্দিরচূড়ার সর্বদ্য’ অশ্লীল মূর্তিগুলি দেখা শেষ হলে যাত্রী আদৌ মন্দিরের প্রবেশদ্বারটি অনুসন্ধান করবে না। সে সন্ধান নেবে : নিকটতম জনপদবধূদের মহল্লাটা কোন দিকে।

৭) **বৌদ্ধশিক্ষা** : এ মতটি আংশিকভাবে গ্রহণযোগ্য। যে কারণে এটিকে আংশিকভাবে গ্রহণযোগ্য বলাছি সেই যুক্তিটি কিন্তু লীসন সাহেব তাঁর গ্রন্থে আলোচনা করেননি। তাই সেটি পরবর্তী পরিচ্ছেদে একাদশতম হেতুসূত্রে পৃথকভাবে আলোচনা করেছি। বর্তমানে আমরা লীসন-সাহেবের পদাঙ্ক-অনুসরণে তাঁর সম্পর্কিত যুক্তিগুলির বিশ্লেষণ করছি মাত্র।

এই মতের ষায়া সমর্থক তাঁরা বলতে চান—কামশাস্ত্র একটি অত্যাৱশ্যক শাস্ত্র। তাই হয়তো বাৎস্যায়ন বর্ণিত কামকলার একটি সচিৎ পাঠ দেওয়া হয়েছে মন্দির গায়ে। আংশিকভাবে একথা সত্য—কারণ উভয়েই, বাৎস্যায়ন এবং কলিঙ্গ ভাস্কর কামকলার চর্চা করেছেন—বাৎস্যায়ন সংস্কৃত শ্লোকে এবং ভাস্করদল ছেনি-হাতুড়ি ৰোগে। ফলে কোন কোন মিথুন মূর্তিতে কামকলার দৃশ্যকে কামশাস্ত্রের সচিৎ পাঠ বলে মনে হতে পারে। খুবই সম্ভব ভাস্করদের মূল নিয়ামক বাৎস্যায়নলিখিত কামশাস্ত্র পড়েছেন বা জেনেছেন, কারণ অনেকগুলি মৈথুনরত মিথুন বাৎস্যায়ন-বর্ণিত বন্ধে উৎকীর্ণ। কিন্তু তাই তো স্বাভাবিক। আপনি যদি বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন তাহলে ৰারে ৰারে আপনাকে ডারউইনের প্রসঙ্গ তুলতে হবে, বিবর্তনের বদলে আপোক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে লিখতে বসলে উঠে পড়বে আইনস্টাইনের প্রসঙ্গ। ঠিক তেমনি কলিঙ্গ-ভাস্কর যখন কামকলি সম্বন্ধে রচনা করতে বসেছেন তখন তাঁকে ৰারে ৰারে বাৎস্যায়নের প্রসঙ্গে ফিরে আসতে হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এগুলি কামশাস্ত্রের সচিৎ পাঠ এটা মেনে নিতে পারছি না।

কোন কোন পণ্ডিত আবার এই সুৰোগে কামকলা-চর্চার মাধ্যমে দার্শনিক তত্ত্ব পেড়ে ফেলেছেন এবং লৌকিক শিক্ষার সঙ্গে অধ্যাত্মবাদকে জড়িয়ে একটা উচ্চপৰ্যায়ের ষোঁরাশার সৃষ্টি করে আমাদের তাক লাগিয়ে দিতে চেয়েছেন। যথা : ডক্টর মুগকুরাজ আনন্দ বলছেন, “Since sexual curiosity is, apart from the awakening of sensibility towards Reality, also one of the main causes of the perversions of the mind, it must be satisfactorily explained and analysed, so that education can lead not only to healthy enjoyment of the variegated pleasures of the body also clarify the mind of the filth attached to the sacred act.” ১৯

[যৌন অনুসন্ধিৎসা শুধু বাস্তবতার (ডক্টর আনন্দ ক্যাপিটাল ‘R’ ব্যবহার করেছেন, ফলে বাস্তবতার বদলে ‘পরমসত্য’ শব্দটাই ব্যবহার করা উচিত) প্রতি বোধের উল্লেখই করে না, তা মানবমনের বিকৃতির অন্যতম মূল হেতু। এই অনুভূতিটাকে ব্যাখ্যা করতে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে—এমনভাবে, যাতে ঐ যৌন শিক্ষা দৈহিক-মিলনের বিভিন্ন স্বাস্থ্যসম্মত পর্যায়গুলি সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করতে পারে এবং ঐ সঙ্গে ঐ পবিত্র ক্রিয়ার বিষয়ে আমাদের মনের সকল কলুষ অপনোদন করতে পারে।]

অবাক হতে হয় পণ্ডিতগণ্য আনন্দ-এর এই ব্যাখ্যা শুনে। তিনি কেমন করে সব কয়টি ভাৱ্যৰ্কে ‘স্বাস্থ্যসম্মত

পর্যায়' বলতে পারলেন? এমন কতকগুলি মিলনের আসন খোঁদিত হয়েছে যা বাস্তবে আদৌ সম্ভবপর নয়। এমন শীর্ষাসনে নিরবলম্ব অবস্থায় কোমও একটি মর মানুষের পক্ষে (চিত্র : ৮৫) একই কালে একাধিক স্ত্রী-সন্তোগ বাস্তবে অসম্ভব; বাস্তবসম্মত তো নয়ই—তাছাড়া বাৎসর্যায়ন থেকে হ্যাভলক এলিস কেউই এমন উৎকৃষ্টে যৌন সঙ্গমের বর্ণনা কোথাও কখনও করেননি—সেগুলি সব healthy enjoyment of the variegated pleasures? ক্যাপিটাল 'R' কেন ছোট হাতের r-বাহুহত reality-র (বাস্তবতার) ধারে কাছে সেগুলি নেই। পরিষ্কার বোঝা যায়, যৌন-সঙ্গমের পটভূমিতে শিল্পী কম্পলোকে ভাসমান। বাস্তবে অসম্ভব জেনেও যেমন তিনি কম্পলোকের গজ-বিয়াল, সিংহ-বিয়াল, বক-কিম্বর-উদ্ভীরমান-অঙ্গরী গড়েছেন, তেমনিই খোদাই করেছেন এই অবাস্তব যৌন সংসর্গের দৃশ্য—সেগুলি আদৌ যৌন অনুভূতির বাস্তব 'ব্যাখ্যা' বা বিজ্ঞানসম্মত 'বিশ্লেষণ' নয়। নিছক শিল্পীমনের প্রতিফলন। যৌথ যৌনাচারের দৃশ্যগুলিতে—যেখানে এক নারী বহু পুরুষের সঙ্গে, অথবা এক পুরুষ একাধিক রমণীর সঙ্গে যৌথভাবে একই কালে উদ্দাম যৌনক্রিয়ায় রত সেগুলিও মূলকরাজের মতে sacred act? পবিত্র ক্রিয়া?

৮) তত্ত্বশিক্ষা : এ ক্ষেত্রেও দেখছি, মিস্টার লীসন বাদ্যের মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁরা সবাই প্রতীচ্য-খণ্ডের পণ্ডিত। এবারেও একমাত্র ব্যতিক্রম সেই ভারতীয় কলাবিশারদ ডক্টর মূলকরাজ আনন্দ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কথা থাক, শেষোক্ত ভারতীয় পণ্ডিতটিও কি জানতেন না যে, বামাচার, চীনাচার, তান্ত্রিক এবং বজ্রযানী বৌদ্ধদের গোপন সাধন পর্যায় ঠিক বাইবেল-বর্ণিত "Come unto Me and thou shall be saved." [আমার ক্রোড়ে আশ্রয় লও, মুক্তির সন্ধান পাইবে]—মন্ত্রে বিধৃত নয়? কাপালিক, তান্ত্রিকেরা তো বটেই এমনকি আউল-বাউল-সহজিয়াপন্থীরাও তাদের ধর্মীয় আচারে যৌনাচারের তথ্য অত্যন্ত সঙ্গোপনে রাখে। এ নিয়ে য'রা গবেষণা করেছেন, অনুসন্ধান চালিয়েছেন একমাত্র তাঁরাই জানান সাধন-ভজনের ঐ সব গুহ্যতত্ত্ব কত গোপনে রাখা হয়। সেই একান্ত গুরুমুখী গুহ্যবিদ্যার প্রচারার্থে কাপালিক-তান্ত্রিকেরা মন্দিরগারে মূর্তি উৎকীর্ণ করে যাবে এ-কথা একমাত্র বাতুলে বলতে পারে।

লক্ষণীয়, আমাদের আপত্তি ঐ 'শিক্ষা' শব্দটিতে। 'তত্ত্বশিক্ষা' না বলে যদি বলা হত 'তত্ত্বের প্রভাব' তাহলে এতটা আপত্তি করতাম না। আচার্য ব্রজেন শীলের মন্তব্যে আমরা ইতিপূর্বেই জেনেছি—এই মূর্তিগুলির পরিকল্পনায় বজ্রযানী ও মহাযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধদের প্রভাব পড়ে থাকতে পারে। কী ভাবে, কোন পথে এ প্রভাব উড়িয়া তথা পূর্বভারতের অন্যান্য ক্ষেত্রে ভাস্করদের প্রভাবিত করেছিল তার আলোচনা আমরা পরবর্তী একটি অধ্যায়ে সবিস্তারে করব। আপাতত আমরা এখানে মিস্টার লীসনের মূর্তিগুলি বিশ্লেষণ করছি মাত্র। তাই আপাতত আমাদের বক্তব্য—তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের সচিহ্ন বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে—'তত্ত্বশিক্ষা' দিতে এগুলি উৎকীর্ণ করা হয়েছে এই মত গ্রাহ্য নয়।

মিস্টার লীসন তাঁর গ্রন্থে ঐ আর্টটি সম্ভাব্য হেতু নিয়ে শুল্ক আলোচনা করেছেন। আগেই বলেছি, গ্রন্থের উপসংহারে তিনি কোনও সিদ্ধান্তে আসেননি। বরং পাঠককেই প্রশ্ন করেছেন : বলুন? কোন মতটি গ্রাহ্য?

পাঁচ

॥ আরও তিনটি সম্ভাব্য যুক্তি ॥

আমরা তা বলব না।

আমরা বরং অন্য কথা বলব। পূর্বসূরীদের ঐ আর্টটি মতামত বিচার করে আশঙ্কা হচ্ছে এ-বিষয়ে আমরাও হয়তো শেষ কথা বলে যেতে পারব না। না পারি ক্ষতি নেই, কিন্তু যেটুকু বলব তা যেন বিজ্ঞানসম্মত সমীক্ষার অনুবর্তী হয়। ইতিপূর্বেই আমরা বিভিন্ন জাতের মিথুনকে ভিন্ন-ভিন্ন নামে চিহ্নিত করেছি। বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় সেটাই ছিল প্রথম ধাপ। এবার আমরা বরং দেখব, মিথুনমূর্তিগুলি কী ভাবে বিবর্তিত হয়েছে—কী ভাবে ‘মিথুনবাদ’ রূপান্তরিত হল ‘মৈথুনবাদে’। ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় প্রভাবে তার গতিপ্রকৃতি আদৌ নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল কি না। ঐ উদ্দেশ্যে আমরা নমুনা হিসাবে উড়িষ্যার এগারোটি প্রধান মন্দির এবং খাজুরাহোর ছয়টি মন্দিরে পণ্ড প্রকারের মিথুন-মূর্তির একটি পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছি। দেখেছি—কী ভাবে অপ্রগল্ভ যুগলমূর্তি উত্তেজিত হয়েছে, শৃঙ্গারে মেতেছে, এবং শেষপর্যন্ত সঙ্গমে চূড়ান্ত তৃপ্তি আবাদন করেছে। ঐ পরিসংখ্যানই আমাদের ইঙ্গিতে জানিয়েছে—কী ভাবে কালঙ্গ-খাজুরাহোর ভাস্কর খীরে খীরে ষিধা সঞ্চেচ লজ্জাকে জয় করে যা ছিল গোপন, যা ছিল অন্তরালে তাকে প্রকাশ করেছেন; কয়েক শতাব্দীর বিবর্তনে দর্শকের বৃষ্টি পরিবর্তিত হয়েছে—যে দৃশ্য তারা পূর্বযুগে বরদাস্ত করত না, পরবর্তী যুগে তাই বরদাস্ত করেছে। কিন্তু সেসব তথ্য পরিবেশনের পূর্বে একটি কথা বলা প্রয়োজন : লীসন-সাহেব সঙ্কলিত আর্টটি হেতু ছাড়া আরও তিনটি মৌল হেতুর আলোচনা করা দরকার। এই তিনটি সম্ভাব্য হেতুর প্রথম দুটির বিষয়ে পূর্বাচার্যরা আলোচনা করেছেন—বদিও লীসন-সঙ্কলিত গ্রন্থে তার উল্লেখ নেই। তৃতীয় সম্ভাবনা সূত্র নিয়ে ইতিপূর্বে কোন গ্রন্থে আলোচনা হতে দেখিনি।

৯) **বিতৃষ্ণাউজ্জোগার্থে** : এ মতটি, আগেই বলেছি, শ্রদ্ধের রামেন্দ্রসুন্দর গ্রিবেদীর। মানসী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে দেখছি, তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলছেন, “ধর্ম হিসাবে বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান সম্যাসী দেহটাকে অত্যন্ত কদর্য বলিয়া গণ্য করিত। ইন্দ্ৰিয়গুলিই বিপদ ও বেদনা আনয়ন করে; গলিত ন্যাকারজনক দ্রব্য সম্মুখে ধরিলে রূপজ মোহ জয় করিতে হইবে।”

রামেন্দ্রসুন্দরের মতে “উপনিষদের নির্দেশ : জগৎ আনন্দময়, মধুময়। যেখানে সংসারটাকে হয় ও কদর্য করিবার চেষ্টা দেখা যায় সেটা বৌদ্ধভাব প্রণোদিত। যেখানে সুন্দর দেখাইবার চেষ্টা, সেখানে ব্রাহ্মণ্যভাব প্রবল।”—তিনি আরও বলছেন, স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীরাও ঐ বৌদ্ধ প্রভাবে সৌন্দর্যকেও কুৎসিত রূপে এঁকে রূপজ মোহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ গ্রিবেদী মশাই কবি ভীষ্মহরির বৈরাগ্যশতকের একটি উদ্ধৃতিও শুনিয়েছেন :

স্তনৌ মাংসগ্রহী কনককলসাতত্বাপমিতৌ

মুখং স্নেহাগারং তদপি চ শশাঙ্কেন তুলিতং।

স্রবশ্চ্যোক্তিমং করিকরস্পর্শি জঘনং

মুহূর্নিন্দ্যং রূপং কবিরবিশেষেণৈবুৎকৃতম্ ॥

আমরা পণ্ডিতপ্রবর রামেন্দ্রসুন্দরের এ মতটি নানাকারণে গ্রহণ করতে অসমর্থ।

প্রথমতঃ কোন শিল্পীকে বা শিল্পীদলকে এভাবে সাধারণসূত্রে বাঁধা ঠিক নয়। শিল্পী—তিনি চিত্রকর, ভাস্কর,

কবি, সাহিত্যিক যাই হোন না কেন—যখন যে রস পরিবেশন করেন তখন সেই রসের সমুদ্রেই অবগাহন করেন। এবং আমাদেরও ঐ সঙ্গে সেই রসে আকষ্ট নির্মজ্জিত করেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা তাঁদের ধর্মশাস্ত্রে ‘দেহটাকে অত্যন্ত কদর্ষ বলিয়া গণ্য করিত কি করিত না’ সেটা পরের কথা, তাদের শিষ্যে কি সে তথ্য প্রতিফলিত? অজস্র লক্ষাধিক চিত্রে ও মূর্তিতে স্বীপুরুষের আলেখ্য দেখে—সাঁচী, ভাজা, কাহ্নেরী, মথুরা, সারনাথ, নালন্দার লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ শিল্পনিদর্শন দেখে তা তো আমার মনে হয়নি। বৌদ্ধ শিল্পীরাও মানবদেহে সুন্দরকেই দেখেছিলেন, যে সুন্দরের সঙ্গে শিব ও সত্য সম্পৃক্ত। রামেন্দ্রবাবু কবি ভট্টহরির একটি শ্লোক শুনিয়েছেন—দেখছি, বৈরাগ্যশতকে ভট্টহরি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, রমণীর স্তনদ্বয় স্বর্ণকলসের উপমান নয়, মাৎসর্যহীমাত্র; মুখ চাঁদের সঙ্গে তুলনীয় নয়, শ্লেষ্মাগারমাত্র; করিকরম্পর্ধি বলে বর্ণিত জজ্বার সঙ্গমস্থলও ক্রোদাক্ত ইত্যাদি। ঐ কবি ভট্টহরির আর একটি কবিতা শ্যামাপদ চক্রবর্তীর অনুবাদে এবার আপনাদের শোনাই:

“অগ্নি নবযৌবনা

তোমার নিন্দা করি পণ্ডিতজনা

আপনারে করে প্রতারণা আর অন্যে প্রবণনা।

সব সত্যের সার

তপস্যাফল স্বর্গ, আবার স্বর্গের ফল সুখারস শৃঙ্গার ॥”২০

বলুন: কোন ভট্টহরির সত্য?

আমি বলব: দুজনই। কবির দুটি ভিন্ন মুড়ে রচিত দুটি কবিতার কোনটিই মিথ্যা নয়। এই জগত-প্রপঞ্চে কবি আমাদেরই মত দু’কুড়ি সাতের খেলা খেলে চলছেন। তবে আমাদের চেয়ে তাঁর অন্তর বেশী মাত্রায় সংবেদনশীল, এই যা; আর সেই আন্তর-স্পন্দন তাঁর প্রকাশ মাধ্যমে অনুরণিত হয়ে আমাদের অন্তর স্পর্শ করে বলেই তিনি কবি, তিনি শিল্পী। কবি কখনও বলেন ‘মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে’, কখনও বলেন ‘মরণ, তু আও রে আও’।—এর মধ্যে কোনও বিরোধ নেই; প্রাস্তি তখনই যখন তাঁর এক বিশেষ মুড়ে রচিত সৃষ্টিকে অবলম্বন করে আমরা একটি সাধারণ সূত্র খুঁজতে যাই।

সে যাই হোক, বিতৃষ্ণা উদ্বেকের জন্য শিল্পীরা ঐ অনবদ্য মূর্তিগুলি খোদাই করেননি। তা করলে মূর্তিগুলির মুখাবয়ব বীভৎস হত, কদর্ষ হত (যেমন দেখতে পাই মধ্যযুগের যুরোপীয় চার্চে পাপীদের নরকবাসের চিত্র-ভাস্কর্যে)—অমন স্বর্গীয় হাসির আলিঙ্গন সঞ্চিত হতে দেখতাম না সঙ্গমরত নরনারীর অধরপ্রান্তে।

১০) ক্লাস্তি-অপনোদন: এই মতটি পরিবেশন করেছিলেন অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু। তিনি লিখেছেন “কণারকের বিশাল আকার দেখিয়া জানিতে ইচ্ছা করে—কিসের প্রেরণায় শিল্পীরা বহুকাল ধরিয়া এমন রচনার নিষ্পত্তি ছিলেন এবং কিসেই বা এতকাল ধরিয়া তাহাদের উৎসাহকে সচেতন রাখিয়াছিল।...এতগুলি বহুকাল ও তাহারও অধিক সংখ্যায় রমণীয় ললিতমূর্তি দেখিয়া মনে হয় যে, শিল্পীদের উৎসাহ সংরক্ষণে এগুলির স্থান নীচে নহে। এরূপ মূর্তি তৈয়ারী করিতে করিতে তাহাদের উৎসাহ কমিবার কোনও কারণ থাকে না, বরং অবসাদের সময় চিত্রের ব্যাখ্যানবস্থাই তাহাদের কাজে বাঁধিয়া রাখিবে।...শিল্পীরা এতবড় কাজ করিয়া থাকিলেও তাহারা যে আমাদেরই মত প্রাস্ত হইয়া পড়িত এবং কোন কাজ নিরন্তর করিতে করিতে অনেকসময় অঙ্গীল উৎসাহবর্ধক ছবি আঁকিত এই রকম কোন কথা সহজভাবে ভাবিলে অনেক গোল মিটিয়া যায় ॥”২১

অধ্যাপক বসু একজন বিশ্ববিদ্বিত পণ্ডিত; উড়িষ্যার স্থাপত্য বিষয়ে তিনি প্রামাণিক গবেষণা করেছেন; তবু তাঁর এ

সিদ্ধান্তটি আমাদের যুক্তিবাদী মন গ্রহণ করতে অসমর্থ। একাধিক কারণে। আমাদের মতে গোল অত সহজে মেটে না। ভিন্ন দেশে ভিন্ন কালে কোনাৰ্ক মন্দিরের নতো, অথবা তার চেয়েও বড় স্থাপত্য-কীর্তি মর-মানুষেরাই গড়ে তুলেছে—এমন মানুষ যারা ভিন্ন দেশ-কালের হলেও ‘আমাদেরই মত শ্রাস্ত হইয়া পড়িত।’ যথা : মিশরের একাধিক পিরামিড, আশ্মান বা আবু-সিহেলের মন্দির, পারস্য স্থাপত্যে পার্সিপোলিস-এর শতশৃঙ্খলের প্রাসাদ, এথেন্সের গ্রীকশৈলীর এ্যাক্রোপোলিস বা পার্থেনন, রোমের প্যাট্রিয়ন, কলোসম অথবা সেন্টপীটার গীর্জা। এগুলি আকারে, আয়তনে, উচ্চতায় কোন ভাবেই কোনাৰ্ক সূর্যমন্দিরের অপেক্ষা নূন নয়। ভারতবর্ষেও অজন্তা-এলোরা, রামেশ্বরমের শিবমন্দির, অথবা তাজমহলে যত ‘ম্যান-ডেজ’ অর্থাৎ যত কারিগর যতদিন ধরে কাজ করেছে তা-ও কোনাৰ্কের অপেক্ষা কম হবে না। কই, এদের কোনটির ক্ষেত্রেই তো শিল্পীদের ক্রান্তি অপনোদনের জন্য ও-জাতীয় বিচিত্র ব্যবস্থা করবার প্রয়োজন হয়নি? শিল্পীরা যে ক্রান্ত হয়ে পড়তেন এ-কথা কে অস্বীকার করবে? সব বড় কাজেই ক্রান্তি আসে; কিন্তু সেজন্য তাদের কাজে বেঁধে রাখবার এই অভিনব আয়োজন অবিশ্বাস্য। পিরামিড থেকে হুভার-ড্যাম—কোথাও কর্মীদের এভাবে উৎসাহ জোগানোর প্রয়োজন হয়নি। সে অর্থে মানুষের গোটা জীবনটাই তো এক-থে’য়ে কাজের একটা নিরবচ্ছিন্ন শৃঙ্খল। এদিকে ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, উকিল, অধ্যাপক, এল. ডি. ক্লার্ক, পিয়ন ওদিকে কৃষক-কামার-কুমোর সূর্যধর সকলেই গুফ-উদ্ভেদ থেকে পলিতকেশ বাথরুমের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত নিজ-পেশার শৌনঃপুনিকতার চাকর বাঁধা।

দ্বিতীয় কথা, কোথায় কী-জাতের মূর্তি বসবে তা নিশ্চয়ই নির্ধারণ করে দিতেন একজন মূল পরিকল্পনাকার বা চীফ আর্কিটেক্ট। তিনি নিশ্চয়ই স্বহস্তে ছোট-হাতুড়ি চালিয়ে দৈহিক ক্রান্তিতে অবসাদগ্রস্ত হতেন না। সেই মূল নিয়ামক যে একজন লঘুচিত্তের দায়িত্বজ্ঞানহীন-ব্যক্তি নন, কোনাৰ্ক মন্দিরের সূর্যমন্দিরেই তার উজ্জল প্রমাণ। সাধারণ কর্মীরা যাতে শ্রান্তিতে ঝিমিয়ে না পড়ে তাই তিনি এমন একটি কালজয়ী স্থাপত্যকীর্তিকে সম্ভানে অগ্নীমূর্তি দিয়ে কলুষিত করে যাবেন এ কথা বিশ্বাস্য? তিনি তো অনায়াসে ক্রান্ত রামের বদলে শ্যামকে-নিয়োগ করে এ অপবাদ এড়াতে পারতেন। কোনাৰ্ক মন্দির তো মাত্র বারো বৎসরে গড়ে তোলা। অপর পক্ষে সেই মূল নিয়ামকের অনুমতি বা অনুমোদনের অপেক্ষা না রেখে রাম শ্যাম যদু আপন খেলালে ক্রমাগত উৎসাহবর্ধক অগ্নীমূর্তি গড়ে যাচ্ছে এ কথাই বা মেনে নিই কেমন করে?

তৃতীয় কথা, এবং সবচেয়ে বড় যুক্তি—যেখানে ঐ ক্রান্তির প্রশ্নই ওঠেনা? ভুবনেশ্বরের ছোট ছোট মন্দির : বৈতাল, মুক্তেশ্বর, রঙ্গেশ্বর, রাজারাণী—সেই জাতের মন্দিরে ঐ মূর্তিগুলির ক্ষেত্রে তো ক্রান্তি অপনোদন-সূর্য প্রযোজ্য নয়?

১১) জনসংখ্যাবৃদ্ধি : এ যুক্তিটির কথা কোন পূর্বসূরীর আলোচনায় লক্ষ্য করিনি। তবু নতুন সমীক্ষার অবতীর্ণ হবার পূর্বে ‘সাধারণ-হেতু’ পর্যালোচনা শেষ করার আগে এটিরও উল্লেখ করি। এ জাতীয় কোন মৌল চিন্তা মূল নিয়ামককে প্রভাবিত করেছিল কিনা আপনারা বিবেচনা করে দেখুন :

দশ-বিশ বছর আগে ভারতরাষ্ট্রে দ্রুগহত্যা ছিল সামাজিক অপরাধ, নৈতিক পাপ। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষে প্রচার করার অপরাধে অনেককে আদালতে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। মাত্র কয়েক দশক পরে দেখাছি—সামাজিক তথা রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে; দ্রুগহত্যা আর আইনত অপরাধ নয়, জন্মনিয়ন্ত্রণ স্বীকৃত। বর্তমানে পরিবার-পরিরক্ষণ-প্রকল্প সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনুমোদন পেয়েছে। পথে ঘাটে, সিনেমা টিভিতে লালচিহ্নকোণের বহুল প্রচার আজ প্রত্যক্ষ সত্য। কেন? কারণ—জনসংখ্যা বৃদ্ধি বর্তমান পৃথিবীতে অন্যতম বৃহত্তম সমস্যা।

মধ্যযুগে অষ্টাষ্টটি ছিল ঠিক বিপরীত। যার রাজ্যে যত জনবল তার সামরিক ক্ষমতা তত বেশি। লক্ষণীয়, আচার্য শঙ্কর পুরোধামে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন নবম শতাব্দীর প্রথম পাদে, বৈতাল-মন্দির নির্মাণের বিশ-দ্বিশ বছর পূর্বে; অর্থাৎ যে সময়-

কাল থেকে ভুবনেশ্বরে মন্দির নির্মাণ তথা কলিঙ্গ ভাস্কর্যে মিথুনবাদের জোয়ার আসে। খাজুরাহোর মন্দিরেও মিথুনবাদ শিকড় গেড়েছে আচার্য শঙ্করের পুরীধাম প্রতিষ্ঠার একশ বছরের মধ্যে। শঙ্করাচার্যের অভ্যুত্থানের পর, শঙ্করের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বহু হিন্দু যুবক যৌবনের প্রথম পর্যায়েই, সংসারাপ্রমে প্রবেশ না করেই সম্যাস গ্রহণ করতে থাকে। এতে রাজশক্তির পক্ষে বিচলিত হয়ে পড়া অস্বাভাবিক নয়। 'সত্ত্ব'-র সঙ্গে ঐরথ্য সংগ্রামে 'রজঃ'-কে 'তম'মুখী হতে হয়। অর্থাৎ যৌবনের প্রথম পর্যায়ে সম্যাস গ্রহণের সাত্ত্বিক প্রবণতার প্রতিবিধানের রাজশক্তিকে এমন প্রচারে নিযুক্ত হতে হয় যাতে প্রজাবৃদ্ধি হতে পারে। সুতরাং এমনও হতে পারে—জনসংখ্যা হ্রাসের প্রয়োজনে আজ যেমন ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্র তথাকথিত লাজ-লজ্জা শালীনতার তোয়াক্কা না রেখে লালচিকোনের প্রচারে মেতেছে, ঠিক তেমনই হয়তো তদানীন্তন রাষ্ট্র ও সমাজ জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনে কামকলিকে বিস্তারিত করতে চাইলেন। আর বিজ্ঞাপনের মাধ্যম নিঃসন্দেহে মন্দিরের বহির্গত—যেখানে প্রত্যহ অসংখ্য নরনারী সমবেত হয়। শঙ্করাচার্যের পুরীধাম প্রতিষ্ঠা এবং কলিঙ্গ ভাস্কর্যে মিথুনবাদে যৌনতাবৃদ্ধির সমকালীন দুটি ঘটনাকে নিত্য কাকতালীয় বলে ধরে নেওয়া হয়তো ঠিক নয়। যুক্তিটা শুধে দেখার।

*

*

*

মন্দির ভাস্কর্যে মিথুনবাদ সম্বন্ধে পূর্বাচার্যদের মতামত আমরা আলোচনা করেছি। অতি সাম্প্রতিক কালে প্রাক্তন খ্রীণীন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী হিন্দুধর্মের বিবর্তন বিষয়ে একটি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিলেতে সেটি Chatto & Windus Ltd. কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। তার একটি অনুচ্ছেদে খ্রীচৌধুরী মন্দির ভাস্কর্যে মিথুনবাদ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইংরেজী গ্রন্থটি দুস্প্রাপ্য এবং ইংরাজী না-জানা বাঙ্গালী পাঠকের কাছে তার আবেদন আস্তের বাইরে। তাই সমসাময়িক ঐ পণ্ডিতের মূল বক্তব্যটুকু আংশিকভাবে এখানে প্রায় অনুবাদের আকারে পরিবেশন করছি :

যদি বলি : হিন্দু-দর্শনকে বুঝে নেবার পথে হিন্দুদের পৌরাণিক ললিতকথা একটি অন্তরায়—তাহলে আমার বক্তব্য দুর্বোধ্য এবং স্বয়ং-বিরোধী বলে অভিযুক্ত হবে। কিন্তু কথাটা সত্য। পুরাণ ও কাব্যে শিব-দুর্গা-কৃষ্ণের যে রূপ, পৌরাণিক অনুভাবনার প্রভাবিত ললিতকথায় ঐ দেবতারই যে প্রতিফলন, তার সঙ্গে হিন্দুদর্শনের শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব চিন্তাধারার মৌল প্রভেদ। হিন্দুধর্মে পৌরাণিক চিন্তা, সংস্কৃতি এবং ভক্তিতত্ত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল। কখনও তারা এক সুরে বাঁধা, কখনও পারস্পরিক সম্পর্ক-বিমুক্ত। বহিরাগতের চোখে হিন্দু-দর্শনের অনুভাবনার সঙ্গে পৌরাণিক শিল্পচিত্তাকে অঙ্গাঙ্গী মনে হয়, এবং তাতেই বিরোধের সৃষ্টি হয়। অনেক আধুনিক ভারতীয় পণ্ডিতও হিন্দুধর্মকে হিন্দু পৌরাণিক চিন্তার সঙ্গে একসূত্রে বেঁধে ফেলতে চান, যার ফলে হিন্দুধর্ম দুর্বলতমস্থলে আক্রান্ত হয়। তার হেতু এই : হিন্দু পুরাণ এবং পুরাণ প্রতিফলিত আনুষ্ঠানিক ললিতকলার দেবদেবীর কাণ্ডাকাণ্ড গ্রীক ও রোমক দেবদেবীদের অপেক্ষা বেশী অসংযমী; ফলে বিদেশী সমালোচকেরা ঐ দেবদেবীদের লৌকিক লীলার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে : যে ধর্মের দেবদেবীর এই জাতীয় আচরণ সে ধর্ম প্রকৃত অর্থে অযোগ্য।

শিব ও দুর্গা পাশ্চাত্যের কাছে ততটা পরিচিত নন, যতটা খ্রীকৃষ্ণের লীলাকাণ্ড। ফলে যে সব সমালোচক হিন্দুধর্মের নীতিমূল্যের দিকে আলোচনার মোড় ফেরাতে চান তারা গোপীজনবল্লভের ব্যাভিচারের প্রসঙ্গ পেড়ে ফেলেন। এক প্রেণীর পাশ্চাত্যদের কাছে এটাই আবার হিন্দুধর্মের প্রতি আকর্ষণের মূল হেতু। আমি বলব, দু'দলই ভুল করেছেন। কারণ হিন্দু পুরাণ এবং হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু, যদিও বহিরাগতের চোখে দর্শন ও পৌরাণিক অনুভাবনাকে সম্পৃক্ত বলে মনে হয়, এবং তাতেই বিরোধের সৃষ্টি।

প্রথমেই বলি—দর্শন ও পুরাণ বাণীত দেবদেবীর রূপারোপের এই যে পার্থক্য এটি শুধু হিন্দু ধর্ম নয়, গ্রীক ও রোমক

সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। উদাহরণ স্বরূপ গ্রীকদেব জিগুস-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রীক দার্শনিকদের দৃষ্টিতে দেবাদিদেব জিগুস অমরত্বের অধিকারী, স্বয়ম্ভু এবং সর্বশক্তিমান। দার্শনিক ক্রিয়েন্সিস (আঃ ৩৩১—২৩২ খ্রীঃ পূঃ) সেভাবেই জিগুসকে এঁকেছেন। অথচ গ্রীক কবির দল—এ্যাস্কাইলস্, সফোক্লিস, এবং ইউরিপিডিস-এর রচনায় জিগুস নিতান্ত রক্তমাংসের মানুষ—কামনা-বাসনা তাঁর মজ্জায় মজ্জায় জড়ানো। মরালের ছদ্মবেশে ছলনার আশ্রয় নিয়ে তিনি যেভাবে লীডার কুমারীকে হরণ করলেন তাতে তাঁর দেবত্ব অটুট থাকে না। জিগুস-এর মতো আফ্রোদিতির রূপও গ্রীকরা বিশ্বাস করত। গ্রীক দার্শনিকদের অনুভাবনায় আফ্রোদিতি শুধু সৌন্দর্যের নন, প্রজ্ঞাপারমিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, অথচ গ্রীক কবি ও শিল্পীদের কলমে আফ্রোদিতি মানবী ছাড়া আর কিছু নয়।

হিন্দু সংস্কৃতিতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। শৈব, শক্তি এবং বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে শুধু মাত্র শিবের বিবর্তনটাই এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করছি। স্বয়ং কালিদাস শিব ও পার্বতীর মিলনকে রঘুবংশের প্রথম স্কন্ধে বর্ণনা করেছেন নিকষিত হেমের মুছনায়।

“বাগর্থ বিবসংপৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্যে।

জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌঃ ॥”

বাক্য এবং তার অন্তর্নিহিত অর্থ যেমন পরস্পর অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ, হরপার্বতীর মিলনকে মহাকবি সেভাবেই বর্ণনা করলেন। এ-ক্ষেত্রে হরপার্বতীর মিথুন ছান্দোগ্য উপনিষদের ‘বাক প্রাণ’ মিথুনের সঙ্গে তুলনীয়।

শকুন্তলা কাব্যেও কালিদাস শিব-পার্বতীকে অপার্থিব করে এঁকেছেন প্রজ্ঞার অর্ঘ্য সাজিয়ে, যথেষ্ট সন্তানের সঙ্গে।

সেই শৈব মহাকবি কিন্তু তাঁর ‘কুমারসম্ভবম্’-এ এ দৃষ্টান্ত স্বীকার করতে পারেননি। সপ্তমসর্গে শেষ করতে পারলেন না তাঁর কাব্য। বিবাহোত্তর নায়ক-নায়িকা দৈহিক মিলনের নিরঙ্কুশ বর্ণনা দিতে তিনি লিখলেন অষ্টম এবং পরবর্তী সর্গগুলি। গন্ধমাদন পর্বতে হর ও পার্বতীর মধুঘামিনী যাপনের বর্ণনায় দেবাদিদেব এবং আদ্যাশক্তি নেমে আসেন মর্ত্যভূমে—তাঁরা তখন নিতান্ত কাব্যের নায়ক-নায়িকা, মানব মানবী। নীরদ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধে অতঃপর কালিদাস অনুসরণে অষ্টম সর্গে হরপার্বতীর মিলনের আক্ষরিক অনুবাদ দিয়েছেন। আমাদের পক্ষে তার প্রয়োজন নেই—আক্ষরিক অনুবাদসহ কুমারসম্ভবম্ কাব্য বাঙালী পাঠকের কাছে অলভ্য নয়।

শিব-ভাবনার দ্বিতীয় উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ভারতচন্দ্র থেকে। অমদামঙ্গলের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর কাব্যের নায়ককে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের মূল নিয়ামকরূপে চিহ্নিত করলেও কবির হাতে পড়ে শিব ক্রমশঃ নিতান্ত মানুষ হয়ে গেছেন। অমহীনের দ্বারে দ্বারে শূন্য শিক্ষাপাত্র হাতে বিহ্বল যে শিব, সে মানুষই শুধু নয়, সে আমাদের অত্যন্ত পরিচিত কাছের মানুষ। আবার বিবাহ-বাসরে বরণের সময় যে শিবের লাজবস্ত্র বাঘছাল খুলে পড়ে, মেনকা দি পৌর ললনার দল থাকে দেখে ছুটে পালান সে শিবও আমাদের অত্যন্ত পরিচিত—লৌকিক গাথায়, কথকতায়, যাত্রায় দেখা সে আমাদের বোম্ ভোলানাথ। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—যে ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরের মিলন বর্ণনায় আদিরসের প্রাবন বইয়ে দিয়েছেন, হরপার্বতীর বিবাহোত্তর জীবন বর্ণনায় সেই ভারতচন্দ্রই যথেষ্ট সংঘমী। তাহলেও শিব সেখানে নিতান্ত ঘরোয়া বাঙালী—স্ত্রীর সঙ্গে সাংসারিক খুঁটিনাটি নিয়ে কোন্দল করতে তাঁর বাধে না। ফলে হিন্দুধর্মে, হিন্দুদর্শনের যে অনাদিলিঙ্গ শিব, পৌরাণিক অনুভাবনায়, কাব্যে, ললিতকলায়, শিবের সে ভাবমূর্তি নয়। মন্দির ভাঙ্গরও এই দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। সেটা হিন্দুধর্মের অনুগামী নয়, হিন্দু পৌরাণিক চিন্তাধারার অনুসারী।

লেখক অতঃপর শিবলিঙ্গের প্রতীক-ব্যাঙ্গনার প্রসঙ্গে এসেছেন। পুনরুজ্জী দোষ এড়াতে যা আমরা এ পরিচ্ছেদে পরিহার করতে পারি। নন্দনতত্ত্ব যে আদিযুগ থেকেই হিন্দুধর্মে স্থানলাভ করেছিল তার প্রমাণও স্বকবেদ এবং ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ থেকে অনুবাদ করে শুনিয়েছেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন সেটি এ গ্রন্থে আমার প্রতিবাদিত তথ্যের সঙ্গে ঐক্যতান রচনা করছে। নীরদ চৌধুরীও মনে করেন নন্দনতত্ত্বের প্রসঙ্গ, নরনারীর মিলনতত্ত্ব ভারতীয় ধর্মগ্রন্থে আদি যুগ থেকে থাকলেও যৌন-সংসর্গকে ধর্মের আচাররূপে গ্রহণ করা হয়েছে তান্ত্রিক ধর্ম, পরবর্তীকালে। বলছেন, “As to actual practice, it is very difficult to discover how much of it (eroticism) was or is actually prevalent, for the only cult which has made sexual relations between men and women part of its ritual is the Tantric form of the worship of the Mother Goddess, but no Tantric openly acknowledges his practice of them.” [“ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যৌন সংসর্গ ধর্মের অনুসঙ্গ হিসাবে কতখানি গৃহীত হয়েছিল তা বলা শক্ত, কারণ একমাত্র তান্ত্রিক ধর্মেই এই আচার স্বীকৃত, যদিও কোনও তান্ত্রিক-সাধক একথা প্রকাশ্যে স্বীকার করেন না।”—(যে সমস্ত পণ্ডিত মন্দির-ভাস্কর্যের মিথুন-মূর্তির যৌনিকতা খুঁজতে হিন্দু ধর্মের মৌল তত্ত্ব এনে ফেলেন, অথবা এগুলিকে তান্ত্রিক-ক্রিয়া-কলাপের প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন বলে মনে করেন, তাঁদের পক্ষে এ মন্তব্যটি বিবেচনার)]।

লেখক বলছেন, মন্দির-ভাস্কর্যের মিথুনবাদকে বুঝে নিতে হলে দেখতে হবে লৌকিক শাস্ত্রে কী নির্দেশ ছিল, ধর্মতত্ত্বে নয়। ‘বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ’ এ বিষয়ে, অর্থাৎ শিল্পকলার বিষয়ে একটি অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ। তার দ্রয়োচল্লিশং পরিচ্ছেদে চিত্রকলার বিষয়ে আলোচনা আছে। সেখানে পুরাণকার বলছেন, নৃত্যগীতাদি ললিতকলা, কাব্য ও সাহিত্য প্রভৃতি চিত্রাঙ্কনের সঙ্গে সমান্তরালধর্মী। প্রাচীর চিত্রে ঐ সকল ললিতকলার প্রতিফলন অবশ্যস্বাবী। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে যে নবরস তাই মূর্ত হয়ে উঠবে চিত্রাঙ্কন শিল্পে। পুরাণকার আরও বলছেন, রাজপ্রাসাদে এবং মন্দিরগায়ে নবরসের সবগুলিই বিচিহ্নিত করতে হবে।

রাজপ্রাসাদের প্রাচীরে অঙ্কিত চিত্র আঁত অম্পই পাওয়া গেছে—অন্তত যে আমলে বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ রচিত হয়েছিল সেই আমলের চিত্র ভারতবর্ষে অলভ্য। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের মাধ্যমে আমরা কিছুটা প্রমাণ পাই। শ্রীহর্যের উত্তর নিষাদ চরিতে মহারাজ নলের রাজপ্রাসাদ বর্ণনাকালে কবি দুটি প্রাচীর চিত্রের উল্লেখ করেছেন। অষ্টাদশ সর্গের বিংশতি শ্লোকে বর্ণনা আছে একটি প্রাচীর-চিত্রে স্নয় পদসম্ভবের, অর্থাৎ ব্রহ্মার সুরতদৃশ্য। অপর একটি প্রাচীরে অঙ্কিত হয়েছে দেবরাজ ইন্দ্র স্বাধি গোতমের পত্নী অহল্যার সঙ্গে সঙ্গমরত (অষ্টাদশ সর্গ, এক বিংশতি শ্লোক)। উভয় ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তু অবৈধ প্রণয়ের। সূত্রকার বলছেন, এ জাতীয় প্রাচীর-চিত্রের মূল উদ্দেশ্য : কামোদ্দীপণার্থম্।

“The erotic sculptures in temples were only an extension of these from human residences to divine residences, and since the temples were public resorts, the artistic representations could also amuse those who went to them.” [রাজপ্রাসাদ থেকে ঐ আদিরসাত্মক মূর্তির মন্দিরে সংক্রামণের অর্থ মর্ত্যের অধিপতির আবাস থেকে স্বর্গের অধিপতির আবাসে স্থানান্তরিত করা। এবং যেহেতু মন্দির সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্তস্থান তাই সকল দর্শনার্থীই ঐ চিত্রকর্মগুলির আবেদনে আনন্দলাভ করত]।

ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যে ঐ মিথুন-মূর্তিগুলির যৌনতা বিষয়ে এক জাতের ধর্মীয় ব্যাখ্যা আমরা সাম্প্রতিক কালের পণ্ডিতদের আলোচনায় পাই। এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা এ গ্রন্থে পূর্বেই করছি, পরবর্তী অংশেও করব। যেহেতু সেই সব রচনা যৌনতার বিষয়ে ভাগবৎ ব্যাখ্যা ও ধর্মীয় টিকা-টিপ্পনী বিখ্যাত ভারতবিদদের লেখনী-প্রসূত তাই তার প্রতিবাদ করতে

সম্প্রতি হয়। স্পষ্টবাক্তা প্রীনারদ চৌধুরী দেখাছি তাঁর গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে তার প্রতিবাদ করেছেন। বলছেন, “Although, generally speaking, discussion of Hinduism is not marked by a very strict regard for intellectual honesty, as I cannot emphasize enough, on no other subject connected with it is it less in evidence than about the erotic sculptures on the temples.”

[যদিও সাধারণভাবে বলতে গেলে হিন্দুধর্মের আলোচনাকালে চিন্তাবিদদের নৈতিক সততা প্রায়শই লঙ্ঘিত হতে দেখি, আমার মনে হয় এই সততার অভাব সব চেয়ে বেশী প্রকট হয়ে পড়ে যখন মন্দির-ভাস্কর্যে যৌনতাব্যঞ্জক মূর্তিগুলির প্রসঙ্গ এসে পড়ে।] লেখকের মতে লৌকিক শিল্পে এ বস্তু সব সভ্যতাতেই কমবেশী পরিদৃশ্যমান—গ্রীক, রোমক, চীনা ও জাপানী শিল্পে একই জাতের উদাহরণ দেখা যায় : ভারতবর্ষ এমন কিছু ব্যতিক্রম নয়। তবু দেখা যায়, ভারতীয় পণ্ডিতেরা যেন এক অপরাধ-বোধে ভুগছেন, তাঁরা নানান ব্যাখ্যা দিয়ে ঐ যৌনতার বৌদ্ধিকতা প্রতিষ্ঠা করতে চান—“Everybody knows that the recent interest in it (erotic sculptures in temples) is pornographic, but in writing about it, no one faces the fact and offers explanations which would be called balderdash if the innocence of the writers were above question.”

[সকলেই জানেন, সাম্প্রতিককালে ঐ মূর্তিগুলির প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের যৌনতার জন্যই, কিন্তু এ বিষয়ে লিখবার সময় ঐ সত্য কথাটা সেইসব পণ্ডিতেরা স্বীকার করতে চান না। তাঁরা ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝাতে চান ব্যাপারটা কী ও কেন। তাঁদের সততা যদি সন্দেহের উদ্বেগ হয় তবে সেই ব্যাখ্যাগুলি হয় বাতুলতার পর্দায়।]

প্রীচৌধুরী ঐ “if the innocence of the writers are above question” (লেখকদের সততা যদি সন্দেহাতীত হয়) কথাগুলি কেন বললেন? বিষদ করে, উদাহরণ দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দেননি। তবে তথ্যমূলক অনুমান করতে অসুবিধাও হয় না। বছর দশেক পূর্বে, ১৯৬৮ সালে বোম্বাই-এর বিখ্যাত ‘মার্গ’ পত্রিকা ‘কোনারক’ ও ‘খাজুরাহো’ নামে দুটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন এবং মৈথুনরত মিথুন মূর্তিগুলির এমন কি বৌদ্ধ যৌনাচাররত মূর্তিগুলির ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রদানে ডক্টর মূলকরাজ আনন্দ প্রমুখ পণ্ডিতেরা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। উপনিষদের নানান শ্লোক উদ্ধৃত করে এই মূর্তিগুলির ব্যাখ্যা এবং বাথার্থ্য কিভাবে দেওয়া হয় তার উল্লেখ এ গ্রন্থের নানান স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে। হয় তো সেই জাতীয় প্রবন্ধপাঠের পরেই প্রীচৌধুরী লিখলেন, “Perhaps it would be difficult even for the most mendacious of the symbolist interpreters of Hinduism to connect such erotic leanings with the mysticism of the Upanisads.”

[মিথ্যাভাষণে ষাঁরা একান্ত পারদর্শী তেমন প্রতীকধর্মী ব্যাখ্যাকারীর পক্ষেও এ জাতীয় যৌনতার স্বপক্ষে উপনিষদের রহস্যময় উদ্ধৃতি তুলে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে তার বাথার্থ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়তো কষ্টকর হয়ে পড়বে।]

ছয়

॥ কলিঙ্গ স্থাপত্য-ভাস্কর্যের বিবর্তন ও মিথুনবাদ ॥

কলিঙ্গের এগারোটি মন্দিরে আমরা যে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছি সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে কলিঙ্গ স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ধারাবাহিকতার একটা চূষক আলোচনার প্রয়োজন। পূর্ব ভারতের নাগরশিংশে কলিঙ্গ ও খাজুরাহোকেই আমরা নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করছি—কারণ মিথুনবাদ এই দুটি স্থলেই ‘মৈথুনবাদে’ বিবর্তিত হয়েছিল, অন্যান্য স্থানে বিক্ষিপ্ত উদাহরণ থাকলেও তারা এ মতবাদের মূল নিয়ামক নয়। খাজুরাহোর প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব; পরবর্তী কয়েকটি পরিচ্ছেদে আমরা মূলত কলিঙ্গ ভাস্কর্যের অনুসরণে মিথুনবাদের বিবর্তনের পর্যালোচনা করব। তাই বর্তমান পরিচ্ছেদে কলিঙ্গ স্থাপত্য-ভাস্কর্যের একটি চূষক-ইতিহাস এবং কলিঙ্গে মিথুনবাদের ক্রম-বিবর্তনের একটা সামগ্রিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে নেওয়া হচ্ছে।

কলিঙ্গ স্থাপত্য-ভাস্কর্যকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যায় :

প্রথম যুগ : মৌর্য যুগ [খ্রীঃ পূঃ ২৫৭—খ্রীঃ পূঃ ১৫০] প্রায় ১০০ বৎসর।

ক) ঐতিহাসিক প্রভাব : পূর্বযুগের শিশুপালগড়স্থিত চেন্দীরাজ্যাদের ঐতিহাসিক নিদর্শন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

ইতিহাস বন্ধুত শুরু হচ্ছে মগধ-সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ-বিজয় থেকে। কলিঙ্গ মগধের করদরাজ্য হয়ে গেল।

খ) ধর্মীয় প্রভাব : কলিঙ্গযুদ্ধের ভয়াবহতায় সম্রাট অশোক মর্মান্বিত—তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করলেন—বৌদ্ধধর্মের প্রচার—পরধর্মসাহসু সম্রাটের শাসনে জৈন ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি—কিন্তু তাদের স্থাপত্য-ভাস্কর্যে অনিবার্যভাবে বৌদ্ধ প্রভাব পড়তে থাকে।

গ) সামাজিক প্রভাব : যুদ্ধের ক্ষতি—পরাদীনতার গ্রানি—মৌর্যপ্রভাবে উত্তরাপথের সঙ্গে পরিচয়—এ ভাবে পারসিক ও গ্র্যাকট্রিয়ার চিন্তাধারার সঙ্গেও পরিচয়।

ঘ) স্থাপত্য নিদর্শন : খোলি-ঝাউগাদা শিলালেখ।

ঙ) ভাস্কর্য নিদর্শন : খোলির হস্তিমূর্তি—সিংহস্তমূর্তি (ভুবনেশ্বর ষাটঘরে সংরক্ষিত) এবং ভাস্করেশ্বরের শিবলিঙ্গে বৌদ্ধপ্রভাব। ২২।

দ্বিতীয় যুগ : গুহামন্দির যুগ [আঃ খ্রীঃ পূঃ ১৪৬—খ্রীঃ পূঃ ৭৫] প্রায় ৭০ বৎসর।

ক) ঐতিহাসিক প্রভাব : কলিঙ্গরাজ্য করবেলের অভ্যুত্থান (মগধের পুষ্যমিত্র ও অজ্ঞের প্রীতকর্ণার প্রায় সমসাময়িক)—মহামেঘবাহন বংশের রাজ্য শাসন।

খ) ধর্মীয় প্রভাব : রাজানুগ্রহে জৈন ধর্মের প্রসার। বৌদ্ধরাও নিগৃহীত নন।

গ) সামাজিক প্রভাব : করবেলের সুশাসনে কলিঙ্গে সার্বাঙ্গিন উন্নতি। মৌর্যশাসনযুগ হওয়ার মুক্তির স্বাদ।

ঘ) স্থাপত্য নিদর্শন : উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির অসংখ্য গুহামন্দির। হস্তী-গুম্ফা ও গণেশ গুম্ফার স্থাপত্যের উৎকর্ষ।

ঙ) ভাস্কর্য নিদর্শন : গণেশ গুম্ফা ও রাণীগুম্ফাতে অর্ধোৎখিত (বাস-রিলিফ) ভাস্কর্যে অপূর্ব অলঙ্করণ—ভাস্কর্য-মূর্তিতে কাহিনী বুননের প্রথম প্রচেষ্টা। সুনীতিবাবুর মতে এখানেই লৌকিক কাহিনী (জাতক বা ধর্মের নয়) প্রতিফলনের প্রথম সূচনা। ২৩। তীর্থঙ্করদের মূর্তি, জম্বু-জানোয়ার এবং নরনারীর মূর্তি ত্রিমাত্রিক এবং অর্ধোৎখিত।

তৃতীয় যুগ : আদি হিন্দু যুগ [৫৭৫ খ্রীঃ—৮০০ খ্রীঃ] প্রায় ২২৫ বৎসর।

ক) ঐতিহাসিক প্রভাব : অজ্ঞের শ্রীসতকর্ণীর পুত্র গৌতমীপুত্র সতকর্ণী কতৃক কলিঙ্গ-বিজয়—কলিঙ্গ পুনরায় করদরাজ্য, এবার অজ্ঞের সাতবাহনরাজ্যের অধীনে। পরে গৌড়ের (বঙ্গের) শশাঙ্ক কলিঙ্গ বিজয় করেন—শশাঙ্কের পরে, শৈলোদ্ভব বংশের সাময়িক রাজ্যশাসন—হর্ষবর্ধনের কলিঙ্গ বিজয়—পরে ভৌমকরদের অভ্যুত্থান।

খ) ধর্মীয় প্রভাব : শশাঙ্কের প্রভাবে কলিঙ্গে শিবপূজার ব্যাপক প্রবর্তন। শশাঙ্ক ছিলেন শিবের উপাসক। পাশুপত ধর্মের প্রবক্তা লাকুলীশও এই যুগের মানুষ। তাঁর অনুপ্রেরণাতেও কলিঙ্গে শৈব ধর্মের জাগরণ। বৌদ্ধ ও জৈনরা একান্তবাসী। ভৌমকরেরাও শৈব সমর্থক। শেষ যুগে শাক্ত মন্দির 'বৈতাল' নির্মিত।

গ) সামাজিক প্রভাব : দক্ষিণ ও উত্তর দিক থেকে উপযুপরি আক্রমণে রাজ্যে অশান্তি।

ঘ) স্থাপত্য নিদর্শন : শত্ৰুয়েশ্বর, লক্ষ্মণেশ্বর, ভরতেশ্বর (এবং অবলুপ্ত রামেশ্বর) পরশুরামেশ্বর ও বৈতাল দেউল। একক দেউল থেকে বৈতালদেউলে বিবর্তন।

ঙ) ভাস্কর্য নিদর্শন : ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিতে বৈশিষ্ট্য ও আয়ুধ স্থিরীকৃত হয়েছে। গর্ভগৃহের তিন দিকে তিন পার্শ্বদেবতার আসন সংরক্ষিত হয়েছে—আটকোণে আটজন দিকপালের আসনও সুনির্দিষ্ট হতে চলেছে। দেবদেবী, নরনারী, পশুপক্ষীর নানান বিচিত্র মূর্তি। অলসকন্যা বা সুরসুন্দরীরা এসেছেন। দাক্ষিণাত্যের অনুকরণে কীর্তিমুখ, এবং স্বকীয় চিন্তায় 'গজবিরাট', 'সিংহবিরাট' ইত্যাদির পরিকল্পনা হয়েছে।

চতুর্থ যুগ : মধ্য হিন্দু যুগ [৮০০ খ্রীঃ—১১০০ খ্রীঃ] প্রায় ৩০০ বৎসর।

ক) ঐতিহাসিক প্রভাব : সোমবংশী বর্ণহিন্দু রাজন্যবর্গ কতৃক আদিবাসী বংশের ভৌমকরেরা বিতাড়িত। কেশরী বংশের প্রতিষ্ঠা। কেশরী বংশের বিভিন্ন রাজা এবং অমাত্যরাও মন্দির নির্মাণে অর্থব্যয় করছেন।

খ) ধর্মীয় প্রভাব : ব্যাপকভাবে শিব ও শক্তির উপাসনা। শঙ্করাচার্য কতৃক পুরীধামে মঠ প্রতিষ্ঠা। অষ্ট-বেদান্ত ধর্মের প্রতিষ্ঠা। বৌদ্ধরা কয়েকটি সঙ্ঘারামে সীমাবদ্ধ। এই সব সঙ্ঘারামে মহাবান বৌদ্ধধর্ম বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের দিকে ঝুঁকছে। নাগান্দা, নেপাল ও তিব্বতের সঙ্গে এই সব সঙ্ঘারামের যোগাযোগ ছিল। ইতিমধ্যে চীনখণ্ড থেকে 'চীনাচার' বজ্রযানে আসন পাচ্ছে। ক্রমে শাক্ত-তান্ত্রিকেরা বজ্রযান ও মহাবানধর্মী বৌদ্ধদের এই তান্ত্রিক আচার গ্রহণ করছে, 'বামাচার' নামে। ব্রাহ্মণধর্মে 'মৈথুন'কে ধর্মের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে।

গ) সামাজিক প্রভাব : পূর্বযুগের ধর্মবৈরতা কমে এসেছে। বুদ্ধ ও জৈন তীর্থঙ্করেরা লাকুলীশের পাশাপাশি হিন্দুমন্দিরে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন। কেশরী রাজন্যবর্গের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সামন্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন—

ফিউডাল-নীতি শিকড় গাড়েছে। ভূমিাধিকারীদের অত্যাচার ও বদান্যতা উভয়ই আছে। রাষ্ট্রবিপ্লব সীমিত। শিম্পের ক্ষুরণ।

ঘ) স্থাপত্য নিদর্শন : মুক্তেশ্বর, গৌরী, রাজারানী, ব্রহ্মেশ্বর, কেদারেশ্বর, সিক্েশ্বর, মেঘেশ্বর প্রভৃতি। অধিকাংশ দেউলই যুগল-মন্দির—গর্ভগৃহের উপরে বিমান এবং তার সম্মুখে জগমোহন। ইতিমধ্যে কলিঙ্গ-স্থাপত্যের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য বেশ স্থায়ীত্ব পেয়েছে—কী ভূমি-নকশায় (প্লানে), কী সম্মুখ অথবা পার্শ্বদৃশ্যে (এলিভেশানে)। রেখ-দেউল, পীড়-দেউল, কাথর-দেউল কোথায় কোনটি নির্মিত হবে, চিরথ-পঞ্চরথ-নবরথ দেউলের রাহাপাগ-কোনাপাগ প্রভৃতির অনুপাত কত হবে তাও স্থিরীকৃত। লক্ষণীয়, পরবর্তী যুগের চার-দেউলের পরিকল্পনা এখনও জন্মলাভ করেনি।

ঙ) ভাস্কর্য নিদর্শন : পূর্বযুগের গুপ্তপ্রভাব কাটিয়ে কলিঙ্গভাস্কর স্বকীয় চিন্তার মন্দিরভাস্কর্যে নিজ বৈশিষ্ট্য পুরা মাঠায় ফুটিয়ে তুলছেন। অলসকন্যাগুলির বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস হয়েছে—প্রতীক্ষারতা, প্রসাধনরতা, অভিষেকা, সন্তানবৎসলা প্রভৃতি। মূর্তিগুলির সৌকুমার্য আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

পঞ্চম যুগ : শেষ হিন্দু যুগ [১১০০ খ্রীঃ—১৩০০ খ্রীঃ] প্রায় ২০০ বৎসর।

ক) ঐতিহাসিক প্রভাব : কেশরীবংশের শেষ অপুত্রক রাজার দেহান্তে চোরগঙ্গ। কর্তৃক গঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠা। পার্শ্ববর্তী রাজ্যন্যবর্ণের সঙ্গে ক্রমাগত দৃত বিনিময়ে অন্যান্য রাজ্যের শিম্পচেতনার সঙ্গে পরিচয়। কলিঙ্গ ভাস্কর্য কিন্তু নিজস্ব স্বকীয়তা বর্জনে দীক্ষিত নন।

খ) ধর্মীয় প্রভাব : শৈব ও শক্তিপূজার সমান্তরালে বিষ্ণুপূজার প্রবর্তন—জগন্নাথের ব্যতিক্রম ছাড়া। কলিঙ্গে এতদিন উল্লেখযোগ্য বিষ্ণুমন্দির ছিল না—এখন হল। ঠিক এর পরবর্তী যুগেই চৈতন্যদেবের পুরীধাম আগমন উপলক্ষ্যে এবং নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার বৃদ্ধি পায়। তখন কিন্তু মন্দির-নির্মাণের যুগ সবে শেষ হয়েছে।

গ) সামাজিক প্রভাব : আর্থিক সচ্ছলতা, ধর্ম সহিষ্ণুতা এবং শিম্পের ক্ষুরণ।

ঘ) স্থাপত্য নিদর্শন : লিঙ্গরাজ, অনন্ত বাসুদেব, জগন্নাথের বর্তমান মন্দির ও কোনার্কের সূর্যমন্দির। একই অক্ষরেখায় চারদেউলের পরিকল্পনা—বিমান, জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ। কোনার্ক মন্দিরে রথ-মন্দিরের অভূতপূর্ব পরিকল্পনাটি বিস্ময়কর।

ঙ) ভাস্কর্য নিদর্শন : সুন্দরতর মূর্তি নির্মাণ। বৃহদায়তন মূর্তির পরিকল্পনা ও বৃপায়ন। জগন্নাথ মন্দিরের অবক্ষয়ী ভাস্কর্য-স্থলতার পরের যুগে কোনার্কের সাফল্য বিস্ময়কর। কোনার্কের ভাস্কর্য-সাফল্য কলিঙ্গের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

কলিঙ্গ স্থাপত্য-ভাস্কর্যের এই চূষক-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ‘মিথুনবাদ’ কী ভাবে বিবর্তিত হয়েছে এবার আমরা তাই সংক্ষেপে এবং সামগ্রিকভাবে পরীক্ষা করব। আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী পাঁচ জাতের মিথুন সন্ধকে পরবর্তী পাঁচটি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, এখানে তার সামগ্রিক বিবর্তন ধারাটিতে শুধু বুঝে নেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। মুশ্কিল এই যে, পূর্বসূরীরা বিভিন্নজাতের মিথুনকে বিভিন্ন শব্দে চিহ্নিত না করায় তাঁদের দীর্ঘদিনের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তকে আমরা ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারছি না। উদাহরণ স্বরূপ একটি দীর্ঘ উক্তি শোনাই। অনুবাদের দোষে মূল বস্তু অস্পষ্ট থেকে যাবার আশঙ্কা থাকায় আমরা মূল ও অনুবাদ দুটিই লিপিবদ্ধ করছি। মার্গ-পটিকায় ‘খাজুরাহো বিশেষ সংখ্যায়’ ডক্টর মূলকরাজ আনন্দ

বলছেন । ২৪ । “According to Sjt S. C. Dey of the Bhubaneswara archaeological department, the earliest instance of an *amorous couple* is to be found in a Jain pillar in the Lucknow Museum. It is not quite certain whether this anticipates the carving of *amorous couples* in Bodh Gaya, Taxila, Mathura and Karla, but the extant remains are certainly part of a continuous tradition for the representations of *couples in sexual poses*, which began with the beginning of the sculpture in India and until the British put a legal ban on secular ‘obscene’ art. When the Maura, Gandhara, Kushana and Gupta traditions travelled down into the Deccan on the west and south, and to the Bay of Bengal in the east before the first century of the Christian era, the *Mithuna embrace* appears and disappears (italics ours)

[ভুবনেশ্বর পুরাতত্ত্ব বিভাগের শ্রীযুক্ত এস, সি, দে-র মতে যৌন মিত্ধনের প্রথম উদাহরণটি পাওয়া যাচ্ছে লঙ্কো সংগ্রহশালায় রক্ষিত একটি জৈন স্তম্ভে । পরিস্কারভাবে বোঝা যায় না—এ মূর্তিটি বুদ্ধগয়া, তক্ষশীলা, মথুরা এবং কালোতে অবস্থিত যৌন-মিত্ধন মূর্তিগুলির পূর্বে উৎকীর্ণ কি না । কিন্তু অক্ষত ভগ্নাংশ থেকে বোঝা যায় যে, এগুলি যৌন-ভঙ্গিতে-খোদাই-করা মিত্ধনমূর্তির একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারার অংশবিশেষ । এই ধারাটির আবির্ভাব ভারতীয় ভাস্কর্যের উষ্মাযুগে এবং ব্রিটিশ শাসকেরা ‘অশ্লীল’ শিল্পের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করার পূর্বযুগ পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল । মৌর্য, গান্ধার, কুশান ও গুপ্তযুগের শিল্পচেতনায় যখন যখন পশ্চিমে ও দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য এবং পূর্বাঞ্চলে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তারিত হয়েছে তখনভাবে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই আমরা মিত্ধনের আলিঙ্গন দৃশ্যকে বারে বারে আবির্ভূত ও অস্বস্ত হতে দেখেছি ।]

ডক্টর আনন্স-এর এই অনুচ্ছেদটি থেকে আমরা পরিস্কারভাবে ধারণা করতে পারি না লেখক কী বলতে চাইছেন । আর সেটা না পারার কারণ এই বাগর্থ সম্পৃক্ত না থাকা, *amorous couples*, *couples in sexual poses*, *obscene couples*, *mithuna embrace* শব্দগুলি বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠায় ব্যবহৃত নয়, সংজ্ঞা-নিরূপিত ব্যবহার নয় । লঙ্কো সংগ্রহশালায় মিত্ধনটি কী জাতের ? তারা কতদূর *amorous* (যৌনতা ব্যঞ্জক) ? লেখক একই নিঃস্বাসে বুদ্ধগয়া, তক্ষশীলা, কালো-র উল্লেখ করেছেন ; কই সেখানে তো আমরা ‘মৈত্ধনরত মিত্ধন’ মূর্তি দেখিনি—সবই যুগলমূর্তি অথবা উত্তেজিত মিত্ধন । অথচ একই অনুচ্ছেদে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ‘অশ্লীল’ মূর্তি নির্মাণে আপত্তির কথাও দেখাছে । সেই আইনে এমন কিছু বিধান ছিল না—যাতে বুদ্ধগয়া, তক্ষশীলা, কালো, মথুরা প্রভৃতির অযুত মিস্ত্রী যুগলমূর্তি, উত্তেজিত মিত্ধন বা শৃঙ্গাররত মিত্ধন নির্মাণে বাধা হতে পারে । তাহলে এত কথার অর্থ কী হল ?

এ প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে লেখক বলছেন, “Bhubaneswar, Konarak, Puri have invited greater attention from the pruders because of the greater profusion of the Mithuna couples...”

[ভুবনেশ্বর, কোনার্ক, পুরীতে মিত্ধনের সংখ্যাধিক্যের জন্য সংস্কারাচ্ছন্ন দর্শকের দৃষ্টি বেশি করে আকৃষ্ট হয় ।]

আমরা একমত নই । দর্শকের আপত্তি শুধু তাদের সংখ্যাধিক্যের জন্য নয় । আপত্তি, তাদের জাত-বদল হওয়ায় । দেড় দু’হাজার বছরের ভারতীয় ভাস্কর্যের ইতিহাসে ‘মৈত্ধনরত মিত্ধন’ অথবা ‘যৌথ-যৌনাচারের’ পরিকল্পনা ছিল না—সবই না কেন লেখক এই সংজ্ঞা-বিবর্জিত ‘মিত্ধন’ শব্দটির ব্যবহারে বুদ্ধগয়া, তক্ষশীলা, কালো-র মিত্ধন-ভাস্কর্যকে কোনার্কের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসাবার চেষ্টা করুন । আশঙ্কা হয়, লেখক একটি বদ্ধমূল পরিকল্পনা নিয়ে (অর্থাৎ কলিঙ্গ-শেষ-পর্ষায়ের ‘মৈত্ধনরত

মিথুন' এবং 'যৌথ যৌনাচার'কে জাতে তুলবার উদ্দেশ্য নিয়ে) এভাবে বাকচাতুর্থ প্রকাশ করেছেন, না হলে তাঁর মতো পণ্ডিত কি বুঝতে পারেন না যে, বুদ্ধগয়ার অপ্রগল্ভ যুগলমূর্তি আর কোনাকের 'যৌথ যৌনাচাররত নরনারী' যৌনতার বিচারে এক পণ্ডিতভুক্ত নয়? শিল্পবস্তু হিসাবেও তারা ভিন্ন জাতের? এই অপরাধবোধ থেকেই লেখক ঐ *prude* (সংস্কারাচ্ছন্ন) বিশেষণে পাঠককে ধমক দিয়েছেন ।

ডক্টর আনন্দের প্রবন্ধে ফটো ব্লক না থাকায় লক্ষ্মী সংগ্রহশালার মিথুনটি, অথবা ঐতিহাসিক উষাযুগের বুদ্ধগয়ার মিথুনমূর্তি কতদূর যৌনতা-ব্যঞ্জক তা বুঝে উঠতে পারিনি । সৌভাগ্যক্রমে ও, সি, গাঙ্গুলি মশাই 'বৃপম্' পত্রিকার একটি সংখ্যায় ঐ দুটি ছবি প্রকাশ করায় আমরা তত্বটা নতুন করে ব্যাচাই করতে পারি । দ্বৈমাসিক 'বৃপম্' পত্রিকার এপ্রিল-জুলাই, ১৯২৫ সংখ্যায় সম্পাদক স্বয়ং একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন "The Mithuna in Indian Art" । ঐ প্রবন্ধে লেখক ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যে মিথুনবাদের ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং তেত্রিশটি ফটো প্লেটে বিভিন্ন যুগের মিথুনের উদাহরণ দেন । আশ্চর্যের কথা—শিল্পবিষয়ক অর্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় মশাই ঐ দীর্ঘ আলোচনায় 'মৈথুনরত মিথুন' বা 'যৌথ যৌনাচার' প্রসঙ্গের আদৌ উত্থাপন করেননি । তাঁর তেত্রিশটি মিথুনমূর্তিকে আমাদের সংস্কার অনুযায়ী সাজালে পাই : যুগলমূর্তি—৯টি ; উত্তেজিত মিথুন—১২টি ; শৃঙ্গাররত মিথুন—৮টি ; ব্লক অম্পষ্ট হওয়ার জার্তানর্ণয় করা গেল না—৪টি ; একুনে—৩০টি । সম্ভবত ১৯২৫ সালের মানসিক গ্রহণশীলতায় লেখক পরবর্তী পর্যায়ের মিথুনমূর্তির উদাহরণ দিতে পারেননি । কিন্তু তিনি কেন যে সে বিষয়ে আলোচনাটাও এড়িয়ে গেলেন তার অর্থ বোঝা যায় না । কলিঙ্গ-খাজুরাহার মৈথুনরত ও যৌথ যৌনাচাররত মিথুনগুলি যে ভিন্ন জাতের মিথুন এমন প্রসঙ্গের অবতারণাই তিনি করেননি । তিনি উদাহরণে নায়ক-নায়িকা ছাড়াও তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত—কিন্তু তারা যৌনক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করছে না ।

লক্ষ্মী সংগ্রহশালার যে ফটো ব্লকটি দিয়েছেন, তাতে দেখছি নায়ক বাঁ-হাত রেখেছে নায়িকার ঙ্গে, ডান হাতে সে সঙ্গিনীর বস্ত্রপ্রাপ্ত আকর্ষণ করছে । এটি উত্তেজিত মিথুন—যৌনতার পরিমাপে এ গ্রন্থের চিত্র-২৩ অথবা চিত্র-২৪ এর সঙ্গে তুলনীয় । গাঙ্গুলীমশাই বলছেন, এটি পাওয়া গেছে একটি তোরণঘরের জ্যাঙ্ক অংশ থেকে এবং শিল্প নিদর্শনটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের । তাঁর দ্বিতীয় উদাহরণ বুদ্ধগয়ার (খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর) একটি মেডালিয়নে বিধৃত যুগলমূর্তি । ঐ শেষ উদাহরণ কোনাকের একটি নাগদম্পতী (শৃঙ্গাররত মিথুন) । আগেই বলেছি—এই দীর্ঘ দেড় হাজার বৎসরের মিথুনবাদের আলোচনায় গাঙ্গুলীমশাই কোনও মৈথুনরত মিথুনের উদাহরণ, বর্ণনা বা ব্যাখ্যা দেননি । তবে এ প্রসঙ্গে একটি তথ্য তিনি জানিয়ে গেছেন যা গবেষকের পক্ষে প্রয়োজনীয় : "Unless we are able to place our finger on the actual texts of the Shilpasastras which were current in Orissa, we are not in a position to say if the indolent exaggerations of the 'mithuna's were sanctioned by the text, or was a gratuitous interpretation of harmless canons. The text, so far we have been able to trace, is a single passage in the Agnipuranam, which enjoins : 'That the doorway (of shrines) should be decorated with mithunas' (মিথুনৈঃ বিভূষয়েৎ). The passage occurs in the Chapter Prasada Lakshanam (105, Sloka 30. Bibliotheca Indica, Edn, Cal : 1873, Vol I, p. 356)'.

[যতদিন না উড়িষ্যার প্রচলিত শিল্পশাস্ত্রের নির্দিষ্ট শ্লোকটি উদ্ধার করতে পারা হবে ততদিন এ কথা বলা অসম্ভব যে, মন্দিরগাত্রের ঐ অশালীন প্রকট মৈথুনরত মূর্তিগুলির পিছনে শাস্ত্রীয় অনুমোদন ছিল কি না, অথবা নির্দেশ নির্দেশের বিকৃত ব্যাখ্যায় তা আরোপিত । এ পর্যন্ত আমরা একটি মাত্র শাস্ত্র-নির্দেশ উদ্ধার করতে পেরেছি—অগ্নিপুরাণের একটি শ্লোক, যাতে বলা হয়েছে মন্দির তোরণ মিথুনমূর্তি দ্বারা শোভিত হওয়া চাই ।]

যাক, যে কথা বলিছিলাম—কলিঙ্গে ‘মিথুনবাদ’ থেকে ‘মৈথুনবাদের’ বিবর্তন :

১) গৌরীপটু-বৌদ্ধিত শিবলিঙ্গের মধ্যে মৈথুনবাদের যে তীর্থক-ব্যাঞ্জনা তা একেবারে প্রথম যুগ থেকেই বর্তমান—বোধকরি প্রাকার্য ভারতীয় সভ্যতার উষ্মযুগ থেকে ।

২) মৌর্যযুগের ভাস্কর্যে আদৌ কোন মিথুন মূর্তি কলিঙ্গে নজরে পড়ে না—শিশুপালগড়, খোলি-ঝাউগাদায় তারা অনুপস্থিত। বহির্কলিঙ্গে সঁচী-ভারহুত-বুদ্ধগয়ার প্রথম-যুগে প্রথম তিন জাতের মিথুন মূর্তি আছে, মৈথুনরত মিথুন একটিও আমার নজরে পড়েনি ।

৩) ঋগ্বেদগুহামন্দির যুগে কলিঙ্গে যুগল মূর্তি দেখতে পাচ্ছি : নিতান্ত অলঙ্করণের প্রয়োজনে । উল্লেখ্য, সমকালে ভারতের অন্যত্র, অজন্তায়, কালি, কাহ্নেরী, নাসিকে এই সময়েই বহু যুগলমূর্তি খোদিত হয়েছে । তারা অলঙ্করণের প্রয়োজনে আসেনি, এসেছে দাতা ও তার সহধর্মিনীর রূপে ।

৪) আদি হিন্দু যুগ : (৫৭৫-৮০০ খ্রীঃ) : শৈব ও পাশুপত ধর্মের অভ্যুত্থানে শাস্ত্রীয় নির্দেশে শিবমন্দিরে যুগল মূর্তি খোদিত হচ্ছে—জোড়া সাপ, জোড়া মাছ, পুরুষ স্ত্রী, তারা বতই অপ্রগল্ভ । শিব ও লাক্ষ্মী মূর্তিতে পুরুষাঙ্গ উৎকীর্ণ করা শিল্পশাস্ত্রে স্বীকৃত হল । আদি হিন্দুযুগের শেষ পর্ষায় বৈতাল মন্দিরে প্রথম দেখা গেল ‘মৈথুনরত মিথুন’ মূর্তি । আমরা পরে দেখব, সাধন মার্গে যৌনসংসর্গের ধারণাটা এই সময়েই ভারতে আসে । ‘চীনাচার’ থেকে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক আচার এবং তা থেকে শাক্ত বামাচার । যদিও ভারতে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ভাস্কর্যে ‘মৈথুনরত মিথুন’ উৎকীর্ণ হয়নি, তবু শাক্ত মন্দিরে তা প্রথম আবির্ভূত হল—বৈতালে ; এবং পরবর্তী যুগে অন্যান্য দেবদেউলে ।

৫) মধ্যহিন্দু যুগ : (৮০০ খ্রী—১১০০ খ্রী) : বৈতালে মৈথুনরত মিথুন মূর্তি উৎকীর্ণ হওয়ার একশ বছর পরে মুক্তেশ্বরে পুনরায় একটি ঐ জাতীয় মিথুন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । এবার কিন্তু মূর্তিটি প্রকাশ্য স্থানে উৎকীর্ণ করা হয়নি, একটি খাঁজের ভিতর সঙ্গোপনে লুক্কাইত । মনে হয়—ঐ জাতীয় মিথুন শিব মন্দিরে তখনও সামাজিক ভাবে গৃহীত হবে কি না এ বিষয়ে শিল্পীর মনে বিধ্বা-দ্বন্দ্ব আছে । লক্ষণীয়, প্রায় সমসময়ে বজ্রবানী বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের অভ্যন্তরে নানান ধরনের যৌনাচার ধর্মের অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত এবং শাক্ত বামাচারীরাও তা গ্রহণ করেছেন । আরও উল্লেখযোগ্য যে, এই যুগের মাঝামাঝি অবস্থা থেকে বহির্কলিঙ্গে কোল-কাপালিক-ধর্ম প্রভাবিত খাজুরাহোতে ঐ জাতীয় মিথুনমূর্তি সামাজিক ও শৈল্পিক স্বীকৃতি পায় । তুলনার বলতে পারা যায়, মিথুন মূর্তিতে যৌনতা বৃদ্ধি কলিঙ্গের ক্ষেত্রে হয়েছে অতি ধীর গতিতে, খাজুরাহোর ক্ষেত্রে যেন বিবর্তনের পরিবর্তে বিপ্লব । কলিঙ্গে মুক্তেশ্বরে দৃষ্ট খাঁজের অন্তরালে সুগোপনে রক্ষিত মৈথুনরত মিথুন মূর্তিটি বৃষায়নের পঞ্চাশ বছর পরে নির্মিত ব্রহ্মেশ্বরে ঐ জাতীয় মৈথুনরত মিথুন একটিও নাই, অথচ প্রায় সম সময়ে গড়া ‘গৌরী’ দেউলে আছে । মনে রাখা দরকার, ব্রহ্মেশ্বরে শৈব সম্প্রদায়ের এবং গৌরী শক্তি মন্দির—তান্ত্রিকদের প্রভাবে গড়া ।

৬) শেষ হিন্দু যুগ (১১০০ খ্রী—১৩০০ খ্রী) : স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কলিঙ্গে শেষ হিন্দুযুগ যখন শুরু হচ্ছে ততদিনে খাজুরাহোর স্থাপত্য-ভাস্কর্য মধ্যগগন অতিক্রম করেছে । ভুবনেশ্বরে পূর্বযুগে নির্মিত “রাজারানী” মন্দিরে খাজুরাহো স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব অভ্যন্ত স্পষ্ট । ফলে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না—খাজুরাহো-শিল্পীর উগ্র যৌনতা-বোধের প্রভাব এ যুগে কলিঙ্গে প্রবেশ করে । চারজাতের মিথুন অতিক্রমণে এই প্রথম বোধ যৌনাচার দৃশ্য উৎকীর্ণ হতে দেখাছি কলিঙ্গে—পুরী ও কোনার্ক ।

সাত

॥ আমাদের কলিঙ্গ-সমীক্ষা ॥

আপনারা নিশ্চয় এতক্ষণে অধৈর্য হয়ে পড়েছেন—লীসন সংকলিত কোনও মূর্তিই যদি মেনে নেওয়া না হয়, তাহলে ঐ মিথুনবাদ এল কেন? আগেই বলেছি, লীসন কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। তাঁর উপসংহার ছিল :২৫ “None of the propagandists quoted can be said to have proved his pet theory or theories, and the sculptures themselves give no definite clues.

[দেখছি, কোনও প্রচারকারীই তাঁর প্রিয়মত বা মতগুলি প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। অপরপক্ষে মূর্তিগুলি নিজেহাও কোন সূত্র রেখে যায়নি।]

হয়তো একটু অবিনয় থেকে যাচ্ছে, তবু আমার যা বক্তব্য তা আমাকে বলতে দিন : আমার মনে হয়েছে “মূর্তিগুলি নিজেহা কোনও সূত্র রেখে গেছে কি না তা যাচাই করেই দেখা হয়নি। বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠার মূর্তির জাত-নির্ণয়—তাদের বিবর্তন ধারার সমীক্ষা করা হয়নি। কোন মন্দিরে কী-জাতের কতগুলি মিথুন আছে পুরাতত্ত্ব-বিভাগ তার পরিসংখ্যান গ্রহণ করেননি—কোনও গবেষক করেছেন বলেও আমরা জানিনা। সংখ্যায়, গুরুত্বে তারা কালের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান, না কমছে, কেন বাড়ছে বা কমছে তা কেমন করে বিচার করব যদি অমন প্রাথমিক পরিসংখ্যানই না থাকে? কলিঙ্গ-দেউলে মূর্তি নির্মাণের জোয়ার আসে শশাঙ্কের কলিঙ্গ বিজয়ের অর্ধশতাব্দী পর থেকে (সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদ)। তারপর শৈলোদ্ভব, ভৌমকর, সোমবংশী, কেশরী এবং গঙ্গ-বংশের রাজত্বকালে কীভাবে ভুবনেশ্বর-পুরী-কোনার্ক কলিঙ্গ স্থাপত্য-ভাস্কর্য বিবর্তিত হয়েছে তা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করছি। এই রাজ্যের বর্গের কিছু সংখ্যক আদিবাসী কিন্তু ধর্ম হিন্দু। কিছু গোঁড়ীয় প্রভাব এসেছে কলিঙ্গে, কিছু দাক্ষিণাত্যের, কিছু খাজুরাহোর চাণ্ডল্য রাজাদের প্রভাব। ধারাবাহিকভাবে আলোচনা না করলে কেমন করে বুঝব কার প্রভাবে মিথুনবাদে যৌনতা উদ্ভবগামী অথবা নিয়মগামী।

একক প্রচেষ্টায় আমি কলিঙ্গের মাত্র এগারোটি প্রধান মন্দিরে মিথুনের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করছি। তার নগ্নটি ভুবনেশ্বরে, একটি কোণার্ক এবং একটি খিচিং-এ। তালিকাকারে সেই পরিসংখ্যানটি পেশ করার সময় আমরা আরও কিছুটা অঙ্কের হিসাব পরিবেশন করছি, যার ব্যাখ্যার প্রয়োজন :

প্রথম কথা, প্রতিটি মন্দিরে একটা শতকরা হিসাব ব্যাকেটের ভিতর লিখে আমরা বোঝাতে চেয়েছি সেই মন্দিরে কোন জাতের মিথুন মূর্তির অনুপাত কত। দ্বিতীয়ত আমরা আরও একটি হিসাব কষিছি। যদি আমরা মূর্তির খাঁড়িতে ধরে নিই যে, পাঁচটি জাতের মিথুন মূর্তিতে তথাকথিত অঙ্গুলিতা বা যৌনতার পরিমাণ সমানভাবে বেড়েছে—অর্থাৎ মূর্তি, উত্তেজিত মিথুন, শৃঙ্গাররত মিথুন, মৈথুনরত মিথুন ও যৌথ যৌনাচারে “অঙ্গুলিতা বৃদ্ধির” পরিমাণ ২০, ৪০, ৬০, ৮০, ১০০ এই শতাংশের হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাহলে ঐ মন্দিরগুলির মোট অঙ্গুলিতার একটা ‘মান’ পাওয়া যেতে পারে। শেষ স্তরে সেই মানটি উল্লিখিত হয়েছে। যথা :

$$\text{পরশুরামেশ্বরের মান} = (৪৬ \times ২০ + ৫৩ \times ৪০) \div ১০০ = ৩০.৪$$

$$\text{গোব্রী-দেউলের মান} = (৪০ \times ২০ + ২৭ \times ৪০ + ৬ \times ৬০ + ২৭ \times ৮০) \div ১০০ = ৪৪.০$$

$$\text{কোনার্ক-দেউলের মান} = (৬ \times ২০ + ২৩ \times ৪০ + ২০ \times ৬০ + ৩৬ \times ৮০ + ১৫ \times ১০০) \div ১০০ = ৬৬.২$$

মিথুন—৫

কলিঙ্গ-দেউলে মৈথুনবাদের বিবর্তন ও অঙ্গীলতার মান

ক্রমিক সংখ্যা	কলিঙ্গ-দেউলের		প্রথম মূলমূর্তি	দ্বিতীয় উত্তেজিত মিথুন	তৃতীয় শৃঙ্গাররত মিথুন	চতুর্থ মৈথুনরত মিথুন	পঞ্চম যৌথ যৌনাচার	অঙ্গীলতার মান
	নাম দেব / দেবী	স্থান (নির্মাণকাল)						
১	পরশুরামেশ্বর (শিব)	ভুবনেশ্বর ৭৫০ খ্রীঃ	২২ (৪৬%)	২৫ (৫০%)	—	—	—	৩০'৪
২	বৈতাল (শক্তি)	ভুবনেশ্বর ৮৫০ খ্রীঃ	১২ (৩৬%)	১৯ (৫৭%)	—	২ (৭%)	—	৩৫'৭
৩	মুক্তেশ্বর (শিব)	ভুবনেশ্বর ৯৫০ খ্রীঃ	৫ (৮৩%)	—	—	১ (ক) (১৭%)	—	৩০'০
৪	ব্রহ্মেশ্বর (শিব)	ভুবনেশ্বর ১০০০ খ্রীঃ	৫ (১৩%)	২৬ (৬৬%)	৮ (২১%)	—	—	৪১'৫
৫	গৌরী (শক্তি)	ভুবনেশ্বর ১০০০ খ্রীঃ	৬ (৪০%)	৪ (২৭%)	১ (৬%)	৪ (খ) (২৭%)	—	৪৪'০
৬	রাজারানী (?)	ভুবনেশ্বর ১০৫০ খ্রীঃ	৫ (২৬%)	৬ (৩২%)	৩ (১৬%)	৫ (গ) (২৬%)	—	৪৮'৪
৭	কেদারেশ্বর (শিব)	ভুবনেশ্বর ১০৫০ খ্রীঃ	—	২ (৩৩%)	৪ (৬৬%)	—	—	৫৩'৩
৮	চামুণ্ডা (শক্তি)	খিচিং ১১০ খ্রীঃ	২ (ঘ) (২০%)	২ (২০%)	১ (১০%)	৩ (৩০%)	২ (ঙ) (২০%)	৬২'০
৯	লিঙ্গরাজ (শিব)	ভুবনেশ্বর ১১০০ খ্রীঃ	২ (৬%)	২৫ (৭০%)	৭ (২১%)	—	—	৪২'৯
১০	অনন্তবাসুদেব (বিষ্ণু)	ভুবনেশ্বর ১১৫০ খ্রীঃ	৩ (৩০%)	৩ (৩০%)	২ (২০%)	২ (২০%)	—	৪৬'০
১১	কোনার্ক (সূর্য)	কোনার্ক ১২৫০ খ্রীঃ						
	জগমোহন ও বিমানের							
	সম্মিলিত গ্রন্থ		২০	৬৫ (চ)	৫৮	১৩১ (ছ)	৪৯ (জ)	
	জগমোহন—বাড় অংশ		—	১৯	১৮	১০	৭	৬৬'২
	নাটমন্দির—গ্রন্থ		—	—	—	—	—	
	নাটমন্দির—উপরাংশ		৩	৫	২	—	—	
			২৩ ৬%	৮৯ ২৩%	৭৮ ২০%	১৪১ ৩৬%	৫৭ ১৫%	

আপনারা হয়তো বলবেন—আমার ঐ অভ্যুপগম বা হাইপথেসিসটা মেনে নিতে পারছেন না। হয়তো পাঁচজাতের মিথুনে অশ্লীলতা বা যৌনতা বৃদ্ধির অনুপাতটা আপনার মতে ১ : ২ : ৩ : ৪ : ৫ হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়নি, হয়তো বেড়েছে ১ : ১.৫ : ৩ : ৫ : ৮ অর্থাৎ ১০, ১৫, ৩০, ৫০, ৮০ এই শতাংশের হারে। তাহলে বলা যেতে পারে—বেশ তাই সই, সেক্ষেত্রে আপনার তালিকার শেষ অক্ষফল অন্য প্রকারের হবে বটে কিন্তু আপনার গ্রাফটাও মোটামুটি আমার গ্রাফেরই আকার নেবে।

আরও এক ধরনের আপত্তি হতে পারে। তার পিছনেও ‘ষথেষ্ট’ মুক্তি আছে :

এ-গ্রন্থে যে-হিসাবে যৌনতার মান নির্ধারণ করা হয়েছে তাতে মন্দিরের আকার, তার মোট মূর্তির সংখ্যাটা প্রাতিফলিত হয়নি। বিশালায়তন লিঙ্গরাজ্যে হিসাবমত ৩৪টি মিথুন মূর্তি পাওয়া গেছে, তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন কৈদারেশ্বরে আছে মাত্র ৬টি ; অথচ আমার হিসাবমত লিঙ্গরাজ্যে মিথুনবাদে যৌনতার মান ৪২.৯ এবং কৈদারেশ্বরে তার চেয়ে বেশী—৫৩.৪ ; কিন্তু ভেবে দেখুন সেটাই কি ঠিক নয় ? কৈদারেশ্বরে ৬৬ শতাংশ মূর্তি শৃঙ্গাররত মিথুন, অথচ লিঙ্গরাজ্যে মাত্র ২১ শতাংশ। কোন দেউলে মোট মূর্তির কত শতাংশ আদি-রসাত্মক (সুরসুন্দরী ও মিথুন) তার পরিমাপ করতে পারলে খুব ভাল হত। একক প্রচেষ্টায় তা করে ওঠার সময় পাইনি। খাজুরাহোতে দু-একটি ক্ষেত্রে যে-চেষ্টা করেছি। সে কথা যথাস্থানে।

আগের পৃষ্ঠায় যে তালিকাটি প্রকাশ করেছি তাতে কয়েকটি সাংকেতিক চিহ্ন আছে—‘ক’ থেকে ‘ছ’। সেগুলির ব্যাখ্যা এবার দাখিল করি :

(ক) মুক্তেশ্বর দেউলে ঐ একটি মাত্র মৈথুনরত মিথুন মূর্তিটি একটি খাঁজের ভিতর সুকৌশলে লুক্কাইত—সহজে নজরেই পড়ে না। ব্যঞ্জনাটি তাৎপর্য পূর্ণ। ইতিপূর্বেই বৈতাল-দেউলে প্রকাশ্য স্থানে দুটি মৈথুনরত মিথুন কিন্তু খোদিত হয়েছে। আমরা পরে একটি সিদ্ধান্তে আসব যে, শক্তি মন্দিরে মিথুনবাদ যতটা সহজে যৌনতা-আশ্রয়ী শৈবমন্দিরে ততটা নয়। বহুত ‘মৈথুনবাদ’ কলিঙ্গ ভাঙ্কর্ষে এসেছে তান্ত্রিক বামাচারের মাধ্যমে—তাই শক্তি মন্দিরে স্বভাবই যৌনতা বেশী। মুক্তেশ্বরের ঐ একটি মাত্র মূর্তি এ সিদ্ধান্তের সহায়ক।

(খ) গোরী-দেউল মুক্তেশ্বরের পঞ্চাশ বছর পরে নির্মিত [সময়কাল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা একমত নন। সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিটি মন্দিরের নির্মাণকালটা চিহ্নিত হয়নি। এ-গ্রন্থে ভুবনেশ্বরের প্রতিটি মন্দিরের নির্মাণকাল হিসাবে আমি যে তথ্য পরিবেশন করেছি তা উক্ত কৃষ্ণচন্দ্র পানিগ্রাহীর গবেষণা^{২৬} অনুসারে] এই শক্তি মন্দিরে মৈথুনরত মূর্তির সংখ্যা মাত্র পঞ্চাশ বছরে চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং সেগুলি অপ্রকাশ্য স্থানে লুকানোর প্রয়োজন দেখা যাচ্ছে না। অর্থাৎ ৯৫০ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দর্শকের হুঁচি অনেকটা বদলে গেছে। মিথুনবাদ মৈথুনবাদে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। আরও লক্ষণীয়, ঐ সময়কালের মধ্যে খাজুরাহোতে মৈথুনরত মিথুন ও বৌদ্ধ যৌনাচার দৃশ্য ষথেষ্ট পরিমাণে খোদিত হয়েছে।

(গ) রাজারানীর গর্ভমন্দিরে কোন মূর্তি বর্তমানে নেই, এটি কোন্ দেবতার/দেবীর মন্দির সেকথাও জানা যায় না। এখানে পাঁচটি মৈথুনরত মৈথুনের মধ্যে একটিতে সমকামিতা লক্ষণীয়। এই মিথুন-মূর্তিতে দুজনেই রমণী। মিথুন-বাদে ইতিপূর্বে সমকামিতা কলিঙ্গ-ভাঙ্কর্ষে আমার নজরে পড়েনি।

(ঘ) খিচিং-এর এই চামুণ্ডা দেউলটির সময়কাল দ্বাদশ-শতাব্দী বলে চিহ্নিত হলেও বাস্তবে এ মন্দির বর্তমান শতাব্দীতে স্বর্গত রমাপ্রসাদ চন্দ্রের নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে নির্মিত। ময়ূরভঞ্জ রাজার অনুপ্রাণে ধ্বংসস্থাপ থেকে পুরাতন প্রস্তরখণ্ড চয়ন করে এটি গঠিত। যেহেতু নূতন মিথুন-মূর্তি সংযোজিত হয়নি এবং প্রখ্যাত ভারতবিদ্র

তত্ত্বাবধানে নির্মিত তাই আমরা এটিকেও তালিকাভুক্ত করেছি—বিশেষ খিচিং শৈলী কলিঙ্গ-স্থাপত্যে এক দুর্লভ বৈশিষ্ট্যময় ব্যতিক্রম। এই মন্দিরে দুটি যুগল মনুষ্যমূর্তি ব্যতীত আরও দ্বাদশটি নাগ-দম্পতি আছে, যা হিসাবে ধরা হয়নি।

(ঙ) বোধ বোনাচারের দুটি পরিকল্পনা এই প্রথম খোদিত হতে দেখছি কলিঙ্গ ভাস্কর্যে (বলাবাহুল্য আমার ব্যক্তিগত এবং সীমিত সন্ধানের প্রতিফলনে, অর্থাৎ মাত্র এগারোটি মন্দির পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে)। মজা হচ্ছে এই যে, এ মন্দিরে তিনটি মৈথুনরত মৈথুন প্রকাশ্য স্থানে খোদিত হলেও এই দুটি বোধ-বোনাচার দৃশ্য খোদিত হয়েছে অপ্রকাশ্য খাঁজে। অর্থাৎ শতবর্ষ পূর্বে কলিঙ্গ-ভাস্কর মৈথুনরত মূর্তি নিয়ে যেভাবে বিরত বোধ করেছিলেন—যা আমরা প্রতিফলিত হতে দেখছি মুক্তেশ্বর দেউলের ক্ষেত্রে, এবার সেই সঙ্কেচ দেখা যাচ্ছে প্রথমবার বোধ-বোনাচার পরিবেশনার। তদুপরি বোধ বোনাচার দৃশ্যের তৃতীয় ব্যক্তিটি উভয় ক্ষেত্রেই অকর্মক—অবলোকন-কামের বশবর্তীমাত্র। তারা সাকর্মক হয়নি তখনও।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলিঙ্গে এই দেউল নির্মাণের পূর্বেই খাজুরাহোতে যাবতীয় উল্লেখযোগ্য মন্দির নির্মিত হয়ে গেছে। সেখানে মাত্র পঞ্চাশ বছরে সব সঙ্কেচ এড়িয়ে প্রকাশ্যে বোধ বোনাচার কীভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তা যথাস্থানে আমরা আলোচনা করব।

(চ) ঐ উত্তেজিত মৈথুনগুলির মধ্যে আটটি নাগ-মৈথুন।

(ছ) ১৩১টি মৈথুনরত মৈথুনের ভিতর ১৫টি একটু অকৃত্রিম ধরনের। এ জাতীয় মূর্তি অন্য কোনও মন্দিরে আমার নজরে পড়েনি। এদের আদৌ মৈথুন-মূর্তি বলা যাবে কিনা এ নিয়েও বিতর্কের অবকাশ আছে—কারণ এখানে স্ত্রী-পুরুষ দুটি মূর্তি নেই; আছে একটি মাত্র ‘বিবৃত জঘনা’ দণ্ডায়মানা নারী মূর্তি, যার চরণদ্বয়ের কেন্দ্রস্থলে উর্ধ্বমুখ একটি শিবলিঙ্গ; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৌরীপটু বিহীন। এ মূর্তির ধর্মীয় ব্যাখ্যা কিছু খুঁজে পাইনি, স্বয়ং মৈথুনের প্রতীক নয় বলেই আমার বিশ্বাস। এ-ছাড়া তিনটি ক্ষেত্রে সমকামিতা লক্ষণীয়।

(জ) ৪৯টি মূর্তির ভিতর দুটিতে সমকামিতা প্রদর্শিত—উভয় ক্ষেত্রেই দুটি নারী। চারটিতে তৃতীয় ব্যক্তি অবলোকন-কামে অকর্মক। বাকি ৪৩টিতে একাধিক নরনারী সাকর্মক বোধ বোনাচারে লিপ্ত। অর্থাৎ আমাদের অনুসন্ধান কলিঙ্গ ভাস্কর্যের একেবারে শেষ পর্যায়ে এই কোনাকর্কেই বোধ বোনাচারে সাকর্মক তৃতীয় অথবা চতুর্থ ব্যক্তিতে দেখতে পাচ্ছি। এই পরিকল্পনা ইতিপূর্বে কলিঙ্গ ভাস্কর্যে অনুপস্থিত, যদিও এই শিল্পভাবনা নির্বিচারে খাজুরাহোর মন্দির গায়ে সর্বাত্মক প্রকাশ্যস্থানে সোচ্চারে প্রদর্শিত।

কলিঙ্গের ঐ এগারোটি মন্দিরের ভিতর একটির বিষয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনা অপরিহার্য বোধ করছি। কারণ আমাদের সমীক্ষার অন্যতম সিদ্ধান্তে সেটি প্রয়োজন। আমাদের ধারণা কলিঙ্গ-মৈথুনে বোনতা বৃদ্ধির দুটি উৎস। প্রথমত তান্ত্রিক কামাচার, দ্বিতীয়ত খাজুরাহোর প্রভাব। প্রথম যুক্তিটি সন্দেহ ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। আমরা লক্ষ্য করে দেখছি আলোচ্য এগারোটি মন্দিরের মধ্যে পাঁচটি হচ্ছে শিবের মন্দির। তার একটিতেও বোন-বোনাচার মূর্তি স্থান পায়নি, এমনকি মৈথুনরত মৈথুনেরও মাত্র একটি উদাহরণ আমরা পেরেছি; মুক্তেশ্বরে—সুকোশলে লুক্কায়িত মূর্তি। এ থেকে নিশ্চয়ই এ সিদ্ধান্তে আশা যেতে পারে—শৈব উপাসকেরা বোনতা বিষয়ে ঐ জাতের বাড়াবাড়ি পছন্দ করেননি। দ্বিতীয় সূত্র—খাজুরাহোর প্রভাব, সেটা কলিঙ্গে কোন পথে এল এবার তাই দেখবার চেষ্টা করব এবং সে জন্যই ঐ একটিমাত্র মন্দিরকে খুঁটিয়ে দেখতে বসেছি। মন্দিরটি: রাজারানী।

একাধিক কারণে ভুবনেশ্বরে এটি একটি অতুলনীয় মন্দির। নাম ও রূপে।

প্রথম কথা : নাম। ভুবনেশ্বরের প্রতিটি শৈব-মন্দিরের নামকরণের শেষাংশে “ঈশ্বর” প্রত্যয়টি যুক্ত। বোধকরি একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম “লিঙ্গরাজ”। তা হোক প্রতিটি মন্দিরের নামে—কী শৈব, কী শাক্ত, কী বৈষ্ণব, বিগ্রহের নামের উল্লেখ আছে। শাক্ত মন্দির—বৈতাল, গৌরী, মোহিনী ; বিষ্ণু মন্দির—অনন্ত বাসুদেব-প্রভৃতি। একমাত্র রাজারানী মন্দিরের নামে বিগ্রহের কোন উল্লেখ নেই। এক দল বিশেষজ্ঞ বলেন, যে লালচে পাথর দিয়ে এ মন্দির নির্মিত তার নাম ‘রাজারানিরা’ ; মন্দিরের নাম ঐ শব্দটি থেকেই এসেছে।

মজা হচ্ছে এই যে, এ মন্দিরে কী বিগ্রহ ছিল তা কেউ জানে না। আদৌ কোনও বিগ্রহ বসানো হয়ে থাকলে কে বা কারা, কি-জ্ঞান-কি-কারণে সেটি স্থানান্তরিত করেছে। কেউ কেউ বলছেন, এ মন্দিরে কোনদিনই বিগ্রহ বসানো হয়নি। তাঁদের যুক্তি দু-জাতের। প্রথম কথা, মূল মন্দিরটিতে অতি সূক্ষ্ম কারিগরী ও অপূর্ব ভাস্কর্য আছে, জগমোহনে আদৌ নেই। যেন অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে জগমোহনটি শেষ করা হয়েছিল। বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন, হয়তো কোনও বৈদেশিক আক্রমণে অথবা রাষ্ট্রবিপ্লবে। ওঁদের দ্বিতীয় যুক্তি—কোনও পুরাণে এ মন্দিরটির উল্লেখ নেই—মাদলাপঞ্জী, একান্নচন্দ্রিকা, কপিল সংহিতা প্রভৃতি এ বিষয়ে নীরব। মন্দিরে বিগ্রহ কোনও কালে প্রতিষ্ঠিত হলে, বিগ্রহের পূজা হলে, শাস্ত্রকারেরা নিশ্চয়ই তার উল্লেখ করতেন।

আমরা কিন্তু এ মতটি মেনে নিতে পারছি না। প্রথম কথা, রাজারানী মন্দির যখন নির্মিত হয় তখন কলিঙ্গের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য বহিঃশত্রু আক্রমণ বা রাষ্ট্র বিপ্লবের নজির নেই। দ্বিতীয় কথা, একান্ন পুরাণ চতুর্দশ অধ্যায়ে বলছেন—“মুক্তেশ্বর মন্দিরে পূর্বদিকে শস্তর ধ্বংসের দূরে শক্বেশ্বর মন্দিরটি অবস্থিত।” অর্থাৎ শস্তরটি গোরু ‘লেঙ্গ মাথায়’ করে সাজালে যে দূরত্ব হয়। রাজারানী মন্দিরটি সেই দূরত্বেই আছে, এবং রাজারানী ছাড়া আর কোনও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ঐ অবস্থানে নেই। তার মানে রাজারানী ছিল শিবের মন্দির, দেবরাজ ইন্দ্র সেবিত।

তা যদি সত্য হয়, তাহলে বুঝতে হবে মন্দিরে দেববিগ্রহ নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তা অপসারিত হয়। বিধর্মীরা সরানি, কারণ মন্দির অক্ষত। বেশ বোঝা যায়, কলিঙ্গ এ মন্দিরটিকে জাতে ঠেলতে চেয়েছে। পুরাণ ইতিহাসে ঠাই দেয়নি, একটা নাম পর্বস্ত দেয়নি। কেন?

মন্দিরটিতে একাধিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় :

১) বিমানের শিখর কলিঙ্গের প্রচলিত রীতিতে রেখ-দেউল নয়। ভূমি-আমলকে ভাগ করা নয়। অপর পক্ষে মূল শিখরের চারদিকে চারটি অনুরূপ শিখর আছে, তারপর খাঁজে খাঁজে, ধাপে ধাপে আরও অনেকগুলি শিখর গড়া হয়েছে। এই ধরনের একাধিক শিখর সমন্বিত মন্দির চুড়া কলিঙ্গে ইতিপূর্বে নির্মিত হয়নি, ভবিষ্যতেও হয়নি। আশ্চর্যের কথা খাজুরাহোয় প্রতিটি দেউল এই রীতিতে নির্মিত।

২) কলিঙ্গ-রীতিতে বিমান ও জগমোহনের ভিতর দিককার দেওয়াল থাকবে চারটে—প্রাণে একটি বর্গক্ষেত্র অথবা আয়ত ক্ষেত্র রচনা করবে। এ ক্ষেত্রেও রাজারানী একমাত্র ব্যতিক্রম—সেখানে দেওয়ালের ভিতর অংশ বাইরের খাঁজকাটা নক্সার অনুকরণ করেছে। এবারও কিন্তু ঐ একই কথা—এই রীতি খাজুরাহোতে বহুল প্রচলিত।

৩) বিমানের পূর্বপ্রান্তে জগমোহনের দিকে যুঁকে থাকে একটি সিংহ—কলিঙ্গ ভাস্কর্যে যার নাম ‘কাম্পান সিংহ’ সেটি এখানে অনুপস্থিত। খাজুরাহো মন্দিরেও ও রীতি প্রচলিত নয়।

৪) রাজারানী মন্দিরের অলসকন্যাগুলির স্টাইল খাজুরাহো-ধর্মী। খাজুরাহো-ভাস্কর্যের সঙ্গে কলিঙ্গস্থ আর কোনও দেউলের এমন সাদৃশ্য নেই।

নিঃসন্দেহে বোঝা যায় রাজারানীতে প্রবলভাবে খাজুরাহোর প্রভাব পড়েছে। আমার তো ব্যক্তিগত ধারণা—এ মন্দিরের পরিকল্পনাকার চাণ্ড্য শৈলীতে অভ্যস্ত।

বহুত আমি অবাক হব না যদি কোনও গবেষক ইতিহাস খোঁটে প্রমাণ কল্পতে পারেন—রাজারানী মন্দিরের নির্মাতা কলিঙ্গরাজ চাণ্ড্য রাজবংশে বিবাহ করেন। এবং সেই রানীর ঐকান্তিকতায় স্বশুরবাড়ির কোনও স্থপতিবিদকে ‘এনে এ মন্দিরটি নির্মাণ করান। আগেই বলছি, কলিঙ্গ শিল্পী নিজ শৈলী থেকে চুলমাত্র বিচ্যুতি সহ্য করতে চান না। হয়তো সে জনাই এই উপেক্ষা। হয়তো পরিণত বয়সে সেই রাজা নিজ জীবনকালের মধ্যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে তাড়াহুড়া করে জগমোহনটি শেষ করেন—তিনি হয়তো অনুমান করেছিলেন নিজ জীবদ্দশায় মন্দির প্রতিষ্ঠা করে না গেলে ও মন্দিরে বিগ্রহ কোনও কালেই বসানো হবে না।

এই অনুমান সত্য হলে রাজারানী সম্বন্ধে যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়। কেন সেটি বিদেশী লাল পাথরে বানানো, কেন খাজুরাহোর প্রচণ্ড প্রভাব, কেন মূর্তি অপসারিত হয়েছিল এবং কেন ভবিষ্যৎকাল বিগ্রহের নামের সঙ্গে মন্দিরের নাম যুক্ত না করে তাকে বলেছে : রাজা-রানী।

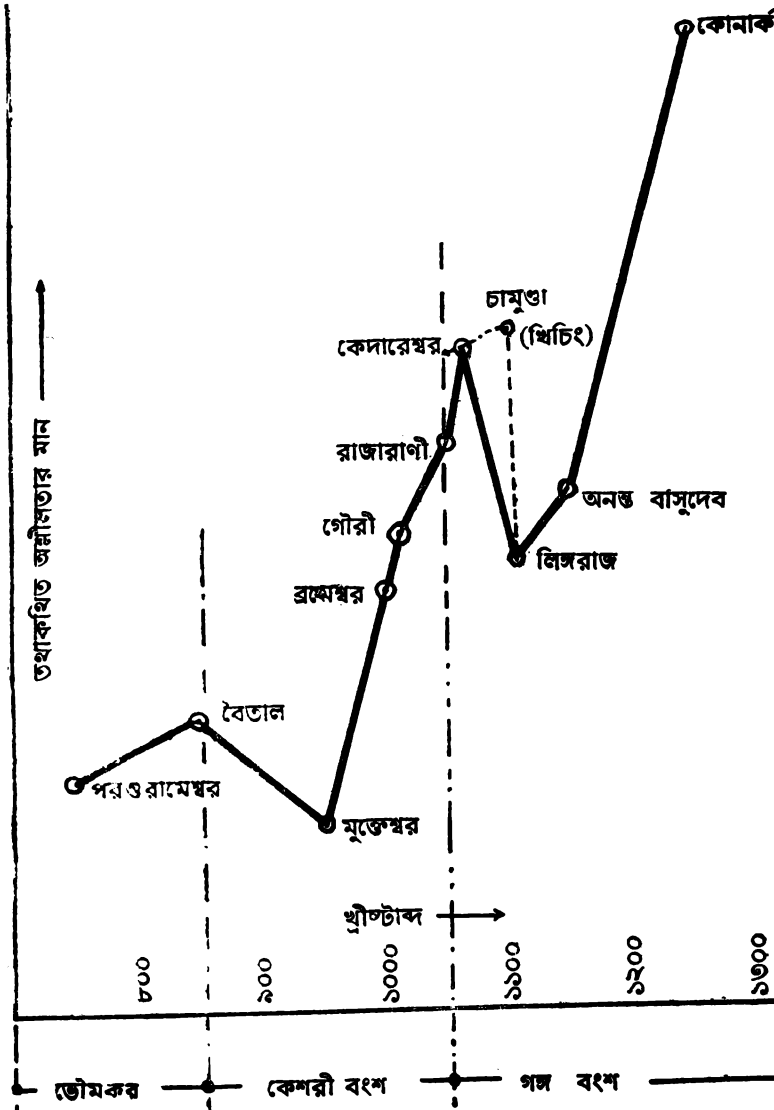
না, ‘রাজারানিরা’ পাথর দিয়ে গাঁথা বলে নয়, কলিঙ্গ শিল্পী যেন সঙ্ক্ষেপে বলতে চেয়েছে এ আমাদের কলিঙ্গ-দেউল নয় ; এ শুধু এক খেলালী ‘রাজারানী’র।

সে যাই হোক, খাজুরাহোর প্রচণ্ড প্রভাব সম্বন্ধিত এই মন্দিরে লক্ষ্য করে দেখুন ভুবনেশ্বর-স্থিত যাবতীয় মন্দিরের ভিতর এখানেই মৈথুনরত মূর্তি সর্বাপেক্ষা বেশী।

পরিসংখ্যানের সিদ্ধান্ত : কলিঙ্গের ঐ এগারোটি মন্দিরের সমীক্ষা থেকে আমরা এই অনুসন্ধানে উপনীত হতে পারি যে, উড়িষ্যার দেবদেউলস্থিত মৈথুন-মূর্তিগুলি এবং তার তথাকথিত অঙ্গলীতা অথবা যৌনতার বিষয়ে একটি বা দুটি কারণ আরোপ করে ব্যাখ্যা করা চলে না। এ কোনও স্থানীয় বা সাময়িক শিল্পজ্ঞর গন। ‘মৈথুনবাদ’ নামক শিল্পভাবনাটি অত্যন্ত ব্যাপক—স্থান ও কালের পরিমাপে। উড়িষ্যাতে এর ব্যাপ্তি-সহস্রাব্দিক বংসরের, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও প্রথম তিনটি জাতের মৈথুনমূর্তি ব্যাপক আকারে দৃষ্ট হয়, সর্বাপেক্ষা বেশী খাজুরাহোতে, মাত্র এক শতাব্দীকালের ভিতর। উড়িষ্যাতে এই শিল্পভাবনাটির গতি যেন একটি নদীর ধারার মত। গঙ্গোত্রী-গোমুখীর গঙ্গার সঙ্গে মোহনার ভাগীরথীর সাদৃশ্য শুধু নামে—তার আকার-প্রকার, গতি ও বিস্তৃতিতে আশমান-জমিন ফারাক। ‘নাম’ ছাড়া ‘রূপের’ ক্ষেত্রেও কিছুটা যোগসূত্র আছে—উপাদানে ও গতিতে। গঙ্গোত্রীর গঙ্গা ও মোহনার ভাগীরথীর মৌল উপাদান গঙ্গোদক এবং তার ধর্ম নিয়ত-প্রবাহমানতা। অনুব্রূপভাবে প্রথম ও শেষ যুগের মৈথুন মূর্তিতে নাম ছাড়া তাদের যোগসূত্র হচ্ছে তাদের উপাদান ও গতিধর্মভাৱ। উভয় ক্ষেত্রেই পাওয়া যাচ্ছে আদিরসাপ্রসূত পুরুষ ও প্রকৃতিকে এবং তাদের মৌল বন্ধন : দেহজ কাম। ফলে নদীর ক্ষেত্রে যেমন প্রতিটি বাকের মুখে আমরা কারণটা বুঝে নেবার চেষ্টা করি—কেন সে ডাইনে মোড় না ঘুরে বাঁয়ে ফিরল, ঠিক তেমনিভাবে এই মৈথুনবাদকে ষাটাই করতে হবে তার সহস্রবর্ষব্যাপী পথ পরিক্রমার—যুগে যুগে, দেশে দেশে। মৈথুনবাদের বিবর্তনের মধ্যেই পেলেও পাওয়া যেতে পারে তাদের উপস্থিতির হেতু।

একাদশটি মন্দিরের পরিসংখ্যান- প্রসূত ‘মান’ থেকে আমরা একটি রেখা-চিত্র বা গ্রাফ রচনা করতে পারি। এ ক্ষেত্রে সামন্তরাল-রেখা বা এ্যাবসিসা’হচ্ছে সময়, কাল ; এবং খাড়া-রেখা বা ‘অর্ডিনেট’ হচ্ছে যৌনতার মান। গ্রাফটি

আমাদের অভ্যুপগম-অনুসারে তথাকথিত অশ্লীলতার মান সূচীত করেছে। ঐ গ্রাফ বা রৈখিক-স্থাপন থেকে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি সাধারণ সূত্রে উপনীত হতে পারি :



চিত্র—১০ যৌনতা ও কালের ক্রম—কলিঙ্গ

প্রতি সাধারণ মানুষের পূজীভূত ষ্ণা একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য, অথচ তারা একথাও জানে যে, ঐ সমাজবিরোধীরাই রাজশক্তির অনিবার্য স্তম্ভও। তাই সাময়িক দমনের পর আবার তাদের হাতেই ক্ষমতা তুলে দিতে হয়। আমাদের গ্রাফে ঐ 'এ্যানালজিটা'

১) তথাকথিত অশ্লীলতা বা যৌনতা সাধারণভাবে কালের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে ক্রমবর্ধমান।

২) কিন্তু আশ্চর্য, যখনই রাজশক্তির ক্ষমতা বদল হয়েছে ঠিক তার অব্যবহিত পরেই অশ্লীলতার পরিমাণ দ্রুতহারে সাময়িকভাবে কমে গেছে। কেন? একটা 'এ্যানালজি' দিয়ে বিচার করুন :

আজকের সমাজে অনেক দেশেই সমাজবিরোধী, স্বেচ্ছাচারী, মনাফাখোর, কালোবাজারী, মজুতদার প্রভৃতি ক্ষমতা-শালী মানুষেরা উত্তরোত্তর গ্রীবাঙ্ক লাভ করে চলেছে। কিন্তু যেই রাজশক্তির বদল হয়—রক্তপাতের মাধ্যমেই হ'ক, অথবা ভোটবাক্সের নির্দেশেই হ'ক, অমনি দেখা যায়—নূতন শাসক ওদের খড়গাকড় শুরু করে দেন। সাধারণ মানুষ নবীন শাসকের জয়গানে মুগ্ধ হয়ে ওঠে, 'যুগ যুগ জিও' ধ্বনি শোনা যায় দেশের সর্বত্র। তারপর? তারপর দিন যায়, নবীন শাসক শাস্ত-শোষণের ভূমিকার ফিরে আসেন, কারাবুদ্ধ কালোবাজারীরা কবে যে কারাগার থেকে মুক্তি পায় সে কথা সংবাদপত্রে ছাপা হয় না; দেখা যায় ঐসব সমাজ বিরোধী মানুষগুলোর প্রভাব-প্রতিপত্তির নিম্নমুখী গ্রাফ আবার উর্ধ্ব-মুখী হয়ে গেছে। অর্থাৎ শাসক সর্বদেবে সর্বকালেই জানে—ঐসব সমাজ-বিরোধীদের

আরোপ করে আমরা কি এই সিদ্ধান্তে আসব-যে, অশ্লীলতার প্রতি সাধারণ মানুষের সায় কোন কালেই ছিল না, থাকে না, কিন্তু বিলাস-ব্যসনে আকর্ষণ-নিমগ্ন রাজশক্তির আনুকূল্যে ওরা বারে বারে ফিরেএসেছে, শ্রীবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে ?

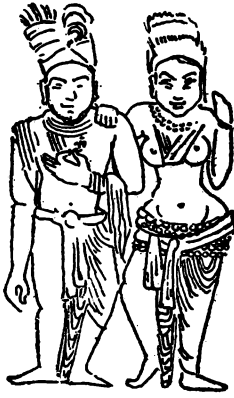
৩) দেখছি, কলিঙ্গরাজ্যে যখনই শিব মন্দিরের পরিবর্তে শাক্তদেউল গড়ে উঠেছে—অর্থাৎ রেখ-দেউলের পরিবর্তে কাথর-দেউল গাঁথা হয়েছে, তখনই তথাকথিত অশ্লীলতার মান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। বৈতাল, গোরী, খিচিং—বার বার তিনবার আমরা এ তথ্যটি লক্ষ্য করেছি—তিনটিকেই কাকতালীয় বলি কি করে? এর হেতু কি এই : মৈথুন ধর্মাচরণের অঙ্গ হিসাবে ভারতীয় সংস্কৃতিতে সর্ব প্রথম গৃহীত হয়েছিল তান্ত্রিক বামাচারেই? ক্রমে তা শৈব, বৈষ্ণব, আউল-বাউল সম্প্রদায়ে সংক্রামিত হয় ?

৪) যৌথ যৌনাচারের পরিকল্পনা কলিঙ্গের ভাস্কর্য-ইতিহাসে কোন যুগে ছিল না। ভুবনেশ্বরের মাত্র ৯টি মন্দিরের তথ্য এখানে সংকলিত করেছি, কিন্তু বাদবাকি মন্দিরগুলি—যারা আজও টিকে আছে, আমি উন্নততম করে খুঁজেছি কিন্তু একটিও প্রকটভাবে-দৃশ্য যৌন যৌনাচার মূর্তি উদ্ধার করতে পারিনি। অন্তত পনের বোলটি মন্দির আমি খুঁটিয়ে দেখেছি, তার অনেক-গুলিই অবশ্য নিতান্ত ধ্বংসস্থাপ। এজন্য আশ্চর্য হয়েছি যখন ডক্টর মূলক রাজ আনন্দ প্রমুখ ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রবক্তারা এর সমর্থনে বলতে চেয়েছেন এই পরিকল্পনা সহস্রবৎসরের ঐতিহ্যমণ্ডিত। আমার ধারণা—যৌথ যৌনাচারের পরিকল্পনা কলিঙ্গের নিজস্ব সম্পদ নয়, এটি খাজুরাহোর অনুকরণে কলিঙ্গে মাত্র এক দশকের সাময়িক শিল্পক্ষুরণ। সহস্রাব্দীর ঐতিহ্যমণ্ডিত ভুবনেশ্বরে তাই যৌথ যৌনাচার সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, অথচ মাত্র দ্বাদশ বৎসরে নির্মিত কোনাকের ভগ্নমন্দিরে অর্ধশত উদাহরণ আজও খুঁজে পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ মন্দিরে কত ছিল তা অনুমান নির্ভর।

এবার বরং বিভিন্ন পর্যায়ের মৈথুনগুলি সম্বন্ধে ধারাবাহিক ও পর্যায়ক্রম আলোচনা করা যাক।

আট ॥ যুগল-মূর্তি ॥

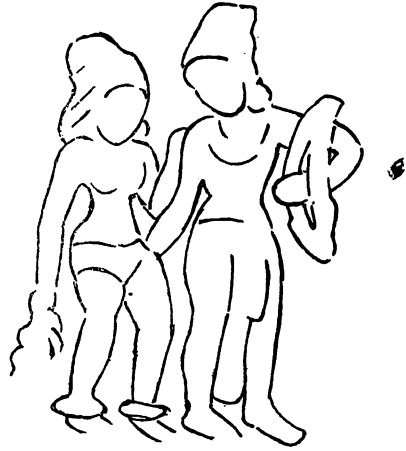
প্রথম জাতের মিথুন, যাদের আমরা ‘যুগল-মূর্তি’ নামে চিহ্নিত করেছি, তাদের আবির্ভাব ভারতীয় ভাস্কর্য-ইতিহাসের একেবারে আদি যুগ থেকে। উবাযুগে তারা ছিল অপ্রগল্ভ, শালীনতা-বোধে সলজ্জ। ভারহুত, সাঁচী, বুদ্ধগয়া, উদয়গিরিতে খ্রীষ্টপূর্ব মৌর্যযুগে যে যুগলমূর্তি পাই তারা সকলেই আবাশ্যিকভাবে ঐ জাতের। তারা দু-জন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অথবা



চিত্র : ১১

ভারহুতের যুগল মূর্তি

খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী



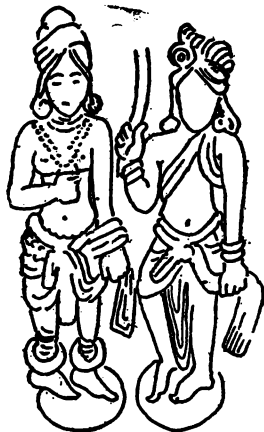
চিত্র : ১২

উদয়গিরির যুগল মূর্তি

খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী

বসে আছে, দাঁড়িয়েই বেশি। বড় জোয় পুরুষ মূর্তিটি তার সঙ্গিনীর কাঁধে আলতো করে একটি হাত রেখেছে, অথবা তার চম্পকাসুঁলি নিজ করমূর্তিতে গ্রহণ করে আস্তর-উষ্ণতা নর্মসহচরীর দেহ-মনে সঞ্চারিত করছে। তারা লাজুক, তারা শালীন। আজকের দিনের নব-বিবাহিত দম্পতি ক্যামেরাম্যানের সম্মুখে যতটা প্রগল্ভতা দেখানো শালীন বলে মনে করে দু হাজার বছর আগেও তারা তাই করত। মনে হয় প্রথম যুগে তারা আবির্ভূত হয়েছিল নিতান্ত অলঙ্করণের উদ্দেশ্য নিয়ে। যেন এক জোড়া পদ্ম, অথবা শম্ভু, কিম্বা জ্যামিতিক নকসা। কেন্দ্রীয় অক্ষরেখার দুদিকে,—ডাইনে-বামে, এভাবে ভারসাম্য রক্ষার খাতিরে যুগলবহু সংস্থাপন আলিম্পনরীতির একেবারে মূল কথা। কিন্তু যুগল মানুষের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ আছে—জোড়ায় জোড়ায় পদ্ম-শম্ভু-পক্ষী-মৎস্য ইত্যাদি অলঙ্করণ এক জাতের; হয়তো একটি ডানদিকে বঁকেছে, অপরাটি তার দর্পণ-প্রতিবিম্বের ছাঁদে বাঁ দিকে হেলেছে, তবু তারা একে অপরের প্রতিচ্ছায়া। অপরপক্ষে যুগল মূর্তিতে একটা লিঙ্গগত বৈপরীত্য অনস্বীকার্য—একটি পুরুষ ও একটি প্রকৃতি—বৈপরীত্য তাদের ভঙ্গিমায় নয়, লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্যে। সেখানে ঐ

বৈপরীত্যের বন্ধনেই গড়ে ওঠে ভারসাম্যের একটা ঐক্যতান—সমগ্র শিল্পবস্তুটির সার্থকতা। যেন চৌষকের দুটি বিপরীত মেঘুর বন্ধন, যেন বৈদ্যুতের দুই ভিন্নধর্মী-প্রান্তের চুম্বন-ক্ষুণ্ণিক, ঋণাত্মক ও ধনাত্মক।



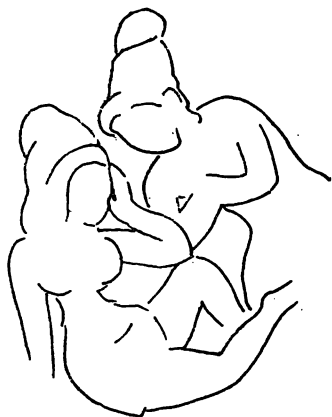
চিত্র : ১৩

সাঁচী তোরণে যুগল মূর্তি
খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী

‘যুগল-মূর্তি’ শব্দটি এখানে ব্যবহার করছি। কারণ এরা নিছক অলঙ্করণের উদ্দেশ্য নিয়ে গৃহা-প্রাচীরে উপস্থিত হয়নি—

আরও লক্ষণীয়, প্রথমজাতের এই সব যুগলমূর্তি ভারতবর্ষের অতিদূর প্রান্তস্থিত বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় এক সঙ্গে আবিষ্কৃত। যেন একই ভাবনার উৎসমুখ থেকে তাদের জন্ম। উদয়গিরি, সাঁচী, ভারহুত ও অজন্তার মধ্যে যে ভৌগোলিক ব্যবধান তাতে কিছুতেই মেনে নিতে মন চায় না যে, খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে শিল্পীরা পরস্পরের সংবাদ রাখতেন, পরস্পরের শিল্প-নিদর্শন দেখতে পেতেন। ওঁদের মাক্থানে ছিল অনতিদূর পর্বতশ্রেণী, দুল্লভ নদী এবং দুর্ভেদ্য অরণ্যানী। তখন না ছিল এমন পথঘাট, না এমন যানবাহন, বরং গমনাগমনের পথ আকীর্ণ ছিল দস্যুতে, বন্যজন্তুতে, হিংস্র আদিবাসীতে। তবু প্রথম যুগের যুগল মূর্তিগুলির মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য। আমরা তদানীন্তন ভারতের তিন প্রান্তের তিনটি শিল্প নিদর্শন আপনাদের পরীক্ষার জন্য পেশ করছি—ভারহুত (চিত্র : ১১), উদয়গিরি (চিত্র : ১২) এবং সাঁচী (চিত্র : ১৩) থেকে। ওঁদের পোষাক পরিচ্ছদ, শিরস্ত্রাণ, দেহ-ভঙ্গিমা এবং স্টাইল বা শিল্পশৈলীতে আশ্চর্য মিল।

প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে আরও দুটি প্রায় সমসাময়িক উদাহরণ পেশ করার ইচ্ছাও জাগছে। এ দুটিকে ঠিক ‘যুগল-মূর্তি’ অবশ্য বলা চলে না—অর্থৎ যে অর্থে আমরা ‘যুগল-মূর্তি’ শব্দটি এখানে ব্যবহার করছি। কারণ এরা নিছক অলঙ্করণের উদ্দেশ্য নিয়ে গৃহা-প্রাচীরে উপস্থিত হয়নি—



চিত্র : ১৪

অভিমানিনী রাণী ও রাজা
উদয়গিরি, ১ম খ্রীঃ পূর্বাব্দ। গৃহা ভাস্কর্য

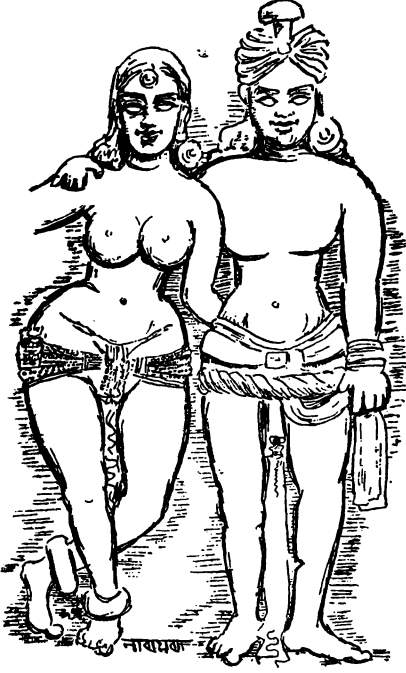


চিত্র : ১৫

অভিমানিনী রাণী ও রাজা অজন্তা ১০ ম
গৃহা ১ম খ্রীঃ পূর্বাব্দ। গৃহাচিত্র

হয়েছে কথাকোবিদের কাহিনীকে চিত্রায়ত করতে। ওরা এক-একটি কাহিনীর খণ্ডাংশ মাত্র। উভয় ক্ষেত্রেই বিষাদগ্রস্ত।

অভিমানিনী রাণীকে রাজা সাক্ষাৎ দিচ্ছেন। প্রথম চিত্রটি (চিত্র : ১৪) উল্লরগিরি গণেশ পুঙ্কা থেকে সংকলিত—কাহিনীটি কী, তা আমরা নিশ্চিতভাবে আজও জানি না ; আচার্য সুনীতি কুমারের মতে এটি বাসবদত্তা কাহিনী। ২৭৫ অর্থাৎ রাজা ও রাণী



চিত্র : ১৬

কার্ল চৈতোর দম্পতী

শ্রেষ্ঠী-শ্রেষ্ঠিনী, দাতা ও তাঁর সহধর্মিনী—যাদের অর্থানুকূল্যে তথাগত বুদ্ধের উদ্দেশ্যে এই চৈত্য-মন্দির গড়ে উঠছিল। এ জাতের যুগল-মূর্তির সঙ্গে মিশরীয় পিরামিড ও প্রাসাদে উৎকীর্ণ ফারাও ও রাণীর যুগল-মূর্তির তুলনা করা চলে। উভয় ক্ষেত্রেই দম্পতি এসেছেন দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, উভয় ক্ষেত্রেই দম্পতির তীর্থক বাসনা দেবমন্দিরে শাস্বতকাল ধারীর ভূমিকায় দণ্ডায়মান থাকা। তফাৎ এই যে, মিশরীয় যুগল-মূর্তি সর্বদা সমভঙ্গ ঠামে খাড়া দাঁড়িয়ে—স্তম্ভের মত, বৈচিত্রহীন। ভারতের কেন্দ্রীয় অক্ষরেখার দুদিকে তাদের দেহাবয়ব ভারসাম্য রক্ষা করে। অপরপক্ষে ভারতীয় যুগল-মূর্তি, বিশেষ করে নারী মূর্তিটি আভঙ্গ অথবা দ্বিভঙ্গঠামে লীলায়িত। মিশরীয় শিল্পে বক্ররেখা সংখ্যালঘু—সরল রেখাই সর্বাধিক ; সেখানকার বৃক্ষশ্রেণীও—ঝর্জুর তাল প্রভৃতি সরল-রেখায় দণ্ডায়মান। মিশরীয় যুগল-মূর্তিতেও যেন সেই প্রভাব পড়েছে, তারা বৈচিত্রহীন। ভারতীয় ভারতের

যথাক্রমে উদয়ন ও বাসবদত্তা। দ্বিতীয় চিত্রটি (চিত্র : ১৫) অজন্তা দশমগুহা থেকে সংকলিত—ষড়দন্ত জাতক-কাহিনীর খণ্ডাংশ। এই দুটি শিল্পনিদর্শনের মাঝখানে আছে দুর্ভেদ্য দণ্ডকারণের বিস্তার এবং ওদের ভৌগোলিক দূরত্ব হাজার কিলোমিটারের উপরে, অথচ লক্ষ্য করে দেখুন, দুটি শিল্পসম্পদে—একটি ভারতীয় নিদর্শন, অপরটি প্রাচীরচিত্র—কী সাদৃশ্য। ভঙ্গিমা, কম্পোজিশনে, আবেদনে, শৈলীতে।

সে বাই হোক, প্রথম যুগের এই অলঙ্কাররূপে-আবির্ভূত যুগলমূর্তির পরের যুগে ভারতীয় ভারতের আমরা এক নতুন জাতের যুগল মূর্তির সন্ধান পেলাম—যারা অলঙ্কার হিসাবে নয়, অন্য একটি উদ্দেশ্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তারা হচ্ছে দাতা-দম্পতি বা doner couple। পশ্চিমঘাটে পর্বতমালার নাসিককে কেন্দ্র করে খ্রীষ্টজন্মের প্রায় সমসময়ে—কিছু আগে পরে—গড়ে উঠেছিল একাধিক বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম। চৈত্য ও বিহার : ভাজা, কনুডেন, কাহ্নেরী, পিখালকোরা, নাসিক, অজন্তা, কার্লে প্রভৃতি। এই সব গুহা-চৈত্যের প্রবেশদ্বারে দেখতে

পাই এই দ্বিতীয় জাতের যুগলমূর্তি। তারা কম্প-লোকের নর ও নারী নর, তারা বাস্তব রাজা-রাণী,



চিত্র : ১৭

যক্ষ মিথুন, ভুবনেশ্বর সংগ্রহশালা

সম্ভব শতাব্দী

মুগল মূর্তি কিন্তু এ যুগে যথেষ্ট বৈচিত্র্যময়। তবু তারা তখনও সলজ্জ, অপ্রগল্ভ। এ জাতীয় মুগল মূর্তির একটি আঁতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ এখানে সম্মিলিত হল চিত্র : ১৬-তে। এটি কালেক্টর গুহাচৈতোর প্রবেশদ্বার থেকে সংকলিত। দাতা-দম্পতির মূর্তি।

আলোচ্য উদাহরণে নায়িকা তার বাম চরণটির ভঙ্গিমায় কম্পোজিসানে বৈচিত্র্য এনেছে মাত্র। কিন্তু কালেক্টর চৈতোর প্রবেশদ্বারে অপর কয়েকটি মূর্তিতে দেখতে পাচ্ছি নায়িকা নৃত্যরতা। [বামদিকের প্রবেশদ্বারে দুপাশে দুটি মূর্তি] যদিও পুরুষ মূর্তিটি সংযত—বড়জোর আভঙ্গ্যে একটু বেঁকেছে। প্রবেশদ্বার অভিক্রম করে চৈত্রে প্রবেশ করলে আর একটি বৈচিত্র্য দেখতে পাই। বিশালায়তন মূল বুদ্ধমূর্তির দুপাশে দুটি প্যানেল—প্রতিটি প্যানেলে চারজন নরনারী। দুটি পুরুষ এবং দুটি নারী। বামদিক থেকে যথাক্রমে : ‘নারী-নর-নারী-নর’ এই অনুক্রমে। এরা যৌথ যৌনাচাররত আদৌ নয়, দু-জোড়া মিথুন।

সর্বভারতীয় ভাস্কর্যে মুগলমূর্তির কথা থাক, কলিঙ্গে মন্দির শিল্প তথা ভাস্কর্যের জোয়ার এসেছিল সপ্তম শতাব্দী থেকে। লাকুলীশ প্রবর্তিত পাশুপত ধর্ম এবং গোড়াধিপতি শৈব সম্রাট শশাঙ্কের কলিঙ্গ বিজয় থেকে সে রাজ্যে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার জোয়ার আসে। প্রথম যুগের কয়েকটি দেউলে—শত্রুঘ্নেশ্বর, ভরতেশ্বর, লক্ষ্মণেশ্বর ইত্যাদি সম্পূর্ণ ভগ্নদশায়—আদিযুগের দণ্ডায়মান প্রথম উল্লেখযোগ্য দেউল পরশুরামেশ্বরেই দেখতে পাচ্ছি মুগল-মূর্তি। এদের আবির্ভাব কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। বৌদ্ধ দাতা-দম্পতির মত নয়। এরা বাস্তব নর-নারী নয়, কম্পলোকের দম্পতি। এদের উপস্থিতি অনিবার্য হয়ে পড়েছিল শাস্ত্রীয় নির্দেশে। কলিঙ্গে প্রথম যুগের মন্দিরগুলি ছিল অব্যতিক্রম শৈবমন্দির এবং শিবের মন্দিরে মিথুন-মূর্তি উৎকীর্ণ করার নির্দেশ আছে বাহুশাস্ত্রে। শাস্ত্রকার বলছেন :

শেষং মঙ্গল্যাবিহগৈঃ শ্রীবৃক্ষঃ স্থাপ্তিকৈর্ঘটৈঃ ।

মিথুনৈঃ পদবল্লভিঃ প্রমথৈশ্চোপশোভয়েৎ ॥

অর্থাৎ “প্রমথ-মন্দিরে উৎকীর্ণ করতে হবে : সর্প, মঙ্গলচিহ্ন, বিহগ, বিল্বপত্র, ঘট, শস্তিক-চিহ্ন এবং মিথুন।”

এ-ক্ষেত্রে ‘মিথুন’ শব্দটির অর্থ প্রকৃতি ও পুরুষের একত্র উপস্থিতি। তাদের মিথুন-রত অবস্থার কোন উল্লেখ বা ইঙ্গিত শাস্ত্র-নির্দেশে নেই। এবং কলিঙ্গের ভাস্কর প্রথম যুগে সেই অর্থেই ‘মিথুন’ শব্দটি গ্রহণ করেছিলেন। কালিদাসের ‘হংস মিথুন’ বাল্মীকীর ‘ক্রৌঞ্চ-মিথুন’ এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের ‘বাক-প্রাণ-মিথুন’ও ঐ অর্থবহ।

আরও লক্ষণীয়, কলিঙ্গ-ভাস্কর ঐ ভ্রোকে ব্যবহৃত ‘মিথুন’ শব্দটিকে ‘নর ও নারীর মধ্যে সীমিত রাখার কোন কারণ খুঁজে পাননি—বস্তুত ‘মিথুন’ অর্থ ‘নর ও নারী’ নয়, ‘পুরুষ ও প্রকৃতি’। তাই মনুষ্য-মিথুনের পাশাপাশি শিবমন্দিরে উৎকীর্ণ হতে থাকে অন্যান্য জাতের মিথুন : বানর-বানরী, সিংহ-সিংহী, করি-কারিনী, নাগ-নাগিনী। বস্তুত কলিঙ্গ-ভাস্করের কাছে এটাই আমাদের প্রত্যাশা ছিল—কারণ এটাই ভারতীয় ঐতিহ্যের শিক্ষা। ভারতবর্ষ মানবসমাজের চিন্তা-ভাবনা-অনুভূতি ক্রমাগত মনুষ্যতর জগতে প্রাক্ষিপ্ত করে দেয়, না হলে তার তৃপ্তি নেই। তাই তার মিলন-মাধুরী শুধু ‘মধুবাতা ঋতায়তে’ বলেই ক্ষান্ত হয় না, তাকে বলতে হয় এই রাত্রি মধুময়, এই ওষধি, এই বনস্পতি সবই মধুময়। তাই শকুন্তলা পতিগৃহে যাত্রা করলে শুধু অনসূয়া প্রিয়ংবদাই নয়, হরিণীরাও কাঁদে, এমন কি বনজ্যোৎস্নাও কাঁদতে থাকে। কলিঙ্গ ভাস্করও সেই ঐতিহ্যের বাহক—তাই তিনি বাস্তব জীবজগতেই তাঁর মুগলমূর্তিকে সীমিত রেখে তৃপ্তি পেলেন না—নির্মাণ করলেন কম্পলোকের ‘পুরুষ-প্রকৃতি’ : বক্ষ-মিথুন, কিস্কর-মিথুন, গন্ধর্ব মিথুন।

আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধানে কলিঙ্গ-ভাস্কৰ্যে এ জাতীয় যুগল মূর্তির প্রাচীনতম নিদর্শনটি ভুবনেশ্বর সংগ্রহশালায় রক্ষিত একটি বক্ষমিথুন (চিত্র : ১৭)। এই যুগল-মূর্তিতে যক্ষের মাথাটি হচ্ছে বশুর, বাকটুকু দেহে সে মানুষ, অথচ যক্ষণী প্রায় পুরোপুরি মানবী—শিঙ, লাজুল এবং স্ব-দন্ত ব্যতিরেকে। এই জাতীয় চিন্তাধারা—অর্থাৎ কম্পলোকের যুগলমূর্তি রূপায়ন যে দীর্ঘদিন কলিঙ্গ ভাস্করকে অনুপ্রেরণা দিয়ে এসেছে তার অজস্র প্রমাণ পাওয়া যায়। উদ্বাহু মানব-মানবী এবং নিম্নাঙ্গে নাগ-নাগিনী, মৎস্য-মৎস্যী এমন পরিকল্পনা প্রায় প্রতিটি যুগেই ছিল। এই শিল্পচেতনার ধারাবাহিকতার প্রমাণ স্বরূপ আর একটি উদাহরণ পেশ করা যাক—কলিঙ্গ-ভাস্কৰ্যের একেবারে শেষ যুগ থেকে, অর্থাৎ নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপ যখন শেষবার প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এটি কোনাকর্ষ জগমোহনের পূর্বদিকস্থ দ্বারের সর্বনিম্ন প্যানেলে খোদিত একটি কিম্বর-দম্পতি (চিত্র : ১৮)। লক্ষনীয়, সপ্তম শতাব্দীর এই যুগল বক্ষ মূর্তি এবং দ্বয়োদশ শতাব্দীর এই যুগল কিম্বর-মূর্তিতে বিন্দুমাত্র অশ্লীলতা স্থান পায়নি, যদিও ওদের নিম্ন যৌনাজ্ঞ সুপ্রকট।

আর একটি জিনিস লক্ষনীয় : ‘ভাজা-কার্লে’-কাহ্নেরী প্রভৃতি বৌদ্ধ চৈত্রে প্রায় সর্বত্র স্ত্রী-মূর্তিটি আছে পুরুষের দক্ষিণে—কারণ বৌদ্ধ ভাস্করের মতে প্রকৃতি হচ্ছে পুরুষের ‘বর-অঙ্গ’, ‘বেটার-হাফ’; তাই সে আছে পুরুষের দক্ষিণ হস্তের দক্ষিণা নিয়ে। অপরপক্ষে হিন্দু ভাস্কর স্ত্রী জাতীয়ার ‘বামাগতি’ লক্ষ্য করলেন। স্ত্রী-জাতীয়ার নামই হল : বামা। ফলে ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের দেউলে প্রকৃতি প্রায় আবশ্যিকভাবে উৎকীর্ণ করা হয়েছে পুরুষের বামে।

আমরা এতক্ষণ ভাস্কৰ্যে যুগল মূর্তি নিয়ে আলোচনা করছিলাম, এবার মন্দির স্থাপত্যে যুগল-মূর্তির প্রসঙ্গে আসা যাক। ভাস্করের দৃষ্টিতে মূর্তির যেমন লিঙ্গভেদ আছে, স্থপতিবিদের কাছেও তেমন আছে গোটা দেউলটার লিঙ্গভেদ। সেটি পুরুষজাতীয় হতে পারে, অথবা স্ত্রীজাতীয়।

মন্দিরের স্থাপত্য-বিচারে কলিঙ্গের দেব-দেউল চার জাতের : রেখ, পাড়, কাথর এবং গোড়ীয়া। শেষোক্ত দেউল যে স্থানীয় ভাবধারায় জন্মলাভ করেনি নামেই তার স্বীকৃতি। বাকি তিনটির ভিতর রেখ-দেউল (চিত্র : ১৯) হচ্ছে পুরুষ এবং পাড়-দেউল (চিত্র : ২০) হচ্ছে স্ত্রীজাতীয়। কেন এমন ভাবে লিঙ্গভেদ করা হল দেব-দেউলে ?

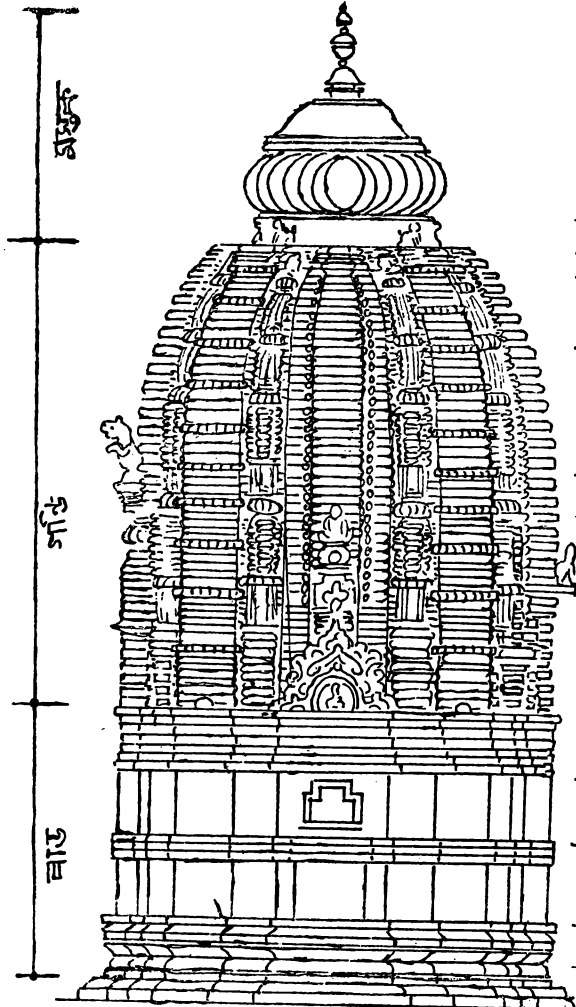
গুপ্ত-সংবৎ ৩০০-তে, অর্থাৎ ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে দেখছি, কলিঙ্গের দ্বিতীয় মাধবরাজ নিজেকে গোড়াধিপতি শশাঙ্কের করদরাজ বলে স্বীকার করছেন। শশাঙ্ক কাশ্যকুজের বৌদ্ধসম্রাট হর্ষবর্ধন, প্রাক্জ্যোতিষপুরের ভাস্করবর্মা, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী এবং চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-য়েন-ৎসান্-এর সমসাময়িক। একান্ত পুরাণ মতে গোড়রাজ শশাঙ্কই ভুবনেশ্বরে গিড়ভুবনেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। বহুত তিনিই কলিঙ্গে শিবমন্দির গঠনের ভগীরথ। শশাঙ্ক কোন শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেননি, অনাদিলিঙ্গ বরষু প্রস্তরখণ্ডের উপর লিঙ্গরাজ মন্দিরটি নির্মাণ করান। আমরা বর্তমানে যে লিঙ্গরাজ মন্দিরটি দেখতে পাই সেটি নয়। একই শিবলিঙ্গের উপর নির্মিত শশাঙ্কের মন্দির



চিত্র : ১৮

কিম্বর মিথুন, কলিঙ্গ, কোনাকর্ষ
প্রবেশ দ্বার, দ্বয়োদশ শতাব্দী।

আকারে অনেক ছোট ছিল। পরবর্তীকালে সেই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপরে বর্তমান লিঙ্গরাজ মন্দিরটি নির্মিত হয়।



লিঙ্গরাজ বিমান - উত্তর মস্তকদৃশ্য

চিত্র : ১১

লিঙ্গরাজ মন্দিরের বিমান। রেখ-দেউল

দ্রাবিড়-স্থাপত্যে মন্দিরচূড়া এভাবে নির্মিত হয় না। এই রেখ-দেউল পরিকল্পনা নাগর-স্থাপত্যে কলিঙ্গের অবদান। মজা হচ্ছে এই যে, স্থপতিবিদেরা কল্পনা করলেন গোটা 'রেখ-দেউল'টি পুরুষ জাতের। গোটা-দেউলটা যেন পুংলিঙ্গের প্রতীক। মন্দিরের তিনটি ভাগ : বাড়-গণ্ডি-মস্তক, যেন দণ্ডায়মান পুরুষ দেহের তিনটি অংশ : নিম্নাঙ্গ-উর্ধ্বাঙ্গ-মস্তক।

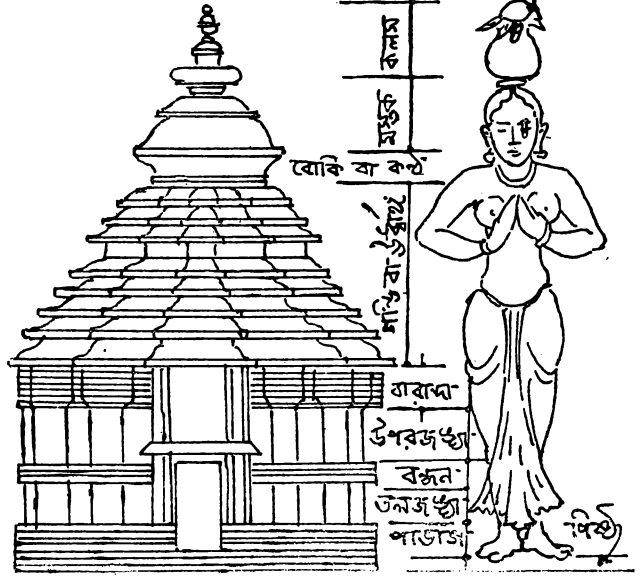
কন্য
থাপুরি
আমলক
বেকি
বিসম
দশমুখি
নবম "
অষ্টম "
সপ্তম "
ষষ্ঠ "
পঞ্চম "
চতুর্থ "
তৃতীয় "
দ্বিতীয় "
প্রথম ...
বারান্দা
উপরজঙ্ঘা
বন্ধন
তলজঙ্ঘা
পাডাঙ্গ
দ্বিতীয়

ভুবনেশ্বরে এখনও যে প্রাচীন দেউলগুলি দণ্ডায়মান আছে, তার ভিতর প্রাচীনতম হচ্ছে পাশাপাশি তিনটি মন্দির : ভরতেশ্বর, লক্ষ্মণেশ্বর ও শমুশ্রেশ্বর। পুরাতত্ত্ববিদেরা বলেন, ঐ তিনটি মন্দিরের গঠনকাল ৫৭৬ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ—অর্থাৎ শশাঙ্কের শাসন-কালের সামান্য কিছু পূর্ব। এ তিনটি মন্দিরই রেখ-দেউল, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মন্দির চূড়া ধাপে ধাপে পরস্পরের কাছে সরে আসবে—ভঙ্গিটা যেন বাঁশকে মাটিতে পুঁতে, তার আগায় দড়ি বেঁধে টেনে ধরা হয়েছে। এখানেই গণ্ডি অংশের সমাপ্তি। তার উপর যে অংশ তাকে বলে মস্তক। তাতে রাখা হয় একটি প্রকাণ্ড পাথর : আমলক-শিলা। আমলক ফলের মত খাঁজকাটা। এই আমলক-শিলাটিই মন্দিরের গণ্ডি অংশের ভারসাম্য রক্ষা করে। উপরে বসানো হয় থাপুরি, কলস, ধ্বজা। চিত্র : ১১-এ লিঙ্গরাজ মন্দিরের গর্ভগৃহের উপর নির্মিত সর্বোচ্চ রেখ-দেউলটির রেখাচিত্র দেখা যাচ্ছে। মন্দিরের বিভিন্ন অংশের কী নাম তাও উল্লিখিত হয়েছে।

রেখ-দেউল নাগর-স্থাপত্যের এক বৈশিষ্ট্য—উত্তর ভারতে বহু মন্দির এই শৈলীতে গঠিত। অপরপক্ষে দাক্ষিণাত্যের

প্রথম যুগে কলিঙ্গে যে মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল ভাঙে বিগ্ন হ'লেন সর্বদাই শিব। সুতরাং গর্ভ-মন্দিরস্থ শিবলিঙ্গের সঙ্গে রেখদেউলটি ছিল যেন এক ছন্দে গাঁথা।

মন্দির বিবর্তনের দ্বিতীয় খাপ হচ্ছে পরশুরামেশ্বর দেউল। মন্দিরের গর্ভগৃহে সবজাতির দর্শনার্থীকে প্রবেশ করতে দেওয়া যায় না। সুতরাং গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের দিকে একটি মণ্ডপ গড়ে তোলার প্রয়োজন হল। কলিঙ্গ-স্থপতিবিদ এই অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পেতে মন্দির সংলগ্ন একটি আয়ত ক্ষেত্রের মণ্ডপ নির্মাণ করলেন পরশুরামেশ্বরে কিস্তু এ পরিকল্পনায় কলিঙ্গ-স্থপতিবিদের স্বকীয়তার কোন স্বাক্ষর নেই। কারণ এই মণ্ডপ নির্মাণের কৌশলটি শেষ চালুক্য যুগের আহিওলে অবস্থিত কয়েকটি মন্দিরের অনুকরণ মাত্র।



চিত্র : ২০

লিঙ্গরাজ মন্দিরের জগমোহন। পীড় দেউল

কলিঙ্গ-স্থপতি অনুকরণে বিশ্বাসী নয়—প্রতিটি সমস্যা সমাধানে তার স্বকীয়তার স্বাক্ষর। তাই দেখছি, ঠিক পরবর্তী যুগেই কলিঙ্গ-বাস্তুকার নতুন জাতের মণ্ডপ নির্মাণে রত হয়েছেন। তিনি যেন ধ্যানের জগতে শুনতে পেলেন বৃহদারণ্যক উপনিষদের সেই মন্ত্র : ‘স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।’ স্বয়ং ব্রহ্মাই একাকী থেকে তৃপ্ত হতে পারেন নি, তিনি দ্বিতীয়া সত্ত্বায় বৃপাস্তরিত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ফলে রেখ-দেউল দ্বিতীয়া হতে চাইবে না কেন? শিম্পীর ধ্যানের দৃষ্টিতে বিমান-সংলগ্ন মণ্ডপটি হয়ে গেল স্ত্রী-জাতীয়া, পীড় দেউল (চিত্র : ২০)।

লক্ষ্য করে দেখুন, দুটি দেউলের বাড় অংশ মোটামুটি এক রকম। যেমন পদতল থেকে আ-জঙ্ঘা স্ত্রী-পুরুষ মূর্তিতে পার্থক্য সামান্য। দুটি ভিন্ন জাতের দেউলে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য দেখা গেল গণ্ডি (উর্ধ্বাঙ্গে) এবং মস্তক অংশে। আরও লক্ষণীয়—সম্মুখদৃশ্যে বা এলিভেশানে রেখ-দেউল যদি শিবলিঙ্গের প্রতীক। তাহলে পীড়-দেউল গণ্ডি অংশে ত্রিকোণাকৃতি একটি ‘ব-’ভূমি। ব্যাঞ্জনাটি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। তন্ত্বে ‘ব-’চিহ্নটির ব্যাঞ্জনা সকলেরই জানা।

রেখ ও পীড় দেউলে কলিঙ্গ-স্থপতিবিদ যে যথাক্রমে পুরুষ ও স্ত্রীমূর্তির পরিকল্পনা করেছিলেন তার প্রমাণ রয়ে গেছে প্রতিটি প্রত্যঙ্গের নামকরণে, পা-ভাগ, তলজঙ্ঘা (গোড়ালি থেকে হাঁটু), বন্ধন (হাঁটু) উপরজঙ্ঘা (জানু), বরগু (পেলভিক গার্ডল), গণ্ডি (উর্ধ্বাঙ্গ), বোঁকি (কঠ), মস্তক, খাপুরি (স্ক্যাল) প্রভৃতিতে।

পরবর্তী কয়েকশ বছর ধরে এই ছিল কলিঙ্গ-দেউলের পরিকল্পনা—বলা যেতে পারে ‘বৈতবাদ’ : মূলবিগ্রহের উপরে রেখ-দেউল এবং তদুৎসংলগ্ন মণ্ডপের উপরে পীড় দেউল। পাশ থেকে দেখলে মনে হয়—সামনে পিছনে দাঁড়িয়ে যেন নবদম্পতি যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিচ্ছে (চিত্র : ২১)।



চিত্র : ২১

রেখ-পাড় মিথস্ক্রিয়া

বর্ণক্ষেত্র। তিন দিক থেকেই তার 'এলিভেশান' একই রকম দেখতে। নব পরিকল্পিত দেবী মন্দিরের মূল-দেউলটির ভূমি-নকশা হল আয়তক্ষেত্র-বর্ণক্ষেত্র নয়। এবং প্রবেশ দ্বারাটি বসানো হল দীর্ঘতর দিকে। এই পরিকল্পনা প্রথম দেখা গেল বৈতাল দেউলে। পা-ভাগে বিশেষ কিছু পরিবর্তন করা হল না বটে, কিন্তু বাড়-অংশে তল-জল্লা, বন্ধন, উপর-জল্লায় ছন্দটি বদলে গেল। সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন করা হল মস্তক অংশে। সেটি দেখতে হল একের উপর আর একটি উবুড় করা নৌকার মত। এই নৌকা প্রতীকী বলেই এ মন্দিরের নাম কাথর দেউল।

শব্দটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জিজ্ঞাসা করেছিলেন আচার্য সুনীতিকুমারকে। তিনি বলেছিলেন, ওড়িয়া ভাষায় নৌকাকে বলা হয় : 'বৈঠা কথারু'। ঐ কথারু শব্দটি থেকেই এসেছে 'কাথর' শব্দটি (চিত্র : ২২)। নৌকা তার গর্ভে যাত্রীদের ধারণ করে, তার পরিকল্পনা স্ত্রী-লিঙ্গের।

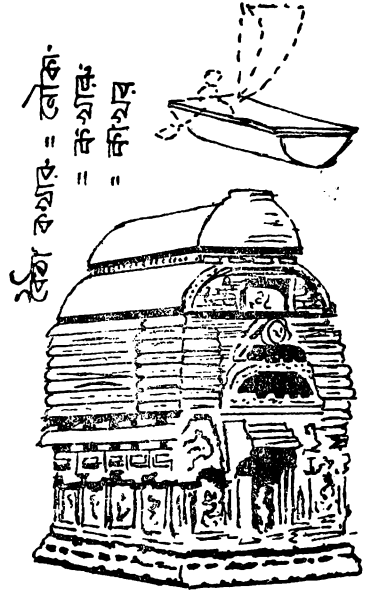
অনধিকারী হিসাবে আমার বোখহর স্বীকার করে যাওয়া শোভন হবে যে, কাথর দেউলের এই বিবর্তন এবং তার নামরূপের পরিচয়—যা এখানে বিবৃত করেছি তার অনুমোদন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের গবেষণায় দেখিনি। এটি আমার স্বকীয় চিন্তামাত্র। পুরাতত্ত্ব বিভাগ শুধু এটা লক্ষ্য করেছেন যে, কাথর দেউল

অর্থাৎ শাস্ত্রীয় নির্দেশ : 'মিথুনে পদবল্লভিঃ প্রমথৈশ্চোপ-শোভয়েৎ' কলিঙ্গ-স্থপতিবিদ পালন করলেন গোটা দেউল পরিকল্পনা-তেই—শুধুমাত্র যুগলমূর্তি উৎকীর্ণ করে নয়।

বেশ চলে যেত, কিন্তু গোল বাধল শিবের বদলে যখন শক্তি হলেন মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। স্থপতিবিদ এক মহা-সমস্যায় পড়লেন। শক্তি বিগ্রহের উপর পুরুষ প্রতীকী রেখ দেউল নির্মাণ করার বুঝি তাঁর বুচিতে বাধল—অথচ দেবীমূর্তির উপর গর্ভমন্দিরের চূড়াটি পাড় দেউল করতেও সঙ্কেচ জাগে। সেটা যেন দেবীর প্রতি অপমান। কারণ এষাৎকাল পাড়-দেউল গর্ভমন্দিরের উপর মূলমন্দিরের অঙ্গরূপে গঠিত হয়নি, হয়েছে মণ্ডপ বা জগমোহন নির্মাণের কাজে। কলিঙ্গ বাস্তুকার তাই এক্ষেত্রে আর একটি নূতন জাতের দেউল পরিকল্পনা করলেন—যা স্ত্রী জাতীয়া, কিন্তু পাড় দেউল নয়।

বেশ কিছু পরিবর্তন

করা হল। রেখ দেউল এবং পাড় দেউল ভূমি নকশায় (প্লানে) ছিল



কাথর দেউল - অধঃস্ফীতি

চিত্র : ২২

কাথর-দেউল, কলিঙ্গ

শুধুমাত্র শক্তি মন্দিরের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়েছে এবং সেটিকে নিত্যান্ত কাকতালীয় বলে উপেক্ষা করা চলে না। শ্রীমতী দেবলা মিত্র লিখছেন, “There are only five ‘Kakhara deul’ at Bhubaneswar all of which are dedicated to Sakti worship, a fact difficult to explain away as a mere coincidence.” ২৮ ॥

এতকথা বলছি, শুধু বোঝাতে যে, ‘মিথুন’ বা যুগলমূর্তির ধারণাটা কলিক্তে শুধু ভাস্কর্যেই নয়, মন্দির স্থাপত্যেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়েছিল। আদিরস শুধু ভাস্কর নয়, স্থপতিবিদের অন্তরেও অনুরণন জাগিয়েছিল—তাই রেখ-দেউল ও পীড় দেউলের এই বৈত পরিকল্পনা।

ঐ বৈতরূপ নানাকারণে ক্রমশঃ ব্যাহত হল। ভোগ দেবার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ল একটি পৃথক দেউলের—ভোগ মণ্ডপ। অনুরূপ ভাবে দেবনাসী প্রথা প্রসার লাভ করার পর নৃত্যগীতের প্রয়োজনে দরকার হল নাট-মন্দিরের। অনন্ত বাসুদেব উপনীত হয়ে তাই পেলাম একই কেন্দ্রীয় অক্ষরেখার চারটি দেউল : বিমান, জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ।

যেন প্রাণতীর্থেগর বৈতদেউলের সংসার বৃদ্ধি হল।

নয়

॥ উত্তেজিত মিথুন ॥

দ্বিতীয় জাতের মিথুন, আমাদের শ্রেণী বিভাগ অনুসারে 'উত্তেজিত মিথুন।' যাদের সংজ্ঞার্থ: 'আহিঙ্গনবদ্ধ, চুষনরত, অথবা প্রাকৃমিলন কোলরত মিথুন, যাদের নিম্ন-যৌনান্দ্র অপ্রকট।'।

ভারতীয় ভাস্কর্যে যুগলমূর্তিকে ব্যাপকভাবে উত্তেজিত হতে দেখাছি আহিঙলের কয়েকটি মন্দিরে। প্রাথমিক পর্যায়ে যে উত্তেজিত মিথুনের পরিকল্পনা করা হয়নি এমন কথা বলব না। বোধকরি প্রাচীনতম ভারতীয় মিথুন মূর্তিটি লাক্ষ্মী সংগ্রহশালায় রক্ষিত, জৈন স্তম্ভ উৎকীর্ণ একটি 'উত্তেজিত মিথুন।' সেটি আনুমানিক দ্বিতীয় খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নির্মিত। তার একটি আলোকচিত্র দৈর্ঘ্যমাসিক 'বৃষম' পত্রিকায় (এপ্রিল জুলাই ১৯২৫, পৃ ৫৪) প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আদিমযুগের মিথুনগুলি, আগেই বলেছি—যুগলমূর্তি।



চিত্র : ২৩

দুর্গামন্দির, আহিঙল



চিত্র : ২৪

দুর্গামন্দির, আহিঙল

তারপর গুপ্তযুগের প্রথমপাদে, শেষ চলুকা শৈলীতে নির্মিত-আহিঙের দুর্গামন্দিরে ও লাদখান্ মন্দিরে তাদের প্রথম উত্তেজিত হতে দেখাছি। আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি। অপ্রগল্ভ দম্পতির মধ্যে এতদিনে যেন কিছু চাপল্য দেখা

দিয়েছে। ওরা যেন আর বৈধ রাখতে পারছে না। তবু তাদের প্রমত্ততা কোথাও শালীনতার সীমা অতিক্রম করেনি। ইঙ্গিত আছে, কিন্তু তাদের নিয়মবোদ্ধা মোটামুটি ভাবে গোপন। লক্ষ্য করে দেখুন, চিত্র—২০-এর মিথুনটিকে। এই উত্তেজিত মিথুনটি আহিওলের দুর্গামন্দির থেকে সংকলিত। ইতিপূর্বে কালের দম্পতির (চিত্র—১৬) মধ্যে দেখেছিলাম রমণীমূর্তি সম্পূর্ণ অপ্রগল্ভ। তার সঙ্গী আলোভাবে ডান হাতখানি রেখেছিল নর্মসহচরীর বামহস্তে। এবার তা নয়; পুরুষ মূর্তি তার সঙ্গিনীর চিবুকটি তুলে ধরেছে, নারীমূর্তিটিও আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে ডান হাত দিয়ে সঙ্গীকে কাছে টানছে। দু'জনের মুখেই আদিরসের আলিঙ্গন, যদিও মহাকালের স্থূল হস্তাবলোপে তা বহুলাংশেই অবলুপ্ত।



চিত্র : ২৫

রুক্মেশ্বর, ভুবনেশ্বর



চিত্র : ২৬

রুক্মেশ্বর, ভুবনেশ্বর

কিন্তু দেখুন, একই মন্দিরে আর একটি দম্পতিকে (চিত্র—২৩)। এক্ষেত্রেও শুধু পুরুষ নয়, নারীকাও যথেষ্ট উত্তেজিত। বাম হস্তে সে সঙ্গীকে কাছে টানছে, ডান হাত দিয়ে সে নর্মসহচরের বস্ত্রপ্রান্ত আকর্ষণ করেছে। অর্থাৎ শেষ কথা শিংশী প্রকৃত ইঙ্গিতের মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন, রেখে ঢেকে। পুরুষমূর্তির বামহস্তও যুগ্মকলস সন্ধানে বিতস্ত, যদিও তা সেই স্বরঙ্গ স্পর্শ করেনি। বেশ বোঝা যায়, ওরা উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। না হবেই বা কেন? সেই ভারহুত যুগ থেকে চার পাঁচ শ' বছর ওরা যে পাশাপাশি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। এতদিনে যদি ওদের মধ্যে কিছু চাপল্য থাকে, পরস্পরকে ওরা যদি কাছে টানতে চায়, তাহলে দোষ দিই কোন আক্ষেপে ?

কী বললেন—‘পাষণের আবার প্রাণ আছে নাকি?’—বেশ, না হর নাই থাকল, এটা তো মানবেন—শিম্পীরা তা আছে? ধরে নিন না কেন, এই চার পাঁচ শ’ বছর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার পর ভাস্করই এতদিনে উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।

এই প্রসঙ্গে আরও বলি, যদিও আমি বিভিন্ন প্রকারের মিথুনকে পাঁচটি শ্রেণীভুক্ত করবার চেষ্টা করেছি, তবু একই শ্রেণীভুক্ত মিথুনের মধ্যেও উত্তেজনা তথা যৌনতার তারতম্য হতে পারে। এমনকি কোনও মিথুনকে এ-দলেও ফেলা যায়, আবার ও দলেও ফেলা যায়। বহুত মনে হয়, আমি নিজেই যদি পুনরায় ঐ পরিসংখ্যান গ্রহণ করতে কলিঙ্গ-খজুরাহো যাই, তাহলে ভিন্ন প্রকারের ফলাফল পাব। কারণ প্রথমবার যে মিথুনকে মনে হয়েছিল ‘উত্তেজিত’-পর্ধারভুক্ত, এবার হয়তো তাকে মনে হবে ‘শৃঙ্গাররত’।



চিত্র : ২৭

লিঙ্গরাজ-বিমান

থাক, তার আভঙ্গ-ঠামে এবং চুমন তিয়াসী ভাঁঙ্গমায় সে ধরা পড়ে গেছে। চতুর্থ উদাহরণে (চিত্র—২৮) কোনাক্ষ জগমোহনের নায়িকা রীতিমতো রত্নাতুরা। ভারতচন্দ্রের ভাষায় ‘লাজের মাথায় হানিয়া বাজ’ মেয়েটি সবলে আকর্ষণ করেছে নায়ককে। দয়িতের ওষ্ঠাধর অমোঘ আকর্ষণে টেনে নামিয়ে আনতে চাইছে নিজ বিশ্বাসের দিকে।

এই চারটি উদাহরণে নায়িকার দিক থেকে উত্তেজনায় যথেষ্ট তারতম্য হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী চার-জোড়া মিথুনই একই পর্ধারভুক্ত—যেহেতু ওদের নিম্ন-যৌনাত্মক অপ্রকট, ওরা মৈথুনরত নয়, এবং যুগলমূর্তির মতো উত্তেজনা বিরহিতও নয়, তাই ওরা সকলেই ‘উত্তেজিত মিথুন’।

তৃতীয় উদাহরণে (চিত্র—২৭) নায়িকার মধ্যদেশের হেলনের মাধ্যমেই শিম্পী তার বক্তব্য পেশ করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন, “গ্রিভঙ্গ-ঠামে রচিত দেবীমূর্তির মস্তক মূর্তির দক্ষিণে (শিম্পীর বামে) ও দেবমূর্তিগুলির মস্তক নিম্নে

ব্যাপারটা বোঝাতে এখানে পর পর চারটি স্কেচ পেশ করছি। দুটি আমার অ’কা, দুটি গ্রীইন্স দুগারের—বিনি আমার সঙ্গে মিথুনবাদ যাচাই করতে কলিঙ্গ পরিক্রমা করেছিলেন। প্রথম উদাহরণে (চিত্র—২৫) ব্রহ্মেশ্বরের নায়িকার শুধু হাতখানি ধরা হয়েছে, তাতেই সে লজ্জাবনতা। হাতখানি রেখেছে চিবুক, কিন্তু স্মিত-আসো সে সম্মতি জানাচ্ছে। দ্বিতীয় উদাহরণে (চিত্র—২৬) দেখছি নায়িকা সরাসরি তার প্রেমাস্পদের দিকে তাকাতে পারেনি। ভাবখানাঃ নহি নহি বোলবি মোড়ানিবি গীম’; যদিও এবার দেখছি, মেয়েটি তার ডাল হাতখানি রেখেছে দয়িতের স্কন্ধে। স্বীকার করতেই হবে, প্রথম উদাহরণের তুলনায় দ্বিতীয়া একটু বেশী উত্তেজিতা—বিকচ উরসার মধ্যমাসের বাক্স-ঠামে তার সম্মতি আরও প্রকট। তৃতীয় উদাহরণটি ইন্দ্রবাবু এ’কেছিলেন লিঙ্গরাজ-বিমানের উপরজন্মা থেকে (চিত্র—২৭)। এবার নায়িকা সরাসরি তার প্রেমাস্পদের দিকে ফিরেছে। বিকচ-কলাপ ময়ূরের মতো দুটি হাত সে লীলায়িত ভাঁঙ্গমায় মাথার উপরে তুলেছে। দয়িতকে সে স্পর্শ করে নেই—না

বামে (শিম্পীর দক্ষিণে) হেলাইয়া গঠন করা বিধের, বাহাতে স্ত্রী ও পুরুষ দুটি দ্বিভঙ্গ-মূর্তি পাশাপাশি রাখিলে বোধ হইবে যেন মৃণালদণ্ডের উপরে প্রফুল্ল পদ্মের মতো উভয়ের মুখ উভয়ের দিকে মুকিয়া পড়িতেছে। ইহাই হইল যুগলমূর্তির বা দেবদম্পতির গঠনরীতি। মূর্তিতে অভিমান খেদ ইত্যাদি ভাব দেখাইতে হইলে পুরুষে নারী-দ্বিভঙ্গ এবং নারীতে পুরুষ-দ্বিভঙ্গ রচনা করিতে হইবে, অর্থাৎ উভয়ে উভয়ের বিপরীত মুখে হেলিয়া রহিবে।” ২৯ ॥

নির্দেশের প্রথমার্শের উদাহরণ পরশুরামেশ্বরের হর-পার্বতী মূর্তি (চিত্র—২৯)। অথবা খাজুরাহোর শিবদুর্গা (চিত্র—৩০)। দ্বিতীয়ার্শের নির্দেশের একটি অনবদ্য উদাহরণ দেখতে পাবেন এলিফাণ্টার “গঙ্গাবতরণ দৃশ্যে।” প্রসঙ্গত বলি, জীমার-এর কালজয়ী গ্রন্থ “The Art of Indian Asia”তে তার একটি আলোকচিত্র দিলে লেখক বলেছেন, এটি শিব পার্বতীর বিবাহ দৃশ্য। ৩০ ॥ আমার মনে হয় সে নির্দেশ ভ্রান্ত। এটি গঙ্গাবতরণ দৃশ্য। শিব ও পার্বতী উভয়েই দণ্ডায়মান। শিবের জটায় তিনটি নারী-মূর্তির মুখ—‘সরস্বতী-গঙ্গা-যমুনা।’ সম্মুখে ভগীরথ। লক্ষ্য করে দেখুন, যে হেতু মহাদেব পার্বতীর সপরিজদের মন্তকে ধারণ করেছেন তাই পার্বতীর মধ্যদেশ মহাদেবের বিপরীত দিকে হেলানো। অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা অনুসারে শাস্ত্রমতে পার্বতীমূর্তিতে অভিমান বা খেদ প্রদর্শিত। শিবের মধ্যদেশও বিপরীত দিকে বেকেছে—অর্থাৎ শিবও চটেছেন পার্বতীর উপর, যেন বলতে চান—‘এ তোমার আধিক্যতা।’ শুধুমাত্র ঠামের পরিবর্তনে ভারতীয় ভাস্কর যে এতকথা বলতে পারেন এটুকু বোঝাতেই এতকথার অবতারণা।

এতক্ষণ আমরা মনুষ্য-মিথুন নিয়ে আলোচনা করছিলাম, এবার দেব-মিথুনের প্রসঙ্গে আসা যাক।

পূর্বভারতে—বাঙলায়, বিহারে এবং উড়িষ্যায় দেবদেবী একত্রে উপস্থিত হলে তাঁরা প্রায় আবশ্যিকভাবে যুগলমূর্তি, শুধুমাত্র হরপার্বতীর ক্ষেত্রে কখনও কখনও তাঁরা উত্তোজিত মিথুন। রাধাকৃষ্ণ, বিকটলক্ষ্মী, রাম-সীতা প্রভৃতি প্রায় অনিবার্যভাবে অপ্রগল্ভ। শুধু মাত্র পার্বতী বা দুর্গাকে ধৈর্য বায় মহাদেবের বামজানুর উপর উপবিষ্ট। পার্বতী সচরাচর দক্ষিণহস্তে শিবকে আলিঙ্গন করেন, এবং শিবের বামহস্ত



চিত্র—২৮

কোনার্ক জগমোহন

জননীমূর্তির দেহ বেষ্ঠন করে প্রায়শই তাঁর বামস্তন স্পর্শ করে (চিত্র—৩০ এবং ৩১)। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ করে বেলুর, হালেবিড, এলোরায় এই পরিকল্পনা শুধু হরপার্বতী নয়, বিষ্ণুলক্ষ্মী, রাধাকৃষ্ণ মূর্তিতেও লক্ষ্য করেছি। অথচ পূর্বখণ্ডে একমাত্র হরপার্বতীকেই উত্তেজিত মিথুনরূপে দেখতে পাই।



চিত্র : ২৯ হরপার্বতী পরশুরামেশ্বর ভবনেশ্বর



চিত্র : ৩০ হরপার্বতী পার্শ্বনাথ, থাঙ্গুরাহো

দেব মিথুনে যৌনঙ্গ উৎকর্ষ করা হবে কি হবে না, মনে হয় এ বিষয়ে ভারতীয় ভাস্করের সঙ্কেচ সহস্রকেও দূরীভূত হয়নি। ভাস্কর কিছুতেই মনস্কুর করে উঠতে পারেননি। রামসীতা, বিষ্ণুলক্ষ্মী, ব্রহ্মা-ব্রহ্মানী, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি মিথুনে যৌনঙ্গ প্রদর্শন করা হবে না, এটা সর্বযুগে সর্বত্র মেনে নেওয়া হয়েছে। গোল বাধল শুধুমাত্র 'হরপার্বতী'র ক্ষেত্রে। গৌরীপটু বেষ্টিত শিবলিঙ্গের প্রতীক-বাজনার মধ্যেই পুরুষ প্রকৃতির মিলনের মৌল তত্ত্বটি বিধৃত। সে ক্ষেত্রে হরপার্বতীর মূর্তিতে সেই আদিম সত্যটা স্বীকার করা হবে না কেন? এটাই একদল ভাস্করের প্রশ্ন। অপর দল যেন বলতে চান—গৌরীপটু বিধৃত শিবলিঙ্গের প্রতীক বাজনা য় বা রুচিসম্মত, গোভব—মনুয্যাকারে দেবমূর্তি উৎকর্ষ করার সময় সেটাই অশালীন। এই যে দুটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি—এটা উমা-মহেশ্বর মূর্তি পরিকল্পনায় যুগে যুগে ভাস্করকে বিভলিত করেছে। কোন অঞ্চলে এ পক্ষ, কোনও অঞ্চলে ও পক্ষ প্রাধান্যলাভ করেছেন। যেমন দেখুন, কলিঙ্গ-ভাস্করের আদিযুগে নির্মিত প্রথম বৈত-দেউল পরশুরামেশ্বরে শিল্পী উমা মহেশ্বর মূর্তিতে শিবের লিঙ্গটি খোদাই করেছেন (চিত্র-২৯); কিন্তু তার পরবর্তী যুগে ব্রহ্মেশ্বর, লিঙ্গরাজে, অনন্তবাসুদেবে এ পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। থাঙ্গুরাহোতেও এই বিধিনিষেধটি মেনে চলা হয়েছে (চিত্র-৩০)। মনুষ্য মিথুনে অসংখ্য মূর্তিতে পুংলিঙ্গ খোদাই করা হলেও সেখানে দেবমূর্তিতে তা করা হয়নি, এমন কি শিবের ক্ষেত্রেও নয়।

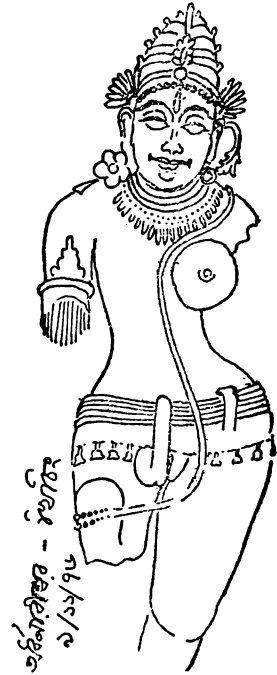
কিন্তু খিচিং শিল্পী এ বিষয়ে দূরন্ত দুঃসাহসিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। খিচিং-এর ভৌগোলিক অবস্থান উড়িষ্যা, ভারত শিল্প-রীতি কলিঙ্গ-গৈলীরই অনুসারী; কিন্তু বহু বিষয়ে খিচিং-শিল্পী কলিঙ্গ রীতিকে অগ্রীকার করে স্বকীয়তার

স্বাক্ষর রেখেছেন—দেবমূর্তিতে লিঙ্গ উৎকীর্ণ করাও তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এখানে প্রায় প্রত্যেকটি একক হরের মূর্তিতে পুংলিঙ্গটি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এমনটি উমা-মহেশ্বরের প্রায় প্রতিটি মিম্বদন মূর্তিতেও। খিচিং সংগ্রহশালার প্রবেশ পথে ডানদিকের ঘরের পর পর চারটি বিশালায়তন হরপার্বতী মূর্তি আছে—উত্তোজিত মিম্বদন—প্রতিটি ক্ষেত্রেই মনুষ্যবৃণী শিবের সমুখিত লিঙ্গটি প্রকটভাবে দৃশ্যমান (চিত্র—৩১)।

অপরপক্ষে উমার ক্ষেত্রে শুধু কলিঙ্গ নয়, কোনও প্রাদেশিক শিল্পীই সেটা বুঁচসম্মত মনে করেননি। অর্থাৎ হরপার্বতী মিম্বদনে কোথাও কোথাও শুধু হরের সমুখিত লিঙ্গটি উৎকীর্ণ করার অনুমতি পাওয়া গেল, কিন্তু শাস্তির নয়। খিচিং শিল্পী



চিত্র : ৩১ হরপার্বতী খিচিং



চিত্র : ৩২ অর্ধনারীশ্বর খিচিং

কিন্তু একটি ক্ষেত্রে এ বিষয়েও দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছেন। ঐ সংগ্রহশালাতেই সংরক্ষিত একটি ‘অর্ধনারীশ্বর’ মূর্তিতে (চিত্র—৩২)। এখানে পুরুষ ও প্রকৃতি ভিন্ন সত্তা নয়—একই দেহে দুই সত্তা লীন হয়ে গেছেন। উমা আর এখানে উমা নয়, মহেশ্বরের অঙ্গীভূতা। হয়তো সেই অনুভাবনা থেকেই শিল্পী এখানে পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গের যে অর্ধেক যে দেহে অবাস্তিত ছিল, তার আধখানা করে উৎকীর্ণ করেছেন। খিচিং-এর এই ব্যতিক্রম উদাহরণটি বাদ দিলে অন্য কোনও ভারতীয় দেবী মূর্তিতে নিম্নোক্ত উৎকীর্ণ করার নজির আবার মজুরে পড়েনি।

॥ শৃঙ্গাররত মিথুন ॥

শৃঙ্গাররত মিথুন, অর্থাৎ “ষষ্ঠিতর প্রাক্‌সঙ্গম শৃঙ্গারে আসক্ত—যখন শিম্পী তাদের মূল নিম্ন-বোঁদাজ আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে প্রকট করেছেন।”

মনে হয়, ‘মিথুনবদ’ শৈম্পিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সার্থকতার ভূঙ্গশীর্ষে উঠেছিল দ্বিতীয় পর্যায় থেকে তৃতীয় পর্যায়ের সৎকাম মুহূর্তে অর্থাৎ ‘উত্তেজিত মিথুন’ যখন ‘শৃঙ্গাররত মিথুন’ পর্যায়ের বিবিধ প্রহর গুণছে। লক্ষণীয় সময়টা হচ্ছে



চিত্র : ৩৩ .আহিওল, লাদখান মন্দির
শেষ চালুকা-শৈলী ৩১ ॥

গুপ্তসাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ। হয়তো সেটাই কারণ। সে সময়ে ‘রোমান্টিসিজম’-এর বন্যায় বাঁধভাঙ্গা জলোচ্ছ্বাসের মতো উত্তাল হয়ে উঠেছিল ভারতীয় শিম্প-সাহিত্য-চিত্র-ভাস্কর্য-নাট্যকলা—বহুত বা বতী ল লি ত ক ল। ভাস্কর্যেরও দেখছি তার প্রতিফলন। ভবভূতি কালিদাসের কালজয়ী কাব্যে, শূঙ্গের নাটকে খুলে গেল এতদিনের অবরুদ্ধ দ্বার। নরনারীর মিলন বর্ণনা হল আরও স্পষ্ট, আরও প্রাঞ্জল। স্কেচ করল না কবির দল। বা এতদিন ছিল রাখা-ঢাকা এবার তাই হল কাব্যের উপজীব্য। তার অনিবার্য প্রভাব পড়ল ভাস্কর্যে। মন্দির ভাস্কর্যে। তবু যে হেতু দেব-দেউলের মিথুন মূর্তি হচ্ছে দৃশ্য-কাব্য তাই প্রথম-যুগেই ভাস্কর অতটা স্পষ্টবাদী হতে পারল না। যেন সরমে বাধল, স্কেচে থেমে গেল। সমাজ তখনও এজন্য প্রস্তুত নয়, দর্শক তখনও তৈরী হয়নি। সম্পূর্ণ ধরা দেওয়ার পূর্ব-মুহূর্তটিতে যেন দ্বিধাজড়িতচরণ নায়িকার অবস্থা। কালিদাসের কলম যখন অস্কেচে বলতে পারছে ‘বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুম্ সমর্থঃ?’ তখন ছেনি-হাতুড়ি হাতে মন্দির-ভাস্কর ভাবছেন : দৃশ্যকাব্যে অতটা দেখানো কি শোভন?

নিশ্চয়ই তা ভেবেছিলেন, এ আমার কবি-কল্পনা নয়—ভারতীয় ভাস্করের সহস্রাব্দীর শিম্পীজীবনে ঐরকম দ্বিধাভ্রান্তজড়িত পর্যায় বারে বারে এসেছিল; যদিও আজকের দিনের দর্শক সেটা সহজে অনুভব করেনা। করেনা এজন্য যে, সহস্রাব্দী-কালের শিম্প সম্পদকে আমরা পাশাপাশি দেখতে থাকি—তাদের কালীক দূরত্বটা পরিমাপ করতে পারিনা। অজস্র দশ

নম্বর গুহা থেকে সতের নম্বরের গুহার দূরত্ব আজকের দর্শকের কাছে আশী মিটার—বাস্তবে সে দূরত্ব আট-শতাব্দীর। ‘মিথুনবদে’ বোঁদা যদি বিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে না আসত তা-হলে আমরা প্রথম যুগ থেকেই ‘মৈথুনরত মিথুন’ এবং ‘মৌখ বোঁদাচার’ দৃশ্য ভারতীয় মন্দিরে দেখতে পেতাম। ডক্টর মুলকরাজ আনন্দ প্রমুখ ভারতবিদেরা সবজাতের মিথুনকে একই শ্রেণীতে ফেলে—ভারত, বুদ্ধগয়া, সাঁচী, কোনার্ক এবং খাজুরাহোর মিথুনের প্রসঙ্গ একই অনুচ্ছেদে বর্ণনা করে আমাদের এই সত্যটা এতদিন প্রাণধান করতে দেননি। বরং বিভ্রান্ত করেছেন।

যে কথা বলছিলাম। শিম্পীর সেই বিধাঘ্নের ভাবটিই যেন অনুরণিত হয়েছে গুপ্তবৃগের এই প্রথম পর্যায়ের মিথুনগুলিতে (চিত্র : ৩০)। শেষ চালুকা বৃগের গুপ্ত প্রভাবিত আহিওল-এ লাদখান-মন্দিরের এই মন্দিরে যেখানে প্যাজি নায়ক তার প্রেমাস্পদার কটিদেশে বস্ত্রখণ্ড-গ্রন্থিটি মোচন করে দিতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু সলজ্জা নায়িকা আড়ম্বল্য বামহস্তে বস্ত্রপ্রাপ্ত ধরে রেখেছে। আরও দেখছি, নায়ক তার ডান হাতে চেপে ধরেছে মেরেটির দক্ষিণ মণিবন্ধ—অর্থাৎ বাধাদানে বাধা দিয়েছে। নায়িকার চিত্তস্তম্ভ ঠাম, তার দক্ষিণহস্তের আড়ম্বল্য ভক্তিম্বা এবং সর্বোপরি সন্মতিসূচক আপস্মিত্যে লাজনম্বা বস্ত্রাঙ্কুরাঙ্কুরিচিত্রিত বৈভাবটি অনবদ্যভাবে রূপায়িত করেছে। এই অপরূপ শিম্পিসন্মতিটি শব্দই আমাদের স্মরণে এনে দেয় সন্মতিজন কালিদাসের বর্ণনায় মেঘদূতের সেই নায়িকাকে : ৩২ ॥

নীবীবন্ধোচ্ছসিতশিখিলং যত্র বিষাধরাণাং ।

কৌমং রাগাদনিভৃতকরেষাক্ষিপংসু প্রিয়েষু ॥

অঁচ্ছস্তুঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রক্ত প্রদীপান ।

হ্রীমৃঢ়ানাং ভবতি বিফল-প্রেরণা চূর্ণমুক্তি ॥

অর্থাৎ “বিষাধরা নায়িকা যখন দেখল যে, নায়ক তার কটি দেশের বস্ত্রগ্রন্থী উন্মোচনে সফলকাম হয়েছে, তখন অন্ধকারে আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে সে রক্তপ্রদীপের দিকে ছুঁড়ে মারল কিছু প্রসাধন চূর্ণ; কিন্তু বেচারী সফলকাম হল না। হবে কিমন করে? তার সন্মতি সেই অন্ধকারেও ভাস্বর হয়ে উঠল যে।”

আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী লাদখান-মন্দিরের এই মিথুন মূর্তিটি তৃতীয় পর্যায়ের, কারণ শিম্পী নায়িকার গোপনাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে অপ্রকট রাখেননি—“বিফলপ্রেরণা” শব্দটি তাঁর কণ্ঠকুহরে অনুরণিত হচ্ছিল বলেই নাকি? এর সঙ্গে তুলনা করুন পূর্বদৃষ্ট ভুবনেশ্বরের সেই ব্রহ্মেশ্বরবাসিনী নায়িকাশ্বরকে (চিত্র : ২৪ এবং ২৫)। পরিকল্পনা অভিন্ন। মেঘদূতের বন্ধ-বন্ধপ্রসার পরিবর্তে সেবার যেন দেখেছিলাম উমা-মহেশ্বরের শৃঙ্গার। নরলোক থেকে দেবলোকে উন্নীত হয়ে রসের বিকৃতি ঘটেনি, কিন্তু রুচীর পরিবর্তন ঘটেছে। সেই আদিরস; যদিও শালীনতাবোধেই যেন জগজ্জননীর গোপনীয়তার হস্তক্ষেপে শিম্পী বিধাজড়িত—যেন সপ্তমসর্গের ‘অসমাপ্ত গানে’ শেষ হয়েছে সেই শিম্পি প্রশাস :

“নাভিদেশনিহিতঃ সঙ্কল্পয়া শঙ্করস্য বুরুধে তয়া করঃ ।

তদ্বৎকূলমথ চাভবৎ স্বয়ং দ্রুমমুচ্ছসিত নীবিবন্ধনম্ ॥ ৩০ ॥

“শঙ্কর যখন কটিদেশের বন্ধনগ্রন্থী উন্মোচন-মানসে

উমার নাভিদেশে কর সঞ্চালনে প্রবৃত্ত হন, তখন পার্বতীর সর্বদেহে শিহরণ জাগে; তিনি যখন দিতে যান তখন তার পূর্বেই হৃদয়ের অত্যাঙ্কাস নিবন্ধন দেহকম্পনে তাঁর নীবিবন্ধ আপনাই খুলে যায়।”



চিত্র : ৩৪

কারণ বাই হোক, যে-হেতু সে-ক্ষেত্রে নায়িকার নিম্নযোনাঙ্গ অপ্রকট ছিল তাই সেই দুটি মিথুনকে আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত করেছিলাম।

আর একটা কথা। পরিসংখ্যান তালিকা থেকে মনে হতে পারে যে, ‘শৃঙ্গাররত মিথুন’ কলিঙ্গ এসেছিল ‘মৈথুনরত মিথুন’-এর পরবর্তীকালে, কারণ প্রথমোক্তকে আমরা পেয়েছি রাজারানী, গৌরী ও ব্রহ্মেশ্বর—একাদশ শতাব্দীতে; অথচ ‘মৈথুনরত-মিথুন’ খোদিত হয়েছে বৈতাল দেউলে ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি। অনুসিদ্ধান্তটি ঠিক নয়। আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী ‘শৃঙ্গাররত মিথুন’ তাকেই বলছি, যখন পাদপাদ্যীর যৌন-সংযোগ ঘটেনি, অথচ তাদের নিম্ন-যোনাঙ্গ অপ্রকট নয়। সে হিসাবে সপ্তম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ যক্ষ-মিথুনটিকেই (চিত্র : ১৬) বা ‘শৃঙ্গাররত-মিথুন’ বলা যাবে না কেন? ওদেরও তো যৌন-সংযোগ ঘটেনি এবং যক্ষের জননেন্দ্রিয় সুস্পষ্টরূপে পরিদৃশ্যমান। মিথুন ভিন্ন একক মূর্তিতে যোনাঙ্গ চিহ্নিত করার রীতি যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত এ সত্যটা কে অস্বীকার করবে? খ্রীষ্টপূর্ব যুগ থেকেই কয়েকটি নিদর্শন আমরা দেখেছি (চিত্র—৭, ৮, ৯ প্রভৃতি)। অবশ্য এগুলি কলিঙ্গের ভাস্কর্য নিদর্শন নয়। কলিঙ্গে বৈতাল-দেউলে লাকুলীশ মূর্তিতে এবং পরশুরামেশ্বরের দেবমিথুনে, শিবমূর্তিতে, পুং-জননেন্দ্রিয় সুস্পষ্টভাবে উৎকীর্ণ করা হয়েছে।



চিত্র : ৩৫

শুধু ভারতবর্ষ নয়, প্রতীচ্যের শিল্পেও এ রীতি স্বীকৃত। গ্রীক যুগ থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত শিল্পে নগ্ন নারী এবং নগ্ন পুরুষ মূর্তিতে জননেন্দ্রিয়গুলি অকুণ্ঠভাবে রূপায়িত করা হয়েছে। তবে প্রতীচ্যের সেই শিল্পচৈতন্য, ‘নৃত্ত-বাদ’ একটি পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করা উচিত। আপাতত আমরা ভারতীয় শিল্পে শৃঙ্গাররত মিথুনের আলোচনা করছি। তাই এই প্রসঙ্গে বলে রাখি—দিগম্বর জৈন এবং শৈব প্রভাবিত মূর্তি—শিব, লাকুলীশ প্রভৃতি ব্যতিরেকে অন্যান্য দেব দেবীর মূর্তিতে ভারতীয় ভাস্কর্য কিন্তু জননেন্দ্রিয়ের প্রকাশ ‘টানু’ হিসাবে এড়িয়ে গেছেন।

চিত্র : ৩৪-এর উল্লেখিত মিথুনটি আছে কোনার্ক জগমোহনের রাঢ় অঞ্চলে। এখানে যৌনতার কোন অনুবেদন নেই। নায়িকার মধ্যে শিল্পী একটি অপূর্ব দ্বৈতভাব ফুটিয়ে তুলেছেন : মনে হয়, সে অন্যমনা, যেন অতীতের কোন্ বিস্মৃতপ্রায় নায়কের কথা সে মনে মনে ভাবছে। যদিও বর্তমানকে সে অস্বীকার করেনি। দক্ষিণ হস্তের আলিঙ্গনে বর্তমানকে সে নিবিড় করে পেতে চায়; অথচ বামহস্তের করলগ্নকপোলমুহূর্নায় মনে হয়, সে মনে মনে হারিয়ে গেছে কোন অতীত যুগে। যেন তার

কৈশোরকালের প্রথম প্রেমের এক বিস্মৃতপ্রায় অভিজ্ঞতার অন্তর্লীন অনুরণনে সে মগ্নচৈতন্য। শাস্ত্র নারী-হৃদয়ের এক দুঃস্বপ্ন রহস্য—‘বাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, বাহা পাই তাহা চাই না’-র এক বিচিত্র বাজনা এখানে বিধৃত। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে দোলকের ভূমিকায় এই চিররহস্যময়ী দ্বৈতসত্তা দোদুলমান।

এবার তৌল করুন চিত্র : ৩৫-এর মিথুন মূর্তিটিকে। আমার তো মনে হয়েছে একই শিল্পীর হাতের কাজ, একই মডেলকে সামনে রেখে। নায়িকার মুখ তো হুবহু এক—ফটোগ্রাফিক সাদৃশ্য। নায়কও তাই, যদিও সে এবার অনেকটা সামনে ফিরে আছে—তার প্রোফাইল নয়, মুখের দুপাশেরই কিছুটা দেখা যাচ্ছে। নায়িকার দক্ষিণ হস্তের মুদ্রা অভিন্ন, বামহস্তের মুদ্রাও

প্রায় অনুবৃত্ত। তার মধ্যদেশ এখন নায়কের আরও নিকটবর্তী। এ সব বাহ্যিক দিক নয়, আমি এই দুটি ভাষ্যের পরিবেশিত



চিত্র : ৩৬

রসটি—নায়িকার ভাববাজনার পার্থক্যটি তোল করতে বলছি। ৩৪ ॥ অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করলে দেখবেন, প্রথম নায়িকার (চিত্র : ৩৪) সেই স্বৈতভাব দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অন্তর্হত। প্রথমোক্তা ছিল কিছুটা অন্যমনা—স্মৃতির সরনী বেয়ে সে যেন ছিল আনন্দের অভিসারী; তুলনায় দ্বিতীয়া সুখাবেশে আবিস্টা।

বাস্তবিক পক্ষে উপস্থাপনের চাতুর্যে চিত্র : ৩৫-এর পরিবেশনে দর্শককে বিপথে চালিত করা হয়েছে। মূল নাট্যকার তাঁর নাটকে এ মিলনদৃশ্যে যে পরিমাণে আদ্যরস ঢালতে চেয়েছিলেন আমি কাছে থেকে ছবি এঁকে তা ঢালিনি। মূল নাট্যকারের প্রতিবেদন বুঝে নিতে হলে আরও কিছুটা দূরে সরে গিয়ে ৩৫ ॥ এই মিলন দৃশ্যের সামগ্রিক রূপটা প্রাণধান করতে হবে, অর্থাৎ নায়ক-নায়িকাকে বিচার করতে হবে তাদের পূর্ণাবয়ব অভিনয়ের পরিপ্রেক্ষিতে (চিত্র : ৩৬)। এখন বোঝা যাচ্ছে দ্বিতীয়া নায়িকার সুখানুভূতি নিতান্ত স্নায়ব। অবশ্য দেহ আর মন অসম্পৃক্ত নয়, দেহজাত কামানুভূতি মনকে তৃপ্ত দেয় এবং তার প্রতিফলন হয় সুখের ভাব বাজনার—সেটাও শিল্পীর কাছে

তুচ্ছ করার নয়।

আমার বক্তব্য হচ্ছে, আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী চিত্র : ৩৬ বিচার করে বলতে হচ্ছে পূর্বদৃষ্ট (চিত্র : ৩৫) মিথুনের 'উত্তেজিত মিথুনের' পর্যায়ভুক্ত নয়, সেটি 'শৃঙ্গাররত-মিথুনের'। এখন যে প্রশ্ন উঠে পড়ে তা শিল্পী বিচারের। পূর্ণসত্য জানার পরে—অর্থাৎ দূরে সরে গিয়ে চিত্র : ৩৬-এ আপাদমস্তক দেখার পরে, দর্শক যে জ্ঞানবৃক্ষের ফলাস্বাদন করলেন তাতে কি শিল্পবস্তুটির রসভাস ঘটল? আদম-ঈভের মতো আমরাও কি ঈডেন-উদ্যানের নিকশিত-হেম রাজ্য থেকে বিতাড়িত হলাম? মুশকিল হচ্ছে এই যে, বিচার করবার সময় দর্শক যদি বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে দাঁড়িয়ে থাকেন তাহলে সেই 'সাব্জেক্টিভ' বিচার পক্ষপাতদুষ্ট হতে বাধ্য। বিচারককে মনে মনে সেই প্রয়োদশ শতাব্দীর শিল্পীর চোখ দিয়ে, তার শিল্পবোধের নিরিখে তদানীন্তন সমাজ-বোধের স্বাভাবরণে-পুষ্ট 'সাধারণ দর্শক' হিসাবে বিচার করতে হবে।

কোনাকো উপরজ্ঞা ও তলজ্ঞা অংশে এই ধরনের অসংখ্য শৃঙ্গাররত মিথুনের মূর্তি আছে—কোন কোনটি মানুষের চেয়ে আকারে বড়—যার উপরের-আধখানা রসের বিচারে দর্শকের মনে একজাতের অনুভূতি জাগায়, যাদের নিম্নার্ধ অন্য আর এক জাতের অনুভূতি জাগায়। অস্বীকার করে লাভ নেই—এ জাতীয় মিথুনের দর্শকের মনে কিছুটা বৌন অনুভূতির



চিত্র : ৩৭

সঞ্চয় করে। ঔপনিষদের শ্লোক আউড়ে, আধ্যাত্মিকতার বুলি কপুচিয়ে তাকে ধর্মীয় মালভূমিতে জাতে তোলার চেষ্টাটা হালকা করে। সহজ সরল সত্যটাকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। শিম্পে, বিশেষ করে নগ্নমূর্তিতে (ন্যুড শিম্পে) ঐ বৌদ্ধ অনুভূতিটো শিম্পে-ঔৎকর্ষের বিচারে ক্ষতিকারক কি না, এ-বিষয়ে কেনেথ ব্লার্ক-এর একটি সুন্দর আলোচনা আছে—পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সেটি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব। আপাতত আসুন, আর একটি ‘শৃঙ্গাররত মিথুন’ নিয়ে বিচার করি :

চিত্র : ৩৭-এ দৃষ্ট মিথুনটি কারও কারও মতে কোনার্কের প্রেরিত মিথুন। এর ‘লাবণ্য-বোজনা’ আমাদের স্বরণপথে এনে নেয় বাংলা-সাহিত্যে সুপরিচিত আর এক লাবণ্যের কথা :



চিত্র : ৩৮

“সেইখানে পশ্চিমের দিকে মুখ করে দুজনে দাঁড়ালো। অমিত লাবণ্যের মাথা বুকে টেনে নিয়ে তার মুখটি উপরে তুলে ধরল। লাবণ্যের চোখ অর্ধেক বোজা, কোণ দিয়ে জল গাড়িয়ে পড়ছে। আকাশে সোনার রঙের উপর চুনি-গলানো পান্না-গলানো আলোর আভাসগুলি মিলিয়ে যাচ্ছে; মাঝে মাঝে পাতলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সুগভীর নির্মল নীল, মনে হয় তার ভিতর দিয়ে, যেখানে দেহ নেই, শুধু আনন্দ আছে—সেই অমর্ত্যলোকের অব্যক্ত ধ্বনি জাগছে।” ৩৬ ॥

বিশ্বাস করুন, ছবি দেখে নয়—বাস্তবে অন্তর্দৃষ্টিভিত্তিক কোনার্ক মন্দিরের ধ্বংসস্থপে দাঁড়িয়ে মহাকালের হাতে নির্ধাতিত ঐ মিথুন মূর্তির ঐকান্তিক প্রেমের দৃশ্যটি দেখতে দেখতে আপনার মনে শেষের কবিতার ঐ রোমান্টিক অনুভূতিটাই জাগবে : দেহাতীত ‘প্র্যাটিনিক ল্যান্ডের’ একটা অনুরণন, নিকষিত হেমের একটা স্বর্ণাভা ! কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, কোনার্ক শিম্পী মানতে রাজী নন যে, ‘দেহ নেই।’ তাঁর সেই ঐয়োদশ শতাব্দীর শিম্পিবোধ বলছে—দেহ আছে, বাস্তবে এবং শিম্পে, আর সেই দেহ-দেহালিতেই তিনি শোনাতে চান : অমর্ত্যজগতের অব্যক্ত-ধ্বনি ! —দেহকে বাদ দিয়ে নয়। আর ‘দেহ’ অর্থে শুধু অথরোষ্ঠ নয়, সর্বাঙ্গবৎ।

একথা ‘শেষের কবিতা’র লেখকও জানতেন। এবং মানতেন। কিন্তু তাঁর ঔনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর যুগচেতনায়, সমসাময়িক শিম্পিবোধের নিরিখে, আকেশোর যে ব্রাহ্মসমাজের নীতিবোধে তিনি নিঃস্বাস নিয়ে : এসেছেন সেই অভ্যাসে তিনি সব জেনে বুকেও চুষন-তৃষিণের আংশিক চিহ্নই শুধু এঁকেছেন :

“দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
ভাঙিয়া মিলিয়া যায় দুইটি অধরে
ব্যাকুল বাসনা দুটি চায়ে পরস্পরে
দেহের সীমার আসি দুজনের দেখা ॥” ৩৭ ॥

কিন্তু কবি নিঃসন্দেহে জানেন—এ চিত্র অসমাপ্ত, এ শুধু সূচনা, সমাপ্ত নয় ; এ প্রস্তাবনা, পরমপ্রাপ্তি নয়। তাই বলছেন :

“দুখানি অধর হতে কুসুম চয়ন
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে ।
দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসর শয়ন ॥”

উফাৎ ঐখানেই : এ যুগের কবি রবীন্দ্রনাথ শুধু কুসুমচয়নের চিত্রে রচনার অধিকারী, কিন্তু সেই কুসুম নিয়ে যে মালা গাঁথা হবে, কুসুমের সার্থকতা-দৃশ্যটি থাকবে প্রচ্ছন্ন : ‘ফিরে গিয়ে ঘরে ।’—আর কোনার্ক শিল্পী যখন আদিরসের সমুদ্রে অবগাহন করেন তখন তাঁর কাছে ‘ঘর বার’ একাকার হয়ে যায় । তাই তিনি অনায়াসে ঘরের ভিতরের সেই বাসর-শয়ন দৃশ্যটিকেও তাঁর শিল্পের উপজীব্য করতে ইচ্ছুক । তিনি ঐ রত্নাতুরা নায়িকার কামাবেগকে উৎকীর্ণ করলেন তার দক্ষিণ জ্ঞানুর উৎক্ষেপে (চিত্র : ৩৮ ; একই মিথুনের সর্বাবয়ব চিত্র) । ৩৮ ॥



চিত্র : ৩৯

কোনার্ক জগমোহন



চিত্র : ৪০

কোনার্ক জগমোহন

চুয়ন শূদ্রারের এক আবাশ্যিক পর্যায় । যদি বলেন, প্রথম পর্যায়, তবে বলব, ভুল বললেন । কারণ মিলন-নাটকে এই ক্লিন্না কুশীলবটি কোন দৃশ্যে কখন যে আবির্ভূত হবেন তা স্বয়ং নাট্যকারই জানেন না । প্রথম দৃশ্যেও তিনি দ্বাগত, চরম মুহূর্তে প্রত্যাশিত এবং স্ববিনিকাপাতের পরেও তিনি ফিরে এলে কেউ দোষ ধরে না ।

ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যে শূদ্রারের এই কুশীলবটিকে বারে বারে দেখা গেছে । অনবদ্য নিদর্শন আছে—কোনার্ক, ভুবনেশ্বরে, খাজুরাহোতে এবং অন্যান্যে । বাংস্যায়ন চুয়নের ষোড়শ প্রকার জাতিভেদ করেছেন—দেহের বিভিন্ন অঙ্গের হিসাবে এবং অধরোষ্ঠ-জিহবার সঞ্চালনের পারম্পর্ষে ; বাংস্যায়ন ঋষি বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠায় সূত্রগুলি শুধু লিপিবদ্ধ করেছেন—তাতে

এ্যানাটিম আছে, সাইকসজি আছে, কিন্তু রোমান্স নেই। চুশনের রোমান্টিক বর্ণনার সন্ধান পাবেন—কল্যাণমল্লের ‘অনঙ্গরঙ্গ’ অথবা কালিদাস-ভবভূতি জয়দেব থেকে যাবতীয় কবির কলমে। ভারতীয় ভাস্কর সেই রোমান্টিক ভাবটাই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কোনার্ক জগমোহনের এই (চিত্র : ৩৯) চুশন দৃশ্যটি একটি অনবদ্য উদাহরণ। ৩৯ ॥ আমার তো মনে হয়েছে, এর মাহাত্ম্যে শিম্পীর যতখানি দান, তার চেয়ে বেশি দিয়েছেন—মহাকাল ! আমি ঠিক মত অংকতে পারিনি, মন্দিরে যদি মূর্তিটিকে খুঁজে বার করতে পারেন তাহলে সত্যটা উপলব্ধি করবেন। অনুভব করবেন, শিম্পীর সঙ্গে মহাকালের অতিদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিকথা। শিম্পী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে একটি বিশেষ খণ্ড-মুহূর্তকে শাস্ত্রত করে রেখে যেতে চেয়েছিলেন। অর্ধ-সহস্রাব্দীকাল সামুদ্রিক লোনা হাওয়ায় প্রেমিক-যুগল হারিয়েছে সেই মহাশিম্পীর আশীর্বাদধন্য তাদের দেহের সুচিহ্ন মসৃণতা, তাদের পেসবতা। তবু ভায়া হার মানেনি। মহাকালের নিষ্ঠুর করমুক্তি থেকে ওরা সেই ক্ষণিক মিলন-মুহূর্তটি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে মৃত্যুঞ্জয়ী করে তুলেছে :

“অধরের কানে যেন অধরের ভাষা
দেঁহার হৃদয় যেন দেঁহে পান করে—
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধরসংগমে।”

অথবা দেখুন আর একটি চুশনভূষিত মিথুনকে (চিত্র : ৪০)। এটিও কোনার্ক জগমোহন থেকে সংগৃহীত। ৪০ ॥ নিঃসন্দেহে একটি অনবদ্য ভাস্কর্য নিদর্শন। কিন্তু যে কথা বারে বারে বলেছি, আবার তাই বলতে হচ্ছে। এই রোমান্টিক চুশনদৃশ্যটি যে রসের পরিবেশন করছে তার রূপ বদলে যাবে, যদি আমরা একটু দূরে সরে গিয়ে ঐ চুশনভূষিত মিথুনকে লক্ষ্য করি। বাস্তবে এরা শৃঙ্গাররত মিথুন আদৌ নয়, মৈথুনরত মিথুন। পরবর্তী অধ্যায়ে তার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। চিত্রটি আপনারা এখনই মিলিয়ে দেখতে পারেন—চিত্র : ৫৪।

যদি বলেন, চিত্র : ৫৪ দেখার সঙ্গে সঙ্গে ঐ শিম্পিবস্তুটির রসাত্মক ঘটল, স্কুলতা স্পর্শ করল, তাহলে বলব : আর একটু ভালিয়ে দেখুন, আর একটু ভেবে বলুন। আস্তে না, আমাকে বলতে হবে না। বলবেন মনে মনে, নিজের বিবেককে। এবং না—আপনার আজকের বিবেককেও নয়—সেই জাতিস্মর-আপনার ত্রয়োদশ শতাব্দীর দর্শকের বিবেককে।

কী ? পারবেন ?

এগারো

॥ পাশ্চাত্য-শিল্প : ন্যুড ॥

পর্যায়ক্রমে এ অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য-বিষয় ছিল : মৈথুনরত মিথুন। কিন্তু তার পূর্বে আমরা অন্য একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করে নেব—পাশ্চাত্য-শিল্পে : ন্যুড। ‘ন্যুড’ শব্দটাকে বাংলায় ‘নগ্নমূর্তি’ বলায় আমার আপত্তি আছে। অনাবৃত, নিবারণরূপ প্রভৃতি শব্দও সুপ্রযুক্ত অনুবাদ নয়। বহুত ইংরাজী ভাষায় nude এবং naked শব্দদ্বয়ের যে পার্থক্য তা বাংলা বা সংস্কৃতের কোন শব্দে ঠিক মতো প্রকাশ করতে পারা যায় না বলেই এই ‘ন্যুড’ শব্দটি এ গ্রন্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

দেখুন, পাশ্চাত্য-শিল্পে নরনারীর মিলনদৃশ্য আছে প্রচুর, কিন্তু ‘মিথুন’ নেই। ইংরাজী ভাষা তাই ‘মিথুন’-কে ‘gemini’-জাতীয় কোনও কষ্ট-কম্পিত শব্দের দ্বারা চিহ্নিত না করে সরাসরি ইংরাজী বানানে ‘mithuna’ শব্দটিকে গ্রহণ করে অভিধানে ঠাই দিয়েছে। অনুরূপভাবে ভারতীয় শিল্পে নগ্নমূর্তির সংখ্যা যথেষ্ট, কিন্তু ‘nude’ নেই। তাই আমার এই প্রস্তাব।

তফাৎটা কোথায় জানেন? ভারতীয় শিল্পে ‘মিথুন’ একটা পরিণতি, একটা end; পাশ্চাত্য শিল্পে ‘ন্যুড’ একটা মাধ্যম, means। মিথুনের লক্ষ্য ধ্রুব : আদিরস—পুরুষ ও প্রকৃতির নিত্যনন্দনই তার উপজীব্য। অপরপক্ষে ‘ন্যুড’ যে কী-রস পরিবেশন করবে তার কোনও স্থিরতা নেই। তা আদিরস না হতে পারে। ‘ন্যুড’-এর অর্ধাধালায় পরিবেশিত হতে পারে বীর-করুণ-রুদ্র-বীভৎস বা আর কোনও রস নিছক দেহসৌন্দর্য বিকাশের প্রচেষ্টাও হতে পারে। ব্যতিক্রম হিসাবে ভারতীয় শিল্পেও আদিরস-বাজিত নগ্ন নারীদেহ দেখানো যেতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বেমন বলা যায়, অজস্র সপ্তদশ বিহারের বিশ্ববন্দিত ‘জনপদকল্যাণী মৃত্যু’ বা ‘মরণাহতা রাজকন্যার’ আলেক্সান্দ্রিয়ার মরণোন্মুখ নারীকায় সে চিত্রে শুধুমাত্র করুণ রসই পরিবেশন করেছে, যদিও সে সম্পূর্ণ অনাবৃত। কিন্তু ভারতীয় শিল্পে সেটি ব্যতিক্রমই।

ন্যুড-এর উৎপত্তি : সপ্তদশ শতাব্দীর পর থেকে পাশ্চাত্য-শিল্পেই শুধু নয়, ইংরাজী ভাষাতেই ‘ন্যুড’ শব্দটি ব্যবহৃত হলে আমরা ধরে নিই : নগ্ন নারীমূর্তি। কিন্তু আদিমতম যুগে ‘ন্যুড’ বলতে বোঝাতো শুধু ‘নগ্ন পুরুষমূর্তি’। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও নিবারণরূপ নারীমূর্তির পরিকল্পনা ছিল, তা আমরা দেখেছি, কিন্তু এই অধ্যায়ে যে বিশেষ বাঞ্ছনাময় অর্থে ‘ন্যুড’ শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে তার জনক গ্রীস। ‘ন্যুড’ এসেছে গ্রীক আর্ট থেকে। খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে একটিও নগ্ন নারী মূর্তি গ্রীক-শিল্পে খুঁজে পাওয়া যায় নি; খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতেও তারা সংখ্যায় অত্যল্প। অপর পক্ষে এই সময়কালে এ্যাপোলোর অনেকগুলি নগ্নমূর্তি গ্রীক-আর্টে পাওয়া গেছে। তার হেতু : আদিম গ্রীক পৌরাণিক অনুভাবনায় এ্যাপোলো ছিলেন অনাবৃত অথচ অফ্রোদিতি প্রচুর বস্ত্রাবৃত। সাহিত্য সমকালের প্রতিফলন। এ ক্ষেত্রেও তাই। সে আমলে গ্রীক সমাজেরও এই রীতি। যুবকেরা অনাবৃত অবস্থায় ব্যায়াম করত। কটিমাত্র বস্ত্র পরিধান করে, অথবা না করেও সমুদ্র তীরে রৌদ্রস্নান করত—অথচ স্ত্রীলোকদের সর্বসমক্ষে উপস্থিত হতে হত প্রচুর বস্ত্র সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে। ৭৭৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দে যখন প্রথম অলিম্পিক হল, তখন গ্রীক যুবকেরা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে নগ্নাবস্থায়। অন্তত পরবর্তীকালে গ্রীক শিল্পে সেই অলিম্পিক পুরুষ প্রতিযোগীদের নগ্ন অবস্থাতেই দেখতে পাই। ফলে পুরুষের নগ্ন দেহ দেখতে অভ্যস্ত ছিল সমকালীন সমাজ।

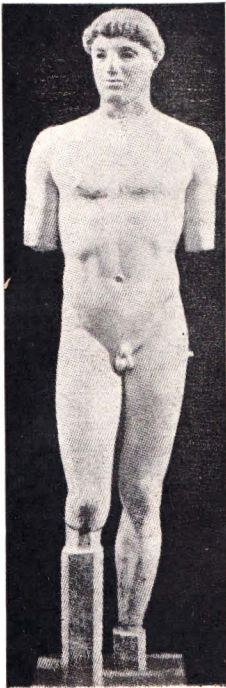
গ্রীক-সভ্যতার ‘উইমেন্স-লিভ’-এর প্রথম প্রতীক এল স্পার্টা থেকে। সেখান থেকে মেরেরা অলিম্পিকে ঝোপ

দিতে এল খাটো কুর্ভা পরে, আজানু-নিম্নাঙ্গ অনাবৃত করে। সেই সূচনা। তার পরবর্তী যুগে দেখা গেল অনাবৃত ভেনাস-মূর্তি। তাও প্রথম প্রথম ভেনাস মূর্তিকে আবরণিত করা হত আশঙ্ক বস্ত্রে—ইংরাজীতে যাকে বলে diaphanous garments, ফরাসী ভাষায় draperie mouillée। সূত্রাং পাশ্চাত্য-খণ্ডের ন্যূন সঙ্কে আলোচনা করতে হলে আমাদের শুরু করতে হবে এ্যাপোলোকে দিয়ে।

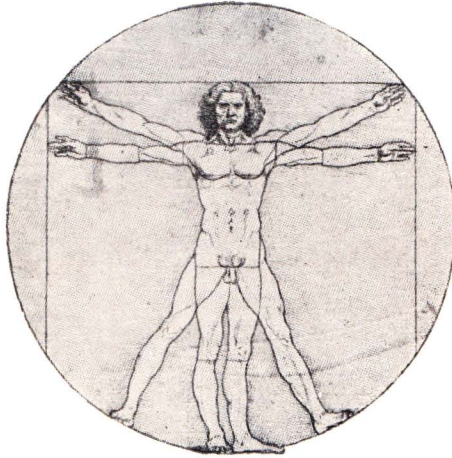
পুরুষ-মূর্তি : গ্রীক শিল্পে সূর্যের দেবতা এ্যাপোলো হচ্ছেন আদর্শ পুরুষরূপে কল্পিত। পৌরুষ-ব্যঞ্জক, সুগঠিততনু, বীর্যবস্তুর পরাকাষ্ঠা। তাঁর প্রাচীনতম যে মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটিকে কিন্তু আদর্শ পুরুষের মূর্তি বলে স্বীকার করে নিতে আজকের দর্শক আপত্তি জানাবেন (চিত্র : ৪৫)। মূর্তিটির ভাব আড়ম্বর, মাথা দেহের তুলনায় বড়, এবং ভাস্কর্যে ত্রিমাত্রিক বস্তুস্বভাবের অভাব। সে আমলে গ্রীক ভাস্করের দল প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আনুপাতিক মাপজোপ কেমনভাবে নিতেন তা জানা যায় না, যদিও অনুমান করা যায় যে, ‘রূপভেদ’ ও ‘প্রমাণ’, অর্থাৎ আঙ্গিক গঠন ও আনুপাতিক মাপজোপের হিসাব বিষয়ে তাঁরা সর্বিশেষ যত্নবান ছিলেন। কারণ গ্রীক সভ্যতার সব কিছুই গণিতের ছকে মাপা। পিথাগোরাস-এর জ্যামিতিক মান গ্রীক অনুভাবনার মজ্জায় মজ্জায়। ভিট্রুভিয়াস-এর তৃতীয় গ্রন্থের প্রথমেই একটি সূত্র আছে, যার অর্থ ঠিক বোধগম্য হয় না ; কিন্তু অতি আধুনিক কালে স্থাপত্য-বিদ্যায় ‘module’ নামে যে অনুভাবনাটি জন্মগ্রহণ করেছে—অর্থাৎ বাসগৃহ তথা আসবাবপত্রের মাপজোপ গড় মানুষের দেহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হওয়া চাই—সেই ধারণার বীজ বোধ করি ঐ সূত্রটিতেই উদ্ভূত। ভিট্রুভিয়াস প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন,—“প্রসারিত-হস্তপদ একজন পূর্ণাবয়ব মানুষ বস্তু এবং বর্গক্ষেত্রে বিধৃত হতে পারে।” রেনেসাঁ যুগের বহু খুরদর পণ্ডিত এ বিষয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। তার ভিতর লিওনার্দো দ্যা-ভিঞ্চি যে সূত্রটি তাঁর নোট বুকে লিপিবদ্ধ করেন, সেটাই পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্য-শিল্পের মানদণ্ড ছিল (চিত্র—৪২)। বহুত উনিবিংশ শতাব্দীর শেষাংশেই ফর্ম-ভাঙার যুগ বর্তদিন না এল ততদিন এটাই ছিল মনুষ্য দেহ রূপায়নের কেন্দ্রীয় সূত্র। এই চিত্রটি থেকেই ‘figure of eight heads’-এর জন্ম। অর্থাৎ সম্মুখ-দৃশ্যে চিবুক থেকে বক্ষতালু পর্যন্ত বা দৈর্ঘ্য, মানবদেহ তার আটগুণ লম্বা। ঐ নরদেহের অর্ধমাংশই হচ্ছে প্রাথমিক module-এর মাপ। যৌনান্ন-মূল উপরে মাথা ও নিচে ভূমি থেকে সমদ্রত্বে : চার মডুল। সম্মুখ দৃশ্যে স্তনবৃত্তদ্বয়ের দূরত্ব এক মডুল, প্রভৃতি। এই হিসাবে দেখছি চিত্র—৪৫-এ আদিম এ্যাপোলো মূর্তির মাথা তার দেহ-দৈর্ঘ্যের এক অর্ধমাংশের বেশি।

সে যাই হোক, ঐ আদিম এ্যাপোলো মূর্তি নির্মাণের শওরা শ’ বছর পরে দেখতে পাচ্ছি, পুরুষ মূর্তির স্বথেষ্ট বিবর্তন হয়েছে। এ্যাক্তোপোলিস্-এর মন্দিরে প্রাপ্ত পরবর্তী যুগের মূর্তিটির (চিত্র—৪১) ভাস্করের নাম ক্লিটিয়াস্। এটি খ্রীঃ পূঃ ৪৮০ তে নির্মিত। এ মূর্তিতে পৌরুষ আরও প্রকট, সৌন্দর্য আরও বিকশিত এবং এ-ক্ষেত্রে মাথাটি দেহ-দৈর্ঘ্যের এক অর্ধমাংশ।

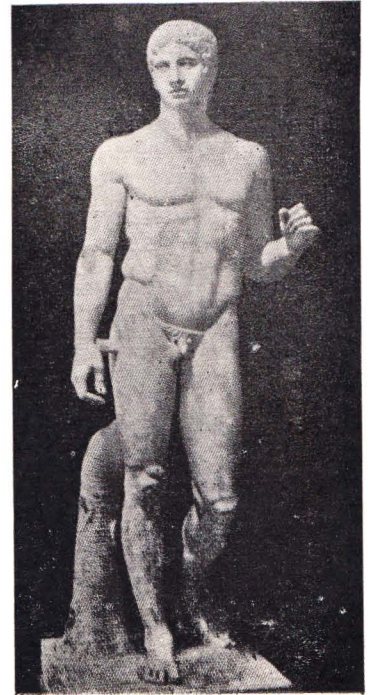
পরবর্তী যে উদাহরণটি পাচ্ছি (চিত্র—৪০) তার আদি নির্মাতা বিখ্যাত ভাস্কর : পলিক্লিটাস। এর বহু অনুকৃতি হয়েছিল, পরবর্তী যুগে। বরসে এটি পূর্বদৃষ্ট এ্যাপোলো মূর্তির তুলনায় মাত্র পঁচিশ/ষাশ বছরের অনুরূপ। এ মূর্তিতে শিল্পীর কৃতিত্ব আরও বেশি। এটি আরও বাস্তবানুগ, আরও সজীব এবং সবচেয়ে বড় কথা এ মূর্তিটি আর স্থাবর নয়—যেন একটা গতিশীল ব্যক্তিত্ব। এর পরবর্তী যুগেই পুরুষ মূর্তিতে এসেছে জঙ্গমতা। প্রাথমিক-যুগের মিশরীয় প্রভাব (মিশর-ভাস্কর্যে স্থাবরতারই আধিপত্য) থেকে গ্রীক-শিল্প যেন এতদিনে মুক্তি পেল। এল ব্যায়ামবীর, খেলোয়াড়, মল্লযোদ্ধা, বজ্রার, সৈনিক, শিকারীর দল। বিশ্ববিখ্যাত ডিক্সোবোলাস -এর ডিস্ক নিক্ষেপ একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ, অজগরবেষ্টিত লাক্কুন রূপ আর একটি।



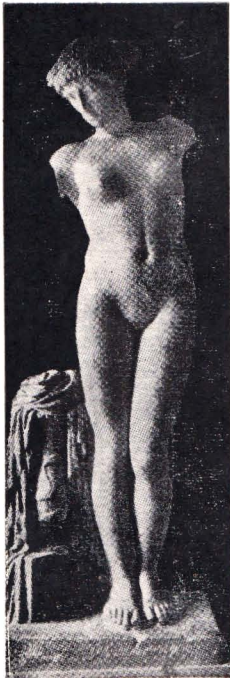
চিত্র-৪১ : এ্যাপোলো, গ্রীস
৩টিটিরস্, খ্রীঃ পূঃ ৪৮০



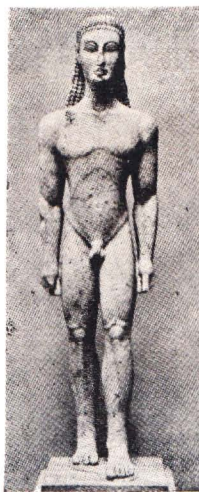
চিত্র-৪২ : লিওনার্দোর স্কেচ



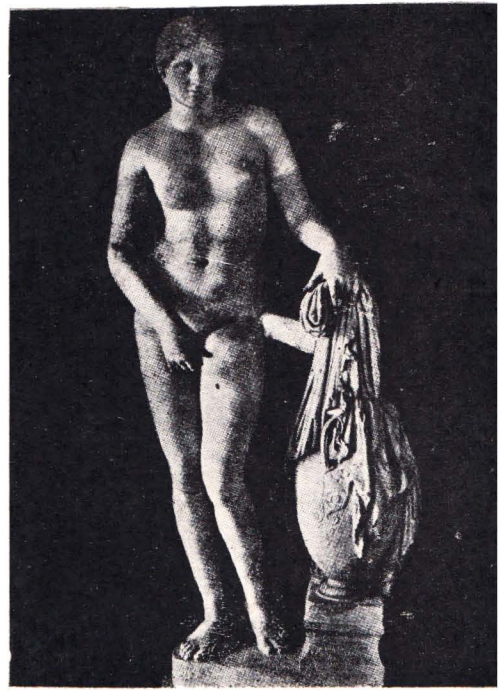
চিত্র-৪৩ : পলিক্লিটাস্ অনুসরণে
খ্রীঃ পূঃ ৪৫০



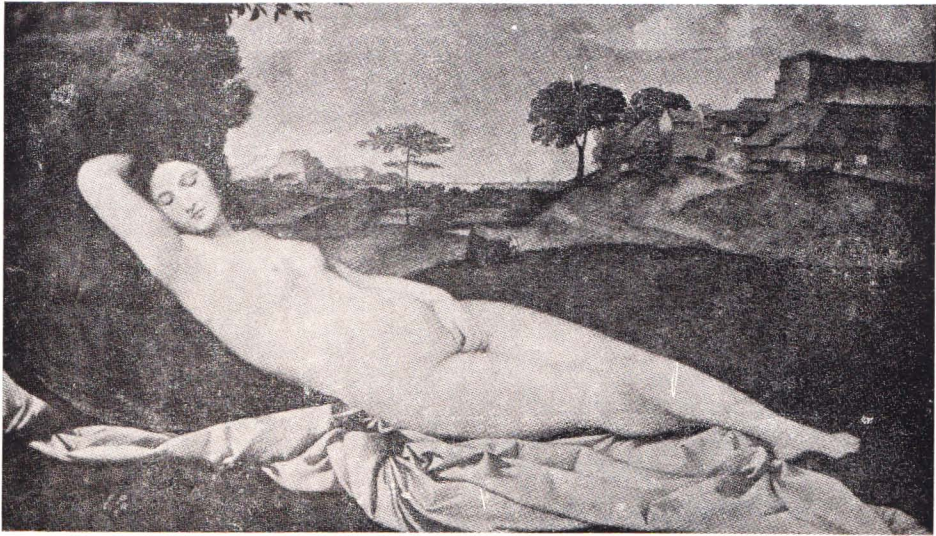
চিত্র-৪৪ : এ্যাসকুহ্লিন ভেনাস
খ্রীঃ পূঃ ৪৫০



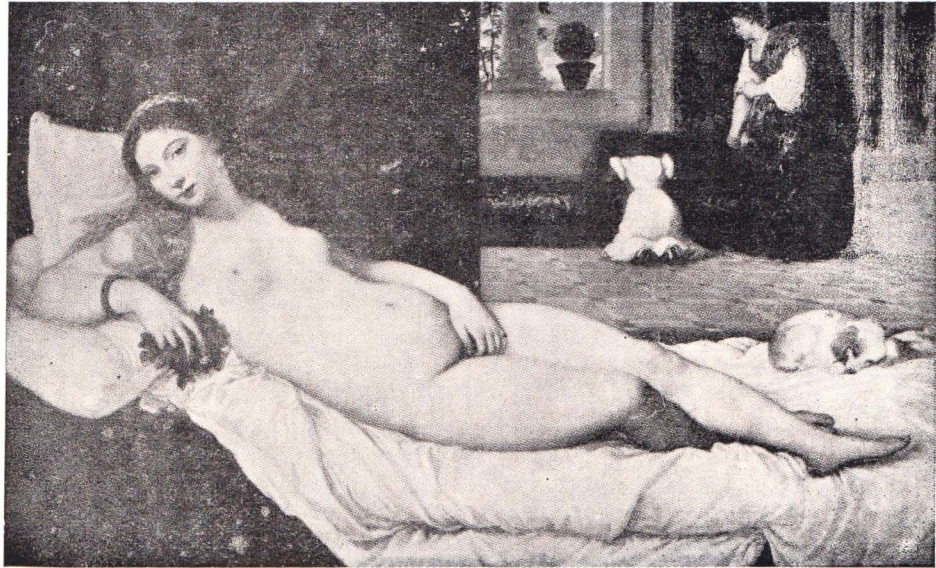
চিত্র-৪৫ : এ্যাপোলো, গ্রীস
খ্রীঃ পূঃ ৬০০



চিত্র-৪৬ : ক্লাডিয়ান ভেনাস
খ্রীঃ পূঃ ৩৫০



চিত্র-৪৭ : শায়িতা ভেনাস, জর্জনে



চিত্র-৪৮ : শায়িতা ভেনাস, তিজিয়ানো



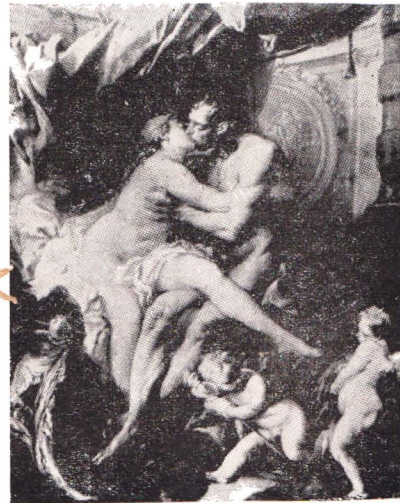
চিত্র-৪৯ : গ্রীক শৈলী অনুসরণে



চিত্র-৫০ : থ্রি গ্রেসেস্, বুবেল্স



চিত্র-৫১ : মার্স ও ভেনাস



চিত্র-৫২ : মার্স ও ভেনাস



চিত্র : ৫৩
ভূগার : দক্ষিণ-আমেরিকা



চিত্র : ৫৪
স্থিত ঈশ্বর-আসন, কোনার্ক



চিত্র : ৫৫
বলাৎকার : গ্রীক শৈলী



চিত্র : ৫৬
উঠানবন্ধ : নাগরবন্ধ—কোনার্ক

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ্যাপোলোর উপস্থাপিত তিনটি মূর্তিতেই—বহুত সে আমলের প্রায় প্রতিটি পুরুষ মূর্তিতে নিম্নযোনীজাতি নিখুঁত ভাবে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলি আদিরসের দ্যোতক নয়। বাস্তববাদিতা বা ‘রিয়ালিজম’-এর প্রেরণাতেই হস্তপদাদির মতো স্বাভাবিক অঙ্গ হিসাবেই তা খোদিত। যেহেতু সমাজ সেটাকে অশালীন বলে ভাবেনি, ভাবতে অভ্যস্ত ছিল না। এর সঙ্গে ভারতীয় ভাস্করের তুলনা করলেই আমরা অনুভব করব—কলিঙ্গ, খাজুরাহো বা অন্যত্র যেখানেই মিথুন মূর্তিতে পুরুষাঙ্গটি উৎকীর্ণ করা হয়েছে তার মূল লক্ষ্যঃ আদিরস। শিব, লাকুলীশ বা দিগম্বর জৈন তীর্থঙ্করদের একক-মূর্তির কথা ব্যতিক্রম হিসাবে বাদ দিলে স্বীকার করতেই হবে ভারতীয় ভাস্কর্যে—বিশেষ করে মিথুন-মূর্তিতে যোনীঙ্গের উপর শিম্পী এক বিশেষ জাতের গুরুত্ব আরোপ করেছেন—তা যেন আঙুরলাইন করা।

এখানেই ‘নুড’ অনুভাবনার বৈশিষ্ট্য। এই মূল্যবোধই ‘নুড’ অনুচিত্তাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

নারী-মূর্ত্য : গ্রীকযুগ থেকে রেনেসাঁ অভিক্রম করে উনবিংশ শতক পর্যন্ত নগ্ন পুরুষমূর্তি পশ্চিমবঙ্গে একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত। আদি-এ্যাপোলোর নানান বিবর্তন হয়েছে; আঙ্গিকে, উপস্থাপনের শৈলীতে এবং ভাববাজনায়,—স্থির-স্থাবর থেকে সে গতিশীল জন্ম হয়েছে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপজোপ পরিবর্তিত হয়েছে, তা আরও বাস্তবানুগ হয়েছে—কিন্তু দে চিন্তাধারা কখনও বিধা-বিস্তৃত হয়নি। আদিমতম এ্যাপোলোর সঙ্গে মিকেলাঞ্জেলোর ‘ডেভিড’-এর যা প্রভেদ তা শুধু রচনা-শৈলীতে, জাতিগত পার্থক্যে নয়। অপরপক্ষে নগ্ন নারীমূর্তির পরিকল্পনা রেনেসাঁ যুগে উপনীত হয়ে অতি অস্পষ্ট সময়ের ভিতর দু-তিনটি ধাপে আমূল পরিবর্তনের সম্মুখীন হল—যা বিবর্তন নয়, বিপ্লব; কী আঙ্গিকে, কী উপস্থাপন-চাতুর্যে, কী রসের ক্ষেত্রে। পুরুষ মূর্তির ক্ষেত্রে গ্রীক-আদর্শ যদি এ্যাপোলো, তাহলে নারীমূর্তির আদর্শ হচ্ছে আফ্রোদিতি বা ভেনাস।

আগেই বলেছি, প্রথম যুগে আফ্রোদিতি ছিলেন বস্ত্রাচ্ছাদিতা। ফলে নুড ভেনাস আবির্ভূত হলে এ্যাপোলো মূর্তি পরিকল্পনার ‘প্রায়শ’ বস্ত্র পরে—যেন বাইবেল বর্ণিত ইডেনে ইভ এলেন এ্যাডামের পরবর্তী কালে, তারই বক্ষপঞ্জর থেকে উপাদান সংগ্রহ করে। ঊষায়ুগে পুরুষ-নুড-এর মতো ভেনাসও ছিল আড়ম্ব, স্থাবর, কাঠপুস্তলীবৎ। বহুত গ্রীঃ পূঃ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীক-ভাস্করের অন্তরে মিশর শৈলীর প্রভাব বর্তমান ছিল। গ্রীক শিম্পী তখনও তাঁর স্বকীয়তার সন্ধান পাননি। আদিম ভেনাস্-এর সেই সমস্ত কাঠপুস্তলীবৎ রূপটিকে আন্তর্জাতিক রূপান্তরিত হতে দেখছি ‘এ্যাস্কুইলিন ভেনাস্’-এ (চিত্র-৪৪)। তবু এক্ষেত্রেও দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রূপাংশে কোথায় কী যেন একটা গরমিল আছে। মুখটি পরিণতবয়স্ক মহিলার, যদিও ব্যক্তি দেহ প্রায়-কিশোরীর।

গ্রীক পরিকল্পনার ভেনাস ক্লাসিকাল-সৌন্দর্যের পশরায় পূর্ণরূপে বিকশিতা হলেন, বলা যায়, ‘ক্রিডিয়ান ভেনাস্’এ। শিম্পীর কম্পলোকের রাজকন্যা সোনার কাঠির পরশ পেয়ে এতদিনে জেগে উঠেছে। এ সোনার-কাঠি গ্রীক ক্লাসিকাল সৌন্দর্যবোধ। এই মূর্তির ভাস্কর তদানীন্তন গ্রীসের শ্রেষ্ঠ শিম্পী : প্র্যাক্সিটেলিস্। তাঁর সহস্র-নির্মিত আদি মূর্তি অসংখ্য আজও আবিষ্কৃত হয়নি; হয়েছে তাঁর শিষ্যদলের একাধিক অনুকৃতি (চিত্র-৪৬)।

গ্রীঃ পূঃ যুগের যাবতীয় ভেনাসমূর্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ‘ভেনাস-ডি মেলো’। ১৮২০ সালে ঐ মূর্তিটিকে কয়েক টুকরা অবস্থায় সমুদ্রগর্ভ থেকে উদ্ধার করা হয়। অনেকের অনুমান এটিও শিম্পী প্র্যাক্সিটেলিস্-এর পরিকল্পনা, হয় তো তাঁর সহস্র নির্মিত মূর্তি। মোনালিসাকে বাদ দিলে আজও এই মূর্তিটি পারীর ল্যান্ড-সংগ্রহশালার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। এই অতি পরিচিত মূর্তিটির চিত্র সংযোজন করা নিতান্ত বাহুল্য।

গ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্তীকালে যতগুলি গ্রীক ভেনাসমূর্তি পাওয়া গেছে তার প্রত্যেকটিই নুড। লক্ষণীয়, প্রথমযুগে, এ্যাস্কুইলিন ও ক্রিডিয়ান ভেনাস্-এ শিম্পী রমণীমূর্তির বস্ত্রের অভাবটার বিষয়ে সচেতন, তাই তিনি সেদুটি ক্ষেত্রে

পারিধেরটিকে শিম্পবহুতে দেখিয়েছেন। সে বাই হোক, রোমক শিম্পেও ঐ ঐতিহ্য অব্যাহত ছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট ধর্মের অভ্যুত্থানের পর মূর্তিপূজার বিরোধী পাদরীদের প্রভাবে মূর্তিগঠনেই ভাটা পড়ে, নগ্নমূর্তি তো বটেই। দীর্ঘ দুই শতাব্দী অতিক্রম করে রেনেসাঁর উষ্মায়ে দেখাছি, ইটালীর শিম্পাদল সোল্দিয়ের দেবী সেই অবলুপ্ত ভেনাসকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছেন। গ্রীক ভাস্কর লিপিয়াস্-এর নির্মিত একটি ভেনাসমূর্তি চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ফ্লোরেন্সে আবিষ্কৃত হয়। ফ্লোরেন্স তখন পাশ্চাত্য-শিম্পের কেন্দ্রবিন্দু। শিম্পাদল এই আবিষ্কারে উল্লাসে ফেটে পড়লেন। নগরবাসীরা মূর্তিটি নগরীর কেন্দ্রস্থলে সাড়যরে প্রতিষ্ঠা করল একটি সুউচ্চ বেদীর উপর। রাজ সরকারের প্রধান চিত্রকর লোরেনজোতি ঐ মূর্তির একটি অনুকৃতিও করলেন। কিন্তু চার্চ বাদ সাধল। খ্রীষ্টধর্মের গোড়া কিছু সমর্থক এসে আপত্তি জানালেন! ফলে শেষ পর্যন্ত পোপের আদেশে ১৩৫৭ সালের এই নভেম্বর ভেনাসের মূর্তিটিকে উৎপাটিত করে কবর দেওয়া গেল।

এই ধর্মান্তর যুগে পাশ্চাত্যশিম্পে ন্যূড-অনুচিন্তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সাক্ষ্যে বস্ত্রচেল্লীর অবদান অসামান্য। স্মরণে রাখা প্রয়োজন, বস্ত্রচেল্লী সাভোরানালায় সমকালীন, যে সাভোরানালা খ্রীষ্টান জগৎ থেকে অশ্লীলতা ও দুর্নীতি দূরীকরণের রত নিয়ে আগুন জ্বালিয়েছিলেন। বস্ত্রচেল্লী ছিলেন ফ্রা ফিলিপ্পো-লিপির শিষ্য এবং মেডিসি পরিবারের সুবিখ্যাত শিম্প-পরিপোষক



চিত্র—৫৭

প্রিমাভেরার-আংশিক রেখাচিত্র ॥ বস্ত্রচেল্লী

লরেনজো দ্য ম্যাগ্নিফিসেন্ট ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক। লরেনজোর জ্ঞাত-ভ্রাতার প্রাসাদ সুসজ্জিত করতে বস্ত্রচেল্লী একখানি বিশালায়তন চিত্র আঁকেন—যা নাকি বিশ্বশিম্পের এক অনবদ্য নিদর্শন : 'প্রিমাভেরা'। রেনেসাঁর উষ্মায়ে রমণী সোল্দিয়ের

পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সেটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। চিত্র-৫৭তে একটি রেখা-চিত্রের মাধ্যমে আংশিক কম্পোজিশনটা বোঝাবার চেষ্টা করেছি। চিত্রে একাধিক নারী চরিত্র আছে : ভেনাস্, বসন্ত, থি-গ্রেসেস্ [Euphrosyne, Aglaia, এবং Thalia —এই তিনজন রমণীকে যৌথভাবে বলা হয় থি-গ্রেসেস্ ; গ্রীক পরিকল্পনায় তারা আবশ্যিকভাবে ন্যূড] প্রভৃতি। কিন্তু এদের কাউকেই বসন্তের অনাবৃত্য করে আঁকেননি। তাদের উনি পরিয়েছেন আচ্ছন্ন বস্ত্র। যাতে তাদের রমণীয় দেহ-সৌষ্ঠব স্পষ্ট বোঝা যায়, যদিও তারা নগ্নিকা নয়।

শিম্পী এমনভাবে নারীদেহগুলি আঁকলেন যাতে মনে হয়, ওরা রক্ত-মাংসের জীব নয়, যেন অপার্থিব, বায়বীয়, ভারমুক্ত। বিষয়বস্তু চয়নেও গোঁড়া খ্রীষ্টানের আপত্তি করার কিছু নেই—‘বসন্তের আগমন’। নারীদেহ সুসমার রূপায়ণে পোষাক কোনও অন্তরায় হল না। অথচ আচ্ছন্ন বস্ত্রের উপস্থিতিতে কটর নীতিবাহীশেরাও আপত্তি করতে পারলেন না।

বহুর দেশের পনের কথা। আর একপদ অগ্রসর হলেন বসন্তেরা। এবার আঁকলেন “ভেনাস্-এর জন্ম”। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিম্পসম্পদের তালিকায় প্রথম দশটি চিত্রের মধ্যে তার স্থান নির্দেশিত। এই চিত্রে ভেনাস্ সগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। এবারও তার একটি রেখাচিত্র সংযোজন করে কম্পোজিশনটা বোঝাবার চেষ্টা করেছি চিত্র-৫৮তে। চিত্রের কেন্দ্রস্থলে দেখতে



চিত্র-১৮

ভেনাসের জন্ম ॥ বসন্তেরা

পাচ্ছি—সমুদ্র থেকে তটভূমির দিকে ভেসে আসছেন সাগরতনয়া ভেনাস্। তিনি একটি বিনুকের উপর দাঁড়িয়ে। তাঁর দক্ষিণে সমুদ্রবায়ু, এবং বামে পুষ্পভারনম্না ধরিত্রী। দেখছি, মাতা ধরিত্রী এগিয়ে আসছেন একটা জন্মকালো পোষাক হাতে, কারণ সমুদ্র কন্যা ভেনাস্ আবির্ভূত হয়েছেন ন্যূডরূপে। ভাবখানা, অনাবৃত্য ভেনাস্কে দেখে মাতা ধরিত্রী বিচলিত। ভেনাস্-এর

দিকে 'লাজবস্ত্র' বাড়িয়ে ধরে তিনি বেন বলতে চান—বন্ধুস্বাক্ষরের রীতিনীতি এই অরুণ-আলো উদ্ভাসিত স্থল ভূ-ভাগে অপাংক্তের। এখানে নারীদেহে লাজবস্ত্র আবশ্যিক।

এবারেও কুট কৌশলে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করলেন বন্ডিচেল্লী। নগ্নমূর্তি আঁকলেও বামহস্তের সংস্থাপনে শালীনতা রক্ষিত হল। ধর্মাত্ম পাদরীরা আপত্তি করতে পারলেন না। 'ন্যুড' সগৌরবে পাশ্চাত্য শিল্পে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল।

লক্ষ্য করে দেখুন—ভেনাসমূর্তির ভারসাম্য রক্ষিত হয়নি। ওভাবে কোন মনমানুষের পক্ষে দাঁড়ানো সম্ভবপর নয়। জিজ্ঞাসিত হলে বন্ডিচেল্লী হয়তো বলতেন, বটেই তো! ওর ভারই নেই, তার ভারসাম্য কিসের? অনেক বিদ্বদ্র সমালোচক বলেছেন, ভেনাসকে দেখলে মনে হয়, সে বাতাসে ভাসছে। আমার কিন্তু অরিজিনাল ছবিটা দেখে তা মনে হয়নি। আমার বরং মনে হল—ভেনাস এখনও জলের মধ্যেই আছে—তার ভারহীনতার হেতু: 'বয়ালিঙ্গ' ও ভাসছে—বাতাসে নয়, জলের তলায়। মানে ভাসছেও না, ডুবছেও না—ও বেন ডেকার্টে' পরিকল্পিত কার্টিশান ডাইভারের মত সমুদ্র জলের 'সমতুল ঘনাক্ষর' এক বিচিত্র প্রাণী; অর্থাৎ ডুবছেও না ভেসেও উঠছে না। জলের আকাশে ও ঘিশঙ্কু। তাই ওর দেহভার নেই।

বন্ডিচেল্লীর এই ভেনাসকে যদি ক্লিডিয়ান ভেনাস-এর (চিত্র-৪৬) সঙ্গে তুলনা করেন, তবে মনে হবে এই পুনরুজ্জীবিতা ভেনাস একটি অপার্থিব সত্তা; রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জার নয়, তার দেহের উপাদান শুধুমাত্র কবি কল্পনা। স্নায়বীয় নয়, বায়বীয়! ভেনাস-এর গ্রীবা, তার বামহস্তের রেখাঙ্কনে বন্ডিচেল্লী সম্ভ্রমে এ্যানার্টমিকে অবসীকার করেছেন। সমুদ্র তরঙ্গের সঙ্গে প্রত্যঙ্গগুলি যেন 'অনুনাদে' এক ঐক্যতান রচনা করেছে। পরবর্তী যুগে এ থেকেই 'ম্যানারিজম'-এর জন্ম।

আরও লক্ষণীয়, শিল্পী সুকৌশলে নগ্নিকা ভেনাস-এর লজ্জা নিবারণ করেছেন তারই মাথার চুলে। উদ্দেশ্য—কটুর নীতিবাগীশদের আপত্তি এড়িয়ে যাওয়াই শুধু নয়, বন্ডিচেল্লী সাভারোনালার মতবাদে অবিস্থাসী ছিলেন না। তিনি রীতিমতো দো-টানায় কাজ করে গেছেন। শিল্পের তাগিদে তিনি 'ন্যুড'কে পুনরুজ্জীবিত করেছেন বটে; কিন্তু কোথাও নগ্ননারীর মূল যৌনাত্মক আঁকেননি। প্রতিবারেই ঐ একই কায়দায়—এক হাতে এলায়িত কুন্তলগুচ্ছ টেনে শালীনতা রক্ষা করেছেন। তার সুবিখ্যাত Lone Venus, অথবা 'Story of Nastagio degli Onesti' (বার্সেলোনা, গার্সা সংগ্রহশালা) এবং Calumny র (ক্লোরেল, উফিজি সংগ্রহশালা) 'ন্যুড' একইভাবে স্ব-স্ব নিয়ম যৌনাত্মক আচ্ছাদিত করেছে।

এর পরবর্তী যুগে, রেনেসাঁ দিকপালের অসংখ্য 'ন্যুড' এঁকেছেন বা গড়েছেন। লিয়োনার্দো, মিকেলঞ্জেলো, রাফায়েল, বেল্লিনি, ভিজিয়ানো, জর্জনে, কোরোজ্জিও, ডুরার, পেরুজিনো, ভেরিনিজ, ওয়েডেন ইত্যাদি ইত্যাদি। না তৎকালীন সমাজের কোনও কটুর নীতিবাগীশ, না ধর্মীয় সূচিব্যঙ্গসমালোচক, কেউই আপত্তি করতে পারেননি। মিকেলঞ্জেলোর অনবদ্য সৃষ্টি সিস্টিন চ্যাপেলে আঁকা শেষ-বিচার দৃশ্যে ন্যুডগুলিকে কাপড় পরিয়ে দেবার আদেশ নাকি একবার দিয়েছিলেন পোপ। সৌভাগ্যক্রমে সে আদেশ স্বাভাবিকরূপে পালিত হয়নি, মোট কথা সে আদেশে ঐ বিশ্ববিল্মিত চিত্রসম্ভার কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। 'ন্যুড' পাশ্চাত্যশিল্পে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল।

এই ধারার শেষ শিল্পী—অন্তত আমার বা মনে হয়েছে—হচ্ছেন, জর্জনে। জর্জনে ছিলেন ভেনিশীয় শিল্পগুরু গিওভান্নি বেল্লিনির ছাত্র এবং ষোড়শ শতাব্দীতে ভেনিশীয় শৈলীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর 'শারিতা ভেনাস' [বর্তমানে স্টেট পিকচার গ্যালারি, ড্রেসডেনে সংরক্ষিত] বোধকরি প্রথম শারিতা ভেনাসমূর্তি (১৫০৮-১০); এবং প্রাথমীযুগের শেষ ভাববাহী ভেনাস [চিত্র-৪৭]। পশ্চাতপটের নিসর্গদৃশ্য নির্জন, বাস্তব এবং দিগন্তবিস্তৃত। ভেনাস-এর পরিত্যক্ত পোষাকের ভাঁজ নিখুঁত বাস্তব। শুধু এ বেন পুরোপুরি বাস্তব নয়, তার দীর্ঘায়ত এবং সুডোল প্রত্যঙ্গগুলি বেন চিরকাল প্রকৃতির সঙ্গেই ঐক্যতান রচনা করেছে।

গ্রীক শিল্পচেতনার 'ক্লিডিয়াম ভেনাস' যেমন ছিল সবকালীন 'ন্যাড' অনুভাবনার কেন্দ্রবিন্দু, রেনেসাঁ যুগে জর্জনে-অঙ্কিত এই শায়িতা ভেনাসও তেমন একটি মূল লক্ষ্যস্থল হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে তিজিয়ানোর 'ভেনাস', মানের 'অলিম্পিয়া', গইয়ার 'মাজা' থেকে বাবতীয় শায়িতা 'ন্যাড' সেখান থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়েছে; কখনও সম্ভানে, কখনও অজান্তে। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, জর্জনের ঐ ভেনাস-এর সঙ্গে তাদের প্রভেদ জাতিগত। কেন?

কারণ জর্জনের ভেনাস একটি ভাবধারার শেষ স্ববিনিকা। বস্তুচেলী যে নাটকের পটোস্তলন করেছিলেন সে-নাটক যেন উপসংহারে উপনীত হল জর্জনের তুলিতে। পরবর্তীযুগের ন্যাড ভিন্ন জাতির, ভিন্ন আবেদনের, ভিন্ন মেজাজের।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাঁর 'সিম্পোজিয়াম'-এ বলেছেন : ভেনাস দু-জাতের—Venus Coelestis এবং Venus Naturalis অর্থাৎ 'অপার্থিব ভেনাস' এবং 'প্রাকৃতিক ভেনাস'। প্রভেদটা যেন লক্ষ্যের সঙ্গে উর্বশীর। দুজনেই অসামান্য সূন্দরী, দু-জনেই সমুদ্র থেকে উদ্ধৃতা—তবু তাঁদের প্রভেদ প্রচণ্ড। প্রথম জাতের ভেনাস আমাদের অভিভূত করে, দ্বিতীয় আমাদের অন্তরে কামনা-বাসনার উদ্বেক করে। জর্জনের ভেনাস সেই হিসাবে—শেষবারের মতো Venus Coelestis; শেষ দ্বর্গার ভেনাস।

এই দ্বিতীয় জাতের ভেনাস, মরলোকের ভেনাস জন্ম নিল তিজিয়ানো বা টিংশিয়ান-এর তুলির প্রাস্তে 'আঁবিনো-ভেনাস' (চিত্র-৪৮)। আজিকের দিক থেকে, কম্পোজিশানের দিক থেকে দুটি ভেনাস যেন যমজ বোন। জর্জনে এবং তিজিয়ানোর ভেনাসে বাঁ-হাত, বামস্তন, চরণদ্বয়ের রেখাঙ্কনে আশ্চর্য সাদৃশ্য। কিন্তু অনুভূতির রাজ্যে ইতিমধ্যে যেন এক যুগান্তর ঘটে গেছে। তিজিয়ানোর ভেনাস নিদ্রিতা নয়—তার ঘুম ভেঙেছে; সে সুপ্রোখিতা। সে সজ্ঞান ন্যাড। এ নিদ্রা যেন ছিল জ্ঞানবৃক্ষের ফলাফলের অভ্যন্তর। এ ভেনাস ইন্ডের মতো জেগে উঠেছে। তার চোখের কোণায়, অধরের প্রান্তে কী যেন একটা ইঙ্গিত—যা ছিল না, এতদিনের এত এত ভেনাস-এ।

তিজিয়ানোর ভেনাস আর দেবী নয়, মানবী।

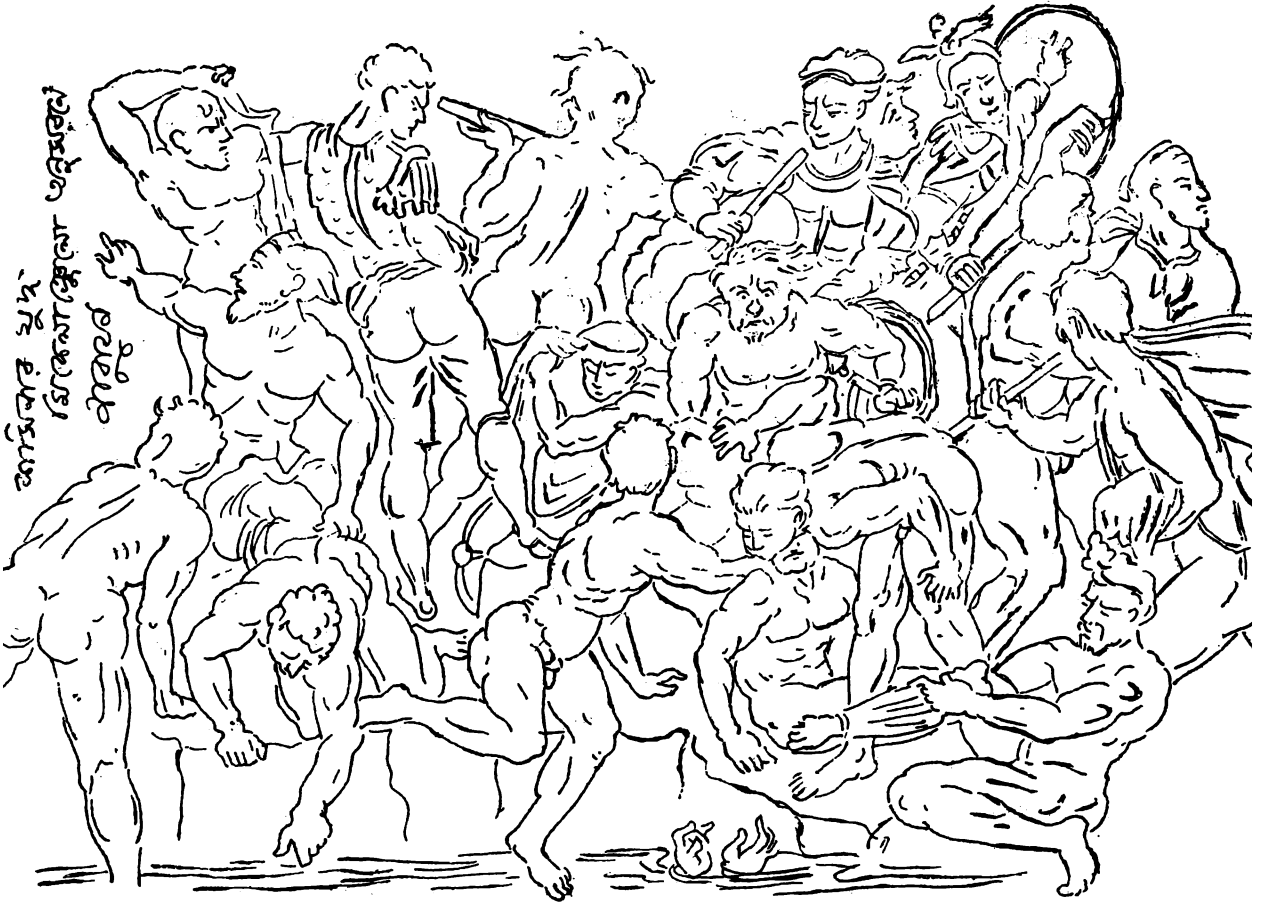
কাকতালীয় বলে মনে হলেও—তিজিয়ানোও ছিলেন ভেনিশীয়, বেলিনার ছাত্র, অর্থাৎ জর্জনের সহাধ্যায়ী। যেন সহপাঠীর ঐ চিন্তাধারাকে নস্যাক করতেই তিনি যতগুলি শায়িতা ভেনাস এঁকেছেন তারা প্রত্যেকেই সম্ভান-ন্যাড—প্রত্যেকেই সুডোল দেহাবয়বী, দৃঢ়গ্রীবী, ক্ষুদ্র-স্তনী, কিশোরী স্মৃতিভোদরা। যথা : 'অর্গানবাদক ও কুকুর সহ ভেনাস', 'অর্গানবাদক ও কিউপিডসহ ভেনাস' (উভয়েই মাদ্রিড সংগ্রহশালায় রক্ষিত), 'ভেনাস ও কিউপিড (উফিজি, ফ্লোরেন্স) ; অন্যান্য ক্ষেত্রেও নগ্ন নারীমূর্তির একই আঙ্গিক, যদিও তারা ভেনাস নয়; যথা-Bucchanal (1513), Danae, প্রভৃতি।

'ন্যাড' অনুচিন্তায় পরবর্তী পদক্ষেপে দেখতে পাওয়া গেল নারীদেহের সৌন্দর্যে তরঙ্গী হওয়া আর আবশ্যিক পুণ নয়; বৌবনভার-নরতা সেই স্থান নিল। এই ভাবধারার ভগ্নাংশ বোধকারি লিওনার্দো; কারণ পরবর্তী-যুগের 'ভলাপেরাস'-ন্যাডের প্রথম ইঙ্গিত লক্ষ্য করছি লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির 'লীডা ও মরাল' চিত্রে।

বস্তুচেলী যেমন ভেনাসকে নবজন্ম দান করেছিলেন সমুদ্রের তেউয়ে, লিওনার্দো তেমন তাকে এনে দাঁড় করালেন এই রূপ-রস শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় পৃথিবীতে। তার প্রতিটি প্রত্যঙ্গ বাস্তব, রক্ত-মাংস-স্বক গড়া। সান্তোনারালা ততদিনে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ইতিহাসের নেপথ্যে সরে গেছেন। সমাজ নতুন চোখে শিল্পকে বিচার করছে।

বিবর্তনের এই যে পরবর্তী ধাপ—বারবীর নয়, স্নায়বীর অনাবৃত নারীদেহ—বার সূচনা করলেন লিওনার্দো। তাঁর 'লীডা ও মরাল' চিত্রে, তা জর্জনে ও তিজিয়ানোর বাস্তবতাবোধের সোপান অতিক্রম করে ক্রমশঃ যেন ফটোগ্রাফিক হতে চাইল। মধ্যোক্ষমা ভাববাহিনী নয়, 'ভলাপেরাস'-সেই হল আদর্শ নারীর পুণ। বুবেলের অক্ষাংশ-রেসে-এর (চিত্র-৫০) সঙ্গে বস্তুচেলীর

খ্রি-গ্রেসেস্ (চিত্র—৫৭)-এর কালের দূরত্ব মাত্র একশ বছরের ; কিন্তু ইতিমধ্যে ন্যূড-ভক্ত দু দুটি ধাপ অতিক্রম করে গেছে । প্রথম ধাপ—বাস্তবতা ; দ্বিতীয় ধাপ : ‘ভলাপচুয়ান্সেস’—বার ঠিক বাঙলা প্রতিশব্দ খুঁজে পাচ্ছি না । অবশ্য ঐ দ্বিতীয় গুণটি যে সব শিল্পীর চোখেই আকর্ষণীয় মনে হয়েছে তা নয় । যেমন ক্লাসিকাল উদাহরণ অগরের লাসুস’ (চিত্র-৬৪) । তবু মোটামুটিভাবে বলা চলে, ঊনবিংশ কেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত ‘রিয়ালিজম’ই ছিল নগ্ন নারীদেহ রূপায়নের মূল ছন্দ । তারপর এল ফর্ম ভাঙার যুগ ।



চিত্র—৫৯

কাসিনার যুদ্ধ—মিকেলাঞ্জেলো

ন্যূডভক্ত : ইতিপূর্বে বলেছিলাম, ভারতীয় মিশুন-ভক্ত একটা পরিণতির দ্যোতনা, তার মূল উপজীব্য আবশ্যিকভাবে আদিরস, অপরপক্ষে পশ্চিমথণ্ডে ‘ন্যূড’ একটি মাধ্যম । তার মৌল আবেদন যৌনতা হতে পারে, আশার নাও পারে । ন্যূডের মাধ্যমে :আমরা পাচ্ছি, বীররস, ব্রূররস, করুণরস প্রভৃতি । ক্লেশবিক্র অথবা ক্লেশ থেকে সদ্য নামিয়ে-আনা ‘পীতা’র

অধিকাংশ শিম্পীর পরিকল্পনাতেই বীশু প্রায় অনাবৃত। মরণাহত বহু নরনারীর মূর্তি ন্যাড, সেখানে শুধু কবুণ রসেরই অবতারণা। গ্রীকসুগে ডিস্কোবোলাস, কুস্তিগীর, শিকারী, সৈনিক, অলিম্পিকের প্রতিযোগীরা সকলেই নগ্ন, কিন্তু তাতে বোনতা নেই। আবার হাজার বছরের ব্যবধানে রেনেসাঁ শিম্পীদেরও দেখাছি নগ্ন নরনারীর মূর্তি ও চিত্র উপস্থাপিত করতে, যেখানে বোনতার কোন আবেদন নেই।

তবু ভীক্স দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করলে আমরা কয়েকটি তথ্য পাব। যেমন ধরুন, রেনেসাঁর আদি সুগে মাসাচিও [The Expulsion of Adam and Eve from Paradise, 1427 A. D. ; South Maria del Carmine, Florence] অথবা পরে ভিজিয়ানো [The Fall of Man, C 1570 A.D. ; The Prada, Madrid] তাঁদের তৈল চিত্রে আদম-ঈভের বোনান্ন অলিভ-পাতার আড়ালে লুকাইত করেছিলেন, বস্তুচেন্নী তাঁর ‘ভেনাসের জন্ম’ বা অন্যান্য যাবতীয় নগ্ন নারীর ক্ষেত্রে সুকৌশলে ঐ শালীনতাতুর্কি বড়ায় রেখেছিলেন—অথচ মিকেলাঞ্জেলো সিসতিন-চ্যাপেলের সিলিঙে ঐ একই দৃশ্য আঁকতে আদম-ঈভকে পুরোপুরি নগ্ন করে এঁকেছেন। সিসতিন চ্যাপেলের ‘শেষ বিচার’ চিত্রে অসংখ্য নরনারী নগ্ন। ‘কাসিনার যুদ্ধ’ পরিকল্পনাটি দেখুন।—বিষয়বস্তুটার হয়তো কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন : ৪০ ॥

ফ্লোরেন্স নগরাধিপতির সঙ্গে পীসা-নগরীর অধিবাসীদের তখন একটা সংগ্রাম চলছে। ঘটনাটা ১৩৬৫ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল। ফ্লোরেন্স সৈন্যদলের একটা শাখা পীসা-নগরীর অনতিদূরে আর্গো নদীতে অবগাহনরত। সহসা সংবাদ এল শত্রুদল অতর্কিতে আক্রমণ করেছে। তৎক্ষণাৎ অর্ধরাত্রি সৈনিকেরা যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে নিচ্ছে। মিকেলাঞ্জেলো তাঁর শিম্পিকর্মে সেই ঋতুসূচকটিকে যেন একটা ম্যাপসটে ধরতে চেয়েছেন। ফলে বীররসই এখানে মৌল আবেদন। পেশীবহুল সৈনিকদের অনেকেই নগ্ন—বাস্তবতার দিক থেকে পুং-জননোন্ময়গুণি নিখুঁতভাবে আঁকা—তবু স্বীকার করতেই হবে এ শিম্পে বোনতার কোন আবেদন নেই। সমগ্র শিম্পিকর্মটির মৌল বস্তু ঐ একজোড়া হাতের মুদ্রায় যেন বিধৃত। আর্গোর জলে সম্পূর্ণ নিমজ্জমান একটি সৈনিক শুধু দুটি হাত তুলে যেন আকাশে আশ্রয় খুঁজছে। অতর্কিত আক্রমণে অপ্রস্তুত সৈন্যদলেরও তখন ঐ অবস্থা।

প্রশ্ন হতে পারে, মিকেলাঞ্জেলো এতগুলি ন্যাড কেন আঁকলেন। জবাবে বলা যায়, নগ্ন পেশীবহুল দেহে বীররস বেশি ভালভাবে ফোটে বলেই শিম্পী ওদের নগ্ন অথবা অর্ধনগ্ন করে এঁকেছেন।

আর একটি ক্লাসিকাল উদাহরণ ঐ শিম্পীর ‘দোনি তন্দ’। বিষয়বস্তু ‘হোলি ফ্যামিলি’। পীতর, মা-মেরী ও শিশু বীশু। কিন্তু পশ্চাতপটে দেখা যায় একসার ন্যাড—বহু দূরে বসে আছে। হোলি-ফ্যামিলির সঙ্গে ন্যাডের কি সম্পর্ক ?

মিকেলাঞ্জেলোর মূর্তিগুলি অধিকাংশই ন্যাড—ডেভিড, বাক্সাস, বন্দীরা প্রায় সবাই। আর একটি ক্লাসিকাল উদাহরণ নিয়ে বিচার করুন—ঐ সিসতিন চ্যাপেলেই আঁকা : মহাপ্রাণন। ৪৪ ॥

১৯৭৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ নগ্ন, বাইবেল-বর্ণিত ‘নোয়ার মহাপ্রাণন’। দেশ-কালের আশ্চর্য্য জমিন ফারাক ; কিন্তু মানুষের অনুভূতি, তার ব্যবহার, আত্মক-অসহায়তা-প্রেম অপরিবর্তিত। সেই প্রাণধারণের তাগিদে ছোটোছুটি, মই নিয়ে টানাটানি, সাঁত্রে ভীয়ে ওঠার প্রয়াস। এ-চিত্রে (চিত্র-৬০) পরিবেশ্য রস ‘ভয়ানক’—কিন্তু শিম্পীর তুলিতে সেই ভয়ানক রসকে ছাপিয়ে উঠেছে বাইবেলের মহামন্ত্রটি : Love thy neighbour।

বন্যাপীড়িত মানুষ শুধু নিজেরাই বাঁচতে চাইছে না, প্রতিবেশীকে উদ্ধার পেতে সাহায্য করছে। জননী তার সন্তানকে বুকে চেপে ধরে ভীয়ে উঠছে এ তো প্রত্যাশিত দৃশ্য ; কিন্তু ঐ যে যুবকটি তার আহত প্রতিবেশীকে কাঁধে করে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিচ্ছে ও-ই যেন সার্থক করে তুলেছে এই মহান দৃশ্যপটটি।

সে বাই হোক, ভয়ানক-বীভৎস-করুণ শাস্ত যে কোন রসই হোক, এ দৃশ্য পারিকল্পনার ধারে কাছে আদিরসের স্থান নেই। তবু মিকেলাঞ্জেলো একাধিক ন্যূনতম এঁকেছেন। বাস্তবতার প্রতি একান্তিক নিষ্ঠার শিশুকোড়ে জননী এবং প্রাণদানকারী



চিত্র ৬০

মহাপ্রাণন। মিকেলাঞ্জেলো

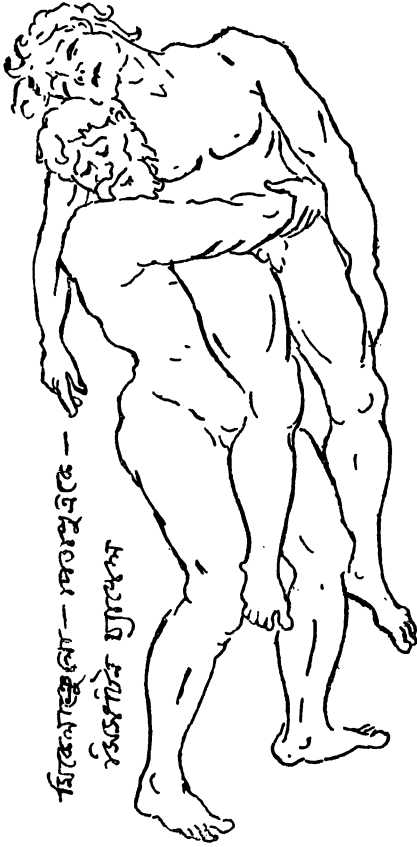
সুখকটির জননেত্রিয় এঁকেছেন। বস্ত্রপ্রাস্টো সামান্য একটু ঘুরিয়ে শালীনতা রক্ষা করা কতই না সহজ ছিল। কিন্তু না। তা করেননি শিল্পী, কারণ তিনি আপনার আমার মতো কোনও ‘অবসেশনে’ ভুগছেন না। ঐ চরিত্রগুলির নগ্নতার উপর সে জাতীয় কোন গুরুত্বই তিনি দিতে নারাজ। তুষারতীর্থ কেন্দ্রনাথে এক নাগা-সম্মাসীকে দেখে-ছিলাম, বিনি শীতকালেও সমতলভূমে নেমে আসেন না—নগ্নগায়্রে ঐ গুহার বসে থাকেন। সেই সম্মাসীটির কথা মনে পড়ে পড়ে বার মিকেলাঞ্জেলোর এই মানসিকতার ভৌল করণ্ডে বসলে। ঐ বৃহদায়তন চিত্রটির একটি খণ্ড দৃশ্য—যা চিত্র ৬০-এ ধরানো যায়নি তা পুনরায় এঁকেছি চিত্র ৬১-তে। দেখাছি, এক পঞ্চাশোধ্ব বৃদ্ধ পুত্রকে কোনক্রমে বহন করে নিয়ে চলেছে নিরাপদ আগ্রয়ে। আবেদন সেই

সেই একই : Love thy neighbour ! ‘জীবে প্রেম করে সেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।’

কিন্তু এ ক্ষেত্রেও শিল্পী যৌনতা বিষয়ে নিভাস্ত উদাসীন। অথচ বৃদ্ধের ডান হাতটা আর এক বিষয় নিচে দিয়ে গেলেই শালীনতা রক্ষিত হত।

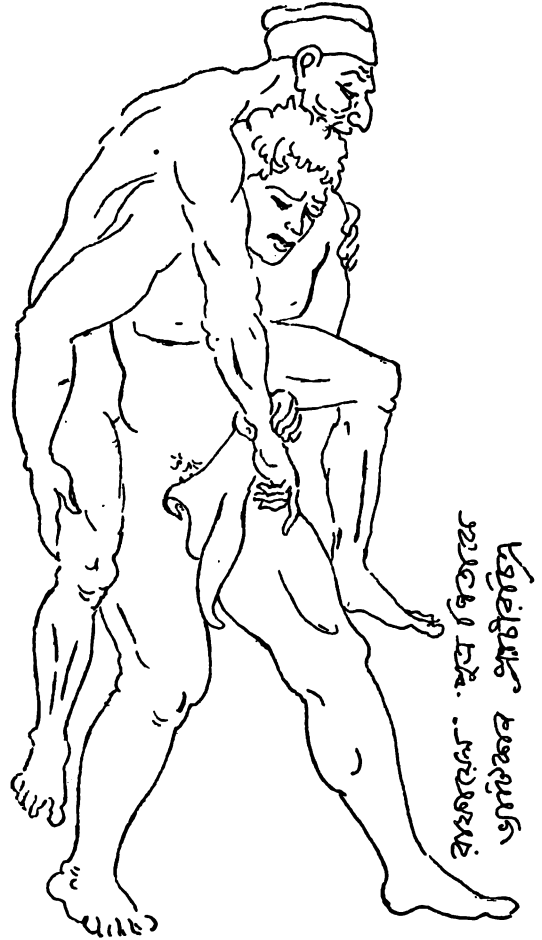
রেনেসাঁ যুগের আর এক দিক্‌পাল শিল্পী রাফায়েল ছিলেন মিকেলাঞ্জেলোর চেয়ে বয়সে আট বছরের ছোট। তাঁর উপর যখন ভ্যাটিকান চার্চের অপর একটি প্রাচীরে ভৈলচিত্র অংকবার দায়িত্ব বর্ভালো, তখন রাফায়েল যেন অগ্রজপ্রতিম মিকেলাঞ্জেলোর প্রশ্নের জবাব দিলেন। মিকেলাঞ্জেলো বলতে চেয়েছিলেন : সম্মানের মধ্যে দিয়েই মানুষ বাঁচতে চায়, তাই

নিজ জীবন বিপন্ন করেও ঐ বৃদ্ধ তার ভবিষ্যৎকে কাঁধে করে নিয়ে চলেছে। রাফায়েল যেন তার জবাবে বলতে চাইছেন—
মানুষ শুষ্ট ভবিষ্যতের জন্যই লালায়িত নয়, অতীতের প্রতিও সে প্রকৃষ্ট। তাই তিনি অঁকলেন একটি চিত্র—পুত্র পিতাকে



চিত্র—৬১

মিকেলাঞ্জেলো



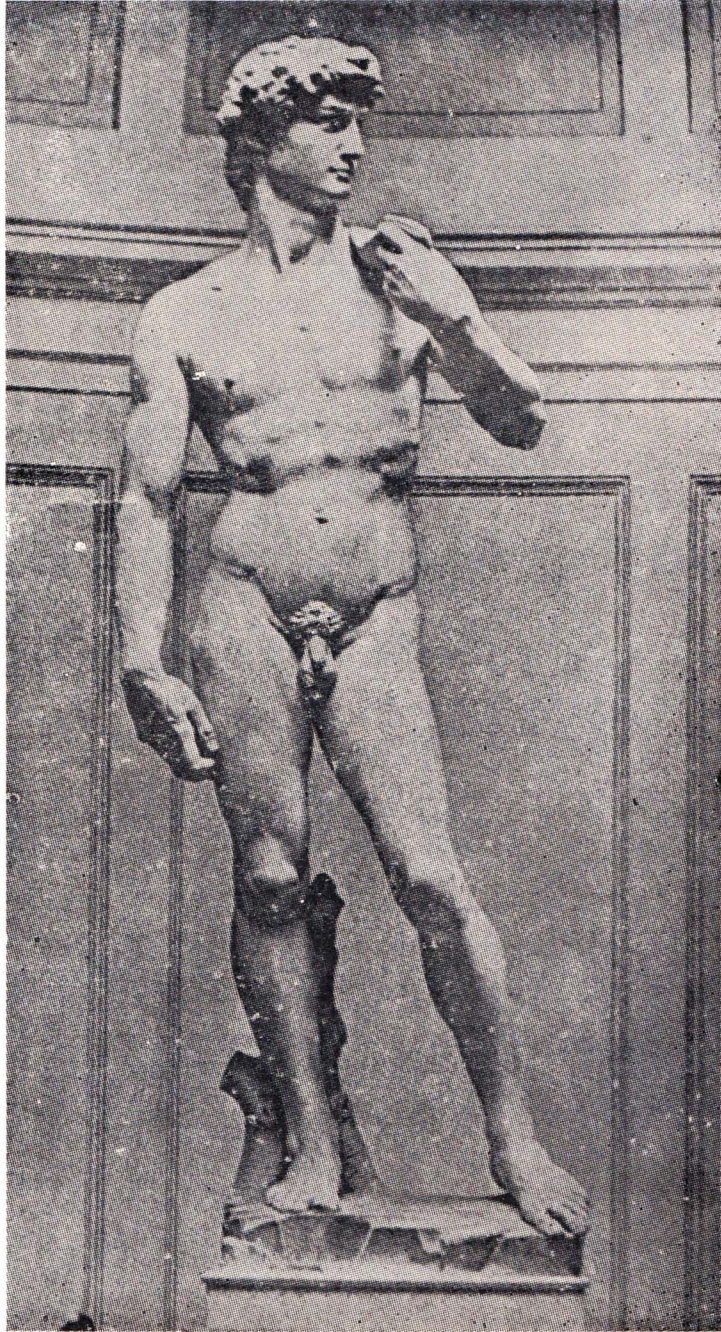
চিত্র—৬২

রাফায়েল

বহন করে নিয়ে চলেছে (চিত্র—৬২)। না; মহাপ্রাণন নয়, রাষ্ট্রবিপ্লবে প্রোজান বীর এনিয়াস্ পশু বৃদ্ধ পিতাকে জঙ্কে বহন করে নিয়ে চলেছেন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

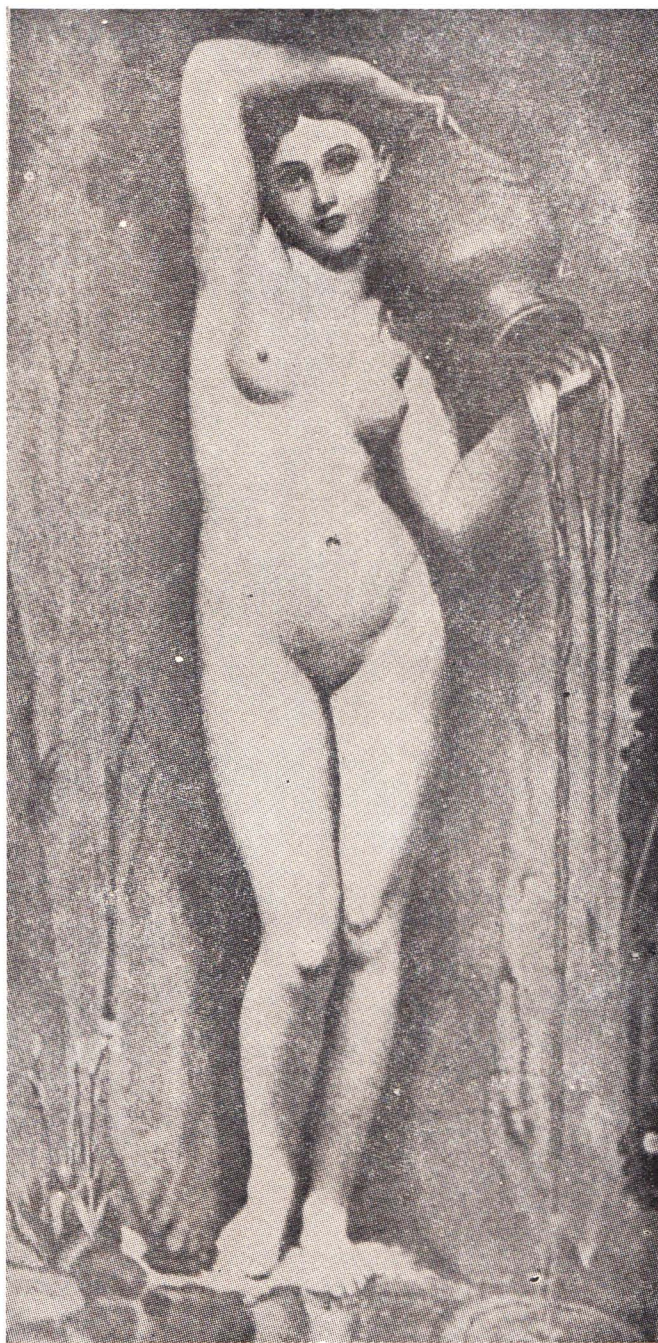
লক্ষণীয়, যে প্রস্তাব পূর্ব উদাহরণে রেখেছিলাম, রাফায়েল সেটি মেনে নিয়েছেন। যুবকের অঙ্গসৌষ্টব দেখাতে প্রচলিত পদ্ধতিতে ন্যূন অঁকলেও তিনি সুকৌশলে বস্ত্রপ্রাস্তি ঘুরিয়ে শালীনতা রক্ষা করেছেন।

তাহলে কি ধরে নেব—যোনিঙ্গ রূপায়ণে ভারতবর্ষের দৃষ্টভঙ্গি যেমন ‘অবজেক্টিভ’—জৈন-তীর্থঙ্করদের বাবতীর মূর্তি
মিথুন—১০



চিত্র : ৬৩

‘ডেভিড’—মিকেলান্জেলো



୧୪୫ : ୬୫

‘ଲା ସୁସ୍’—ଆଗରେ

feeling, even though it be only the faintest shadow—and if it does not do so, it is bad art and false morals.” ॥ 46 ॥

অনুবাদে যার ভাবার্থ : স্বীকার করতে হবে, স্মৃতি ও অনুভূতির নিরিখে রুবেন্স ও রেনোয়'র অনেকগুলি ন্যূড 'বস্তুতাত্ত্বিক উপাদানে গঠিত'। যেহেতু ঐ শব্দগুলি একজন প্রখ্যাত দার্শনিকের উদ্ভিষ্ট এবং বহুল-প্রযুক্ত উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহৃত তাই এক্ষেত্রে সহজ সত্যটা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। আমরা স্বীকার করতে বাধ্য—ন্যূড মায়েই, তা যতই বিমূর্তভাবে অ'কা হোক না কেন, দর্শকের মনে যৌন অনুভূতির ক্ষীণ আভাস ফুটিয়ে তুলবে। হয়তো সে অনুভূতির ছায়াপাত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ; তা হোক—যদি সেটুকুও না করতে পারে, তবে বলব : ঐ নগ্ন চিত্রটি নিকৃষ্ট শিল্প এবং ভ্রান্ত নীতির।”

দুই দিকপাল শিল্প-সমালোচক যেন ললিতকলা-ভূমণ্ডলের দুই ভিন্ন মেঝু-প্রান্তবাসী। কটুর নীতিবাগীশ আলেকজান্ডারকে সমর্থন করবেন, য'ারা উদার মতাবলম্বী এবং বাস্তবানুগ, তাঁরা বলবেন, বাস্তবসত্যকে অস্বীকার করে লাভ কি ? ক্লার্ক-সাহেবই ন্যায্য কথা বলেছেন।’

আমি বলব, দুজনেই কিন্তু একটা 'ভেরিয়েবল্'কে 'কনস্ট্যান্ট' বলে ধরে নিয়েছেন, অর্থাৎ পরিবর্তনশীলকে ধ্রুবক হিসাবে। দু-জনেই আংশিক সত্যে উপনীত মাত্র—নিউটনীয় সত্য—আপেক্ষিকতার মূল্যায়নে যার নতুনভাবে বিচার হওয়া উচিত। বিশ্ববিখ্যাত দুই সমালোচকের সম্বন্ধে আমার এ মন্তব্যে যদি ধৃষ্টতা পেয়েছে বলে মনে করেন, তবে আমার বক্তব্যটাও শুনুন ; কিন্তু সেই বক্তব্যটা দাখিল করার আগে একটা গম্প বলি ; মহাভারতের কাহিনী :

কশ্যপবংশীয় মহামুনি বিভাণ্ডক তাঁর আশ্রমপ্রাপ্তে একদিন সম্পূর্ণ নির্জনে গঙ্গাস্নান করছেন। সহসা নৃপুর্নিনক্লগ-ধ্বনিতে সচকিত হয়ে তিনি লক্ষ্য করেন, নদীর পরপারে সুরসুন্দরী অঙ্গরা উর্বশী এসেছেন অবগাহন মানসে। গঙ্গাতীরে বিবিস্ত। উর্বশী চারিদিকে দৃকপাত করে নির্জনতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে একে একে তাঁর অঙ্গাবরণ খুলে রাখলেন এবং সম্পূর্ণ নগ্নিকা অবস্থায় জলে নামলেন। জিতেন্দ্রিয় সম্যাসীর মনঃসংযম ব্যাহত হল। উপলব্ধি করলেন, উর্বশীর যৌবনদুগ্ধ রূপ-লাবণ্য বস্তুতাত্ত্বিক উপাদানে গঠিত। তিনি কোনও সাড়াশব্দ করলেন না। বৃক্ষান্তরাল থেকে সেই নিরাবরণা যৌবনবতীর সান্নিধ্য রূপসুখা নয়নেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আকর্ষণ পান করতে থাকেন। অবগাহান্তে উর্বশী তীরে উঠে অঙ্গ মার্জনা করলেন এবং নিতান্ত খেয়ালবশে নৃত্যরঙ্গ শুরু করলেন। বিভাণ্ডকের পক্ষে আর আত্মসংবরণ করা সম্ভবপর হল না। আকর্ষণ নিমজ্জিত অবস্থায় ঋষির রেতঃপাত হয়ে গেল।

পুরাণের কাহিনী। এখানে গম্পের গরুর বৃক্ষশাখায় অধিরোহণের 'ভিসা' আছে। কাহিনী অনুসারে, এক মৃগী সেই রেতঃ-মিহ্রিত গঙ্গোদক পান করে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। কিছুদিন পরে সেই হরিণীর গর্ভে জন্ম নিলেন ঋষাশৃঙ্গ মুনি। তিনিও কালে জিতেন্দ্রিয় সম্যাসী হয়ে উঠলেন। ঋষাশৃঙ্গ যখন তরুণ তাপস তখন অঙ্গ দেশে হল অনাবৃষ্টি-জ্বলিত দুর্ভিক্ষ। রাজ-জ্যোতিষী বললেন, মহাতপা ঋষাশৃঙ্গ মুনি যদি অঙ্গরাজ্যে এসে যজ্ঞ করেন তাহলেই আকাশে মেঘসঞ্চার হবে, অনাবৃষ্টি বিদূরিত হবে। সে-কথা শুনে অঙ্গদেশাধিপতি লোমপাদ তাঁর রাজ্যের কয়েকজন পরমাসুন্দরী বারবানিতাকে পাঠিয়ে দিলেন ঋষাশৃঙ্গ মুনির আশ্রমে। ঋষির তপোবনে উপনীত হয়ে সেই বারবানিতার দল নৃত্যগীতের মাধ্যমে মহাতপা ঋষাশৃঙ্গের তপোভঙ্গে প্রাণপাত করতে থাকে। তরুণ তাপসের কোনও ভাবান্তর না হওয়ায় নিরুপায় জনৈক নর্তকী একে একে খুলে ফেলতে থাকে তার লাজবস্ত্র—চীনাংশুক, অঙ্গরাখা, কণ্ঠমূলিকা, মেখলা। নগ্ননৃত্যে ঋষিকে সে বোধকরি বোঝাতে চাইল ; তার রূপযৌবন 'বস্তুতাত্ত্বিক উপাদানে গঠিত'।

বার্থ হল সে। ফিরে এসে রাজমন্ত্রীকে মেরোট বৈ-কথা বলেছিল তা নিশ্চয়ই আপনাদের স্মরণে আছে : ‘ধনী তোমারে হে রাজমন্ত্রী, চরণপদে নমস্কার। ফিরে লও তব স্বর্ণমুদ্রা, ফিরে লও তব পুরস্কার ॥’

কাহিনী এইটুকুই। এবার আমাদের বক্তব্য : নৃত্য একটি শিল্পকর্ম। কাহিনীতে আমরা দু-দুটি নৃত্যশিল্পের উপস্থাপনা দেখেছি। দুটিই নগ্নকার—যাকে ইংরাজীতে বলে nude dance : নগ্ন-নৃত্য। অথচ দুটি নৃত্যের উদ্দেশ্য, প্রেরণা এবং দর্শকের উপর তার প্রতিক্রিয়ায় আশ্মান-জমিন ফারাক। উর্বশীর নৃত্য ছিল নিতান্ত খেলালখুশীর—আত্মরতিমূলক, দর্শক নিরপেক্ষ এবং ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত, নিতান্তই প্রাণের উচ্ছ্বাসে। শিল্পীর অন্তরে অকুস্থলে উপস্থিত ছিল এক দর্শক। শিল্প দর্শনে তাঁর কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা আমরা জেনেছি।

অপরপক্ষে অঙ্গদেশের সেই হতভাগিনী জনপদবধূর নগ্ননৃত্য ছিল নিতান্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত—পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এক জিতোন্ময় দর্শককে কামনা-জর্জরিত করা। তার প্রতিক্রিয়াও আমরা দেখেছি : ঋষাশৃঙ্গকে তা আদৌ বিচলিত করেনি।

এবার বিচার করার পালা। দার্শনিক আলেকজান্ডারের সূত্র-অনুসারে :

(ক) নির্জন উপবনে উর্বশীর আনন্দ-নৃত্য false art and bad morals (দ্রষ্ট শিল্প এবং নিকৃষ্ট নীতির)
যেহেতু the nude is so treated that it raised in the spectator ideas or desires appropriate to the material subject (নগ্ননৃত্য এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল যাতে দর্শকের মনে কামনা-বাসনা জাগায়)।

(খ) অপরপক্ষে অঙ্গদেশের বারবানিতার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নগ্ননৃত্য আদৌ দ্রষ্ট শিল্প অথবা দ্রাস্ত নীতির নয় ; কারণ আলেকজান্ডার সাহেবের এ্যাসিড টেস্টে দেখা গেছে দর্শকের চিন্তে তা কামনার ভাব জাগাতে পারেনি।

কী ? মানতে পারছেন ?

এবার ক্লার্ক-সাহেবের বক্তব্যটা বিচার করুন। মনে করুন, ঐ কাহিনীর প্রথমদৃশ্যে গঙ্গানন্দ করছিলেন বিভাগিক নন, মহাতপা ঋষাশৃঙ্গ স্বয়ং। সে ক্ষেত্রে আমরা অনুমান করতে পারি,—নিরাবরণা উর্বশীর নির্জন-নৃত্য দর্শনেও ঋষাশৃঙ্গ আপন মনে বলে উঠতেন, “আনন্দময়ী মুরতি তোমার, কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা/অমৃত সরস তোমার পরশ তোমার নয়নে দিব্য বিভা ॥”

এবং সে-ক্ষেত্রে কেনেথ ক্লার্কের সূত্র অনুযায়ী উর্বশীর সেই স্বতঃস্ফূর্ত ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত নৃত্য—যা দর্শনে দর্শক বিমল আনন্দলাভ করলেন, তা হয়ে যেত ‘নিকৃষ্ট শিল্প’ এবং ‘দ্রাস্ত নীতি’র। যেহেতু ঋষাশৃঙ্গের অন্তরে ঐ নৃত্য ‘vestige of erotic feelings’ (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যৌন অনুভূতি) জাগাতে পারত না।

সেটাই বা মনে নিতে পারছি কই ?

বক্তব্যটা জোরদার করতে আর একটি কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে : জাতক-কাহিনী।

বোধিসত্ত্ব জিতোন্ময় মহাজনক তখন মিথিলার নৃপতি। রাজমহিষী সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা সীবলীর প্রতি তাঁর ব্যবহার ভগ্নীর প্রতি জ্যেষ্ঠভ্রাতার মতো। সীবলী বলে, তুমি কি আমাকে পেয়ে সুখী হওনি রাজা ?

‘মহাজনক বলেন, তোমার স্নেহের মন্দাকিনীতে অবগাহন করে আমি ধন্য হয়েছি সীবলী। মনে হয়, আমার নিজের ভগ্নী থাকলেও আমাকে এত স্নেহ করত না।

‘সূর্যোদয়ে পূর্ণেন্দুর মতো স্নান হয়ে যায় রাজবধূ।

‘মন্দভাগিনী অনুভব করে আর বিলম্ব করা অনুচিত। মধুমাসের এক পূর্ণিমারাত্রে সে যেন প্রগল্ভা বারবানিতার

মতো উদ্দাম হয়ে ওঠে। প্রসাধনদক্ষার রূপসজ্জাকে নিক্ষেপ করে দূরে। খুলে ফেলে রজাস্বর পটবস্ত্র, ময়ূরকাষ্ঠিবর্ণা মেখলাবাস, অন্তর্বাসের চম্পকচীনাংশুক। সদ্যোন্নাতা নিরাবরণার বেশে সজ্জিত করে অনিন্দ্যসুন্দর বরতনু। মণিস্তবাকিত বেণীতে দেয় ইন্দ্রনীলের চম্পকণা, কনুকে দুলিয়ে দেয় মৌক্তিকনিব্বর শতনরী, অপাবৃত গুরুনিতম্বে কুলিয়ে দেয় মাণিক্য খচিত স্বর্ণ মেখলা।

“মণিদীপজলা প্রমোদকক্ষে রত্নসিংহাসনে যেখানে প্রতীক্ষা করছিলেন মহাজনক, ধীরপদে সেখানে এসে দাঁড়ায়। অপাপবিদ্ধ দুটি মুগ্ধ নয়ন তুলে মহারাজ দেখতে থাকেন এই অপবুপা নারী মূর্তিটিকে—নিরাবরণার সফট লাজনম্র ভঙ্গী। সীবলী বসে পড়ে তাঁর পাশে—লুটিয়ে পড়তে চায় আল্পেষশয়নে; কিন্তু দেখতে পায় উদাসী আনুমনা হয়ে গেছেন মহারাজ।

“আর্তকণ্ঠে রত্নাতুরা সীবলী বলে, আজ আমাকে দেখে তোমার মনে কোন কামনা, কোনও বাসনা জাগছে না, মহারাজ ?

“দূর-দিগন্তে-নিবন্ধ-দৃষ্টি রাজর্ষি বলেন, জাগছে সীবলী। ইচ্ছা করছে আমার মন্দিরের দেবীপীঠে বসিয়ে তোমাকে আজ পূজা করি !”

“যেন এক আর্ত হাহাকারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়ে সীবলী। এতক্ষণে মনে হয়, সে রতিমন্দিরের তীর্থযাত্রিনীর মতো নয়, সে প্রগল্ভা বারবনিতার মতো নম্রিকা। দু-হাত বাড়িয়ে হতভাগিনী খুঁজতে থাকে তার লাজবস্ত্র।” ॥ ৪৭ ॥

মধুমাসের পূর্ণিমারাত্রে রত্নাতুরা সীবলীর সেই অঙ্গসজ্জাকে যদি একটি শিম্পকর্ম বলে ধরে নিই, তাহলে তার সেই নগ্নসৌন্দর্যের প্রতিবেদন কি নিকৃষ্ট শিম্প অথবা ভ্রান্তনীতির ? যেহেতু ক্লার্ক-সাহেবের ‘এ্যাসিড-টেস্ট’ অনুসারে দর্শকের মনে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যৌনকামনার ক্ষীণ আভাস পর্যন্ত জাগিয়ে তুলতে পারল না ?

এতকথা বলছি শুধু এইটুকু নিবেদন করতে যে, শিম্পবস্ত্রতে যৌনতার পরিমাণ নির্ভর করে দুটি মানসিকতার পারস্পরিক প্রতিস্পর্শে। শিম্পীর ও সমজদারের। শিম্প মাত্রেরই যোগের সাধনা ! শুধু ভাস্কর্য নয়, ললিতকলার যাবতীয় শাখার বিষয়েই এ-কথা প্রযোজ্য—চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, মণ্ডাভিনয়, সাহিত্য, যাত্রা, নৃত্য, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র। শিম্পস্রষ্টার মর্মমূলে যে ভাবের উপস্থিতি দর্শক বা শ্রোতার অন্তরে তার সংক্রমণেই শিম্পের সার্থকতা। শিম্প কী ? শিম্পীর সূচিমুখ গঙ্গোদ্রী থেকে উদ্ভূত রসজাহ্নবীর সমজদারের গঙ্গাসাগরে উত্তরণ। রসায়নবিদের কাছে যা ‘পসেটিভ-ক্যাটালিস্ট’, প্রযুক্তিবিদের কাছে যা ‘গ্যায়ার’, বৈজ্ঞানিকগণের কাছে যা ‘হাইফেন’ এবং গণিতজ্ঞের কাছে যা ‘সমীকরণ চিহ্ন’—শিম্পীর কাছে শিম্পও তাই। একটি বাহকমাত্র। কোনও বাস্তব বা কম্পিত অভিজ্ঞতায় শিম্পীর স্পর্শকাতর অন্তরে একটা অনুরণন জাগল ; প্রকাশের যন্ত্রণায় সেই অনুভূতিটা বৃহত্তর-ক্ষেত্রে বিতরণ করার প্রয়োজনে তিনি একটা মাধ্যম বেছে নিলেন ; এবং দেখা গেল শিম্পীর অপরিচিত একদল দর্শক বা শ্রোতা, হয়তো তাঁরা ভিন্ন দেশের, ভিন্ন কালের, এবং আৱশ্যিকভাবে তাঁরা ঐ বাস্তব-প্রতীতির সন্ধান পাননি, তবু ‘মাধ্যম’ের ইন্দ্রজালের কম্পিত পরিমণ্ডলে একই ভাবের, একই রসের অনুরণনে অনুদানিত হচ্ছেন। তা যখন হয়, তখন ঐ ‘মাধ্যম’কে বলি শিম্প, বলি ললিতকলা। শিম্পী-নিরপেক্ষ যেমন শিম্প হতে পারে না, তেমনি সমজদার ষ্টিতরেকও তা সম্পূর্ণ নয়। ললিতকলার এই যে উপবৃত্তাকার রূপ—দু-দুটি ‘ফোসাই’-দ্বারা শিম্পজগত যে বিধৃত, এই মৌল তত্ত্বটা না খেয়াল করেছেন আলেকজান্ডার, না ক্লার্ক। ওঁরা ধরে নিয়েছেন শিম্প একটি বৃত্ত, যার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে শুধু দর্শক। তাই দুজনেই ‘ন্যূড’কে বিচার করতে চেয়েছেন দর্শকের প্রতিক্রিয়ার মানদণ্ডে। এবং ধরে নিয়েছেন দর্শকের যৌন-অনুভূতি একটি ধ্রুবক। আমার মতে ভ্রান্তিটা সেখানেই। কোন একজন দর্শকের উপরে প্রতিক্রিয়া না হলেও সেটি নিকৃষ্ট শিম্প ও ভ্রান্ত নীতির হতে পারে—যেমন হয়েছিল অঙ্গদেশের বারবনিতার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত উলঙ্গ-নৃত্য। আবার দর্শকের মনে কোন যৌন-অনুভূতি জাগ্রত না করলেও—ক্লার্ক-সাহেব যাই বলুন, তা উৎকৃষ্ট শিম্প ও সুনীতির হতে পারে ; যেমন হয়েছিল সীবলীর সলজ্জ নিরাবরণতা। অপরপক্ষে দর্শকের অন্তরে কামভাব জাগ্রত করা সত্ত্বেও শিম্পসৃষ্টি

সুনীতির নিদর্শন হতে পারে—আলেকজান্দার-সাহেব যাই বলুন, যেমন হয়েছিল উর্বশীর ‘নারীসশাসী’ প্রেরণায় বিবিক্ত বিবস্ত্র-নৃত্য।

সহজ কথায়, লালিতকলার কোনও নিদর্শন নিকৃষ্ট শিল্প/ভ্রান্ত নীতির অথবা নিকৃষ্ট নীতি/ভ্রান্ত শিল্পের হয়েছে কি হয়নি বুঝে নিতে হলে আমাদের একটি ‘কোয়ালিটিক ইকোয়েশন’ বা ষিমুল সমীকরণের অঙ্ক করতে হবে। তার দুটি ‘রুট’ বা পরিবর্তনশীল অধুবক—এক : শিল্পীর মানসিকতা,—তার উদ্দেশ্য, প্রেরণা, উপস্থাপনের শৈলী; এবং দুই : ‘সাধারণ’ দর্শকের উপর তার প্রতিক্রিয়া। সেই সাধারণ দর্শকের মানসিকতা, তার শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা, তার বোধশক্তিতে কী-জাতের অনুবাদ জন্ম নিল, তার কেমন লাগল।

এ-ক্ষেত্রে ঐ ‘সাধারণ’ বিশেষণটি সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধ্যশৃঙ্গ মুন বা বোধিসত্ত্ব মহাজনকের বোধের নিরিখে কবলে অঙ্কের শেষ ফলাফল ভ্রান্ত হবে না। বিচার করতে হবে যে সামাজিক বাতাবরণে শিল্পী ঐ শিল্পবস্তুটি রূপায়িত করেছেন সেই, বা অনুরূপ সমাজের রীতি-নীতিতে পুষ্ট সাধারণ বুদ্ধিমান দর্শকের অনুভূতিতে। শিল্পী ও গড়-দর্শক যদি সামাজিক নীতিবোধের একই সমতলে দাঁড়িয়ে না থাকেন, তাহলেও অঙ্কটা ভুল হতে পারে।

যেমন প্রায়ই হয়, কলিঙ্গ খাজুরাহোর মিথুনমূর্তির প্রসঙ্গে আজকের দর্শকের।

বারো ॥ মৈথুনরত মিম্বুন ॥

এতক্ষণে আমরা মৌল-সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে এসে উপনীত হয়েছি ;—‘মিথুনবাদ’ থেকে ‘মৈথুনবাদ’-এ ।

কারণ এই ‘মৈথুনরত মিম্বুন’ বাহির্ভারতীয় শিম্প প্রকাশ্য অনুমোদন পাননি । গোপন সংগ্রহের কথা বলছি না, না হলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন যুগে ধনকুবেরদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে এ জাতীয় শিম্পবস্তু ছিল এবং আছে, একথা অনস্বীকার্য । মধ্যযুগে ইতালির নেপলস্ শহরে ধনবানদের আগ্রহে একটি ‘ইরটিকা’ সংগ্রহশালাও গড়ে উঠেছিল । এ জাতীয় যৌনতা-ব্যাঞ্জক শিম্প ধর্মীয় কারণে আছে নেপালে, তিব্বতের গোপন গুম্ফায়, আছে খাশ্ কলকাতাতেও পুলিশের নজর এড়িয়ে ব্যক্তিগত সংগ্রহে । ‘ব্লু-ফিল্ম’ নামে প্রদর্শিত এ জিনিস কলকাতা-দিল্লী-বোম্বাই কোথায় নেই? কিন্তু না, শুধু গোপন নয়, আইনের অনুমোদনসহ এ জাতীয় ফটোগ্রাফ ও কম্পিত চিত্র পশ্চিমবঙ্গের অনেক দেশে, জাপানে, হংকঙে প্রকাশ্যে কিনতে পাওয়া যায়, চলচ্চিত্রে দেখানো হয়—নরওয়ে, সুইডেন, হল্যান্ড, ডেনমার্ক এবং আরও অনেক-অনেক সুসভ্য দেশে । সে-সব দেশের চিন্তাবিদ তথা রাষ্ট্রনায়কেরা সেগুলিকে শিম্পপদবাচ্য বলে দাবী করেন না ; বরং তাঁরা বলেন, এগুলি স্বাস্থ্যকর, যুব-মানসের অবদমন থেকে মুক্তির তীর্থক-পন্থা । ভারতবর্ষে মধ্যযুগে কিন্তু তা হয়নি, সেখানে সামাজিক তথা শৈল্পিক অনুমোদনসহ এ জাতীয় বিষয়বস্তু মন্দিরগায়ে প্রকাশ্যে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল ।

একেবারে আদিযুগে এ অনুভাবনাটিকে যে আপত্তিকর মনে করা হত না, তা আমরা দেখেছি । প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে মিশর কিছুটা রক্ষণশীল ছিল । কিন্তু গ্রীস, রোম ও চীন-সংস্কৃতিতে এর যথেষ্ট উদাহরণ আছে । আছে আফ্রিকার প্রাচীন সভ্যতাতোও । কলোম্বাসের অ্যামেরিকা আবিষ্কারের পূর্বযুগে অর্থাৎ যুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসার পূর্বকালে পেরুতে প্রাপ্ত একটি শিম্পনিদর্শন চিত্র—৫৩-এ দেখানো হয়েছে । একটি ভুঙ্গার । পানীয় সরবরাহের জন্য এ পাত্রটির প্রকাশ্য ব্যবহারে কোনও সঙ্কোচ বোধ করেনি কেউ । যুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসার পরবর্তী যুগে, পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার শিম্পবোধে যুরোপীয় রীতিনীতির প্রভাবে এ জাতীয় শিম্প নির্মাণে শিম্পী স্বতই সঙ্কোচবোধ করেছেন ।

যুরোপীয় সভ্যতা তথ্য শিম্প-সংস্কৃতির আদিগুরু গ্রীস । গ্রীক শিম্পীদের মানসিকতায় নন্দন-তত্ত্ব কীভাবে ‘ন্যাড’ অনুভাবনার রূপান্তরিত হয়ে ওঠে সেকথা পূর্ব-অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে । সেখানে যে কথা আলোচনা করা হয়নি তা হচ্ছে এই :

গ্রীক শিম্প-জাহ্নবীর মূল ধারাটিকেই আমরা সেখানে অনুসরণ করে এসেছি, কিন্তু এ স্রোতধারার সমান্তরালে প্রবাহিত আর একটি বিশেষ উপ-ধারার কথা সেখানে বলা হয়নি । গ্রীক শিম্পীর দল সাধারণভাবে উগ্র যৌনতাব্যাজক রসকে পরিহার করলেও সেজন্য একটি বিশেষ শাখা সৃষ্টি করেছিলেন—ঠিক যেমন কলিঙ্গ খাজুরাহাতে একটি বিশেষ সময়কালে উগ্র যৌনতা-বোধকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল । গ্রীক শিম্পচিত্রায় এই বিশেষ শাখাটিকে ওঁরা বললেন ‘ইরটিকা’ । পম্পাই ও হার্নিকউ-লেনিয়ামে ধনবানদের অর্থানুকূলে ও আগ্রহে গড়ে উঠল দুটি ‘ইরটিকা মিউজিয়াম’ । সেখানে শুধু উগ্র-যৌনতাপ্রয়ী শিম্পবস্তুই সংগৃহীত হত । আমরা যাকে ‘মৈথুনরত-মিম্বুন’ বলছি তার অসংখ্য নিদর্শন সেখানে ছিল । এ সংগ্রহশালা কিন্তু ধনবানদের গোপন বা ব্যক্তিগত সংগ্রহ নয়—রীতিমতো সাধারণের জন্য : পাব্লিক ইন্সটিটিউশন । ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে বখন পম্পাই ও হার্নিকউলেনিয়াম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐ দুটি সংগ্রহশালাও ভূগর্ভে চলে যায় । মধ্যযুগে সেই ধ্বংসস্তূপ খনন করে অনেকগুলি মূর্তি ও চিত্র উদ্ধার করা হয় এবং নেপলস্ শহরে একটি নতুন সংগ্রহশালা নির্মাণ করে সেগুলি সংরক্ষিত হয় ।

এই মিউজিয়ামটি এখনও বর্তমান, যদিও বর্তমানে শুধু শিম্পী ও শিম্পরাসিকদেরই তা দেখতে দেওয়া হয়, সাধারণ দর্শনার্থী নরনারীকে নয়।

যাঁরা অভিযোগ করেন যে, উগ্র-বৌনতাবোধে এবং ‘মৈথুনরত-মিথুন’ প্রদর্শনে ভারতবর্ষ বিশ্বশিঙ্গে এক ব্যতিক্রম, তাঁদের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে বলব, নেপল্‌স্-এর ঐ সংগ্রহশালার অধিকাংশ মিথুন-মূর্তি উগ্র বৌনতাবোধের বা তথাকথিত অশ্লীলতার মাপকাঠিতে কোনারক খাজুরাহোর অশ্লীলতম প্যানেলকে অনেক অনেক পিছনে ফেলে যাবে। তার একটিই হেতু। ইরটিকা সংগ্রহশালার অধিকাংশ নায়কমূর্তির আদর্শ—এ্যাপোলো নয়, মার্কাস নয়, মাস্‌ নয়, শুধু মাত্র ‘প্রায়াপাস্’। আগেই বলেছি, ‘প্রায়াপাস্’ সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা আফ্রোদিতির সন্তান হওয়া সত্ত্বেও কুৎসিত-দর্শন এবং গ্রীক পৌরাণিক কম্পনায় তার জননেত্রিরূপি ছিল সুবহু ও নিয়ত-উৎখিত। সেজন্য ইরটিকা-সংগ্রহশালার মৈথুনরত মিথুনে ক্ষেত্রবিশেষে নায়কের পুরুষাঙ্গটিকে দৈর্ঘ্যে তার দেহ-দৈর্ঘ্যের একতৃতীয়াংশ এবং স্থূলতায় তা মূর্তির জানুর চেয়ে বেশি করা হয়েছে। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে—গ্রিমাতিক মূর্তিতে, অর্ধোৎকীর্ণ (অল্টো-রিলিভো) প্যানেলে এবং তেলরঙে অঁকা ছবিতে। প্রায়াপাসের অনুরূপ কোন অনুভাবনা ভারতীয় পুরাণে না থাকায় বীভৎস-রসের পাল্লায় খাজুরাহো-কোনারক অশ্লীলতার দৌড়ে দুই পিছনে পড়েছে।

দ্বিতীয়ত গ্রীকশিল্পে—ইরটিকা বিশেষ শাখায় নয়—সাধারণ শিল্পচিন্তায়, আদিরসের সঙ্গে বীররস ওতঃপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল। আশ্চর্যের কথা, মৈথুনদৃশ্যের সিংহভাগ সেখানে বলাৎকার দৃশ্য। বলাৎকারের মধ্যে বীররসের কোনও স্থান নেই, একথা আজকের দিনে আপনি-আমি বুঝলেও তদানীন্তন গ্রীকশিল্পীরা বোধকরি তা অনুভব করতেন না। চিন্তার জগতে অন্যান্য ক্ষেত্রে এত উৎকর্ষ দেখিয়েও এই সহজ সত্যটা তাঁরা যে কেন উপলব্ধি করতে পারেননি ভাবতে অবাক লাগে। শুধু ভাস্কর্য নয়, ওদের সাহিত্যে, কাব্যে, নাটকে, গাথায়, মহাকাব্যে সর্বদাই একটা জোর-জবরদস্তির প্রবণতা। নায়ক-নায়িকা সেখানে প্রেমে পড়ে কদাচিত—পড়লেও অনিবার্যভাবে উপস্থিত হয় খলনায়ক এবং বলাৎকার দৃশ্যে নাটক জমে ওঠে। Peleus পশ্চাদ্ধাবন করছে Thetis-এর; Diosuri পশ্চাদ্ধাবন করছে Leucippus-এর কন্যাদের; এ্যাপোলো তাড়া করছে ডাফ্‌নিকে। হেডস্‌ অপহরণ করছে পার্সিফোনকে; জিউস্‌ ছিনিয়ে নিচ্ছে ইউরোপা অথবা গ্যানিমিডকে। এমনকি দেখছি, গ্রীক বীর এ্যাকিলিস্‌ সমকামিতার তাড়নায় বালক ট্রয়লাস্‌কে শেষ পর্যন্ত হত্যা করে বসল।

তত্ত্বটা অপর্যাপক থেকেও সমানভাবে প্রযোজ্য। নায়িকারাও প্রতিশোধ নিতে যেন সদা-উদ্যত। পাইরিজিয়ায় দেবী সিবিলা যখন প্রায় উত্তীর্ণযৌবনা তখন তাঁর সনেহ হল যে, তাঁর তরুণ প্রেমিক এ্যাটিস্‌ অন্য কোনও নারীর প্রতি অনুরক্ত। তাই তাকে বাধ্য করল অস্ত্রোপচারে খোজা করে দিতে। গ্রীক দেবী আর্টেমিস্‌ (রোমান কম্পনায় ‘ডায়না’) তাঁর শিকারী কুকুরদের নিয়ে বনে-জঙ্গলে শিকার করে বেড়াতেন। একদিন তাঁর নজর হল, একটি বিদেশী তরুণ, এ্যাকটিয়ন, বৃক্ষান্তরাল থেকে তাঁর নগ্ন-স্নান লুকিয়ে দেখছে। এই অপরাধে দেবী আর্টেমিস্‌ ঐ কোতুহলী তরুণটিকে মস্ত বলে একটি মৃগে রূপান্তরিত করে দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর শিকারী কুকুরের দল ঐ হতভাগ্য বিদেশীটিকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিল। সবচেয়ে অদ্ভুত কাহিনী রাজা আরগস্‌-এর আত্মজ্ঞাদের। আরগস্‌-এর রাজা দানায়ুস্‌-এর ছিল পঞ্চাশটি বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যা এবং মিশররাজ দীজিষ্টাস্‌-এর ছিল সমসংখ্যক যুবকবয়সী পুত্র। যেমন আশা করা যায়—রাজপুত্রের রাজকন্যাদের সঙ্গে লুকিয়ে প্রেম করতেন। এদিকে আরগস্‌-এর রাজার সঙ্গে মিশররাজের সম্পর্ক ছিল অহি-নকুলের। সোজা কথায় সেক্সপীয়রের অমর নাটক রোমিও-জুলিয়েটের তুলনায় এ নায়কে রোমাণ্টিক প্রেম অক্ষশাস্ত্রমতে পঞ্চাশগুণ গাঢ়। প্রোজোডিও। কারণ রাজা আরগস্‌ মিশর রাজের কাছে প্রস্তাব করলেন পঞ্চাশটি বিবাহের। মিশররাজ স্বীকৃত হলেন। আরগস্‌-রাজ তাঁর আত্মজ্ঞাদের বললেন, বিবাহরাত্রিই যেন তারা তাদের স্বামীদের হত্যা করে। আশ্চর্যের কথা, পঞ্চাশজন নববধূ একজনও প্রতিবাদ করল না, পিতার আদেশ পালন করল। রাত্রারাত মিশররাজ নির্বংশ হয়ে গেলেন।

শিম্পের উপজীব্য যদি জোর জবরদস্তি হয় তাহলে হয়তো নরনারীর মাংসপেশী, অঙ্গ সৌষ্ঠব প্রভৃতি দেখানোর সুবিধা হয়—কিন্তু আদিরসের বা নারিক মূল উপজীব্য : প্রেম, তার মৃত্যুই ঘোষিত হয়। তবু অরাদিপাউস থেকে ‘রেপ অব সাবাজিন্স’-এ একই ধারায় আমরা গ্রীক যুগ থেকে রোমক সভ্যতায় চলে আসি। চিত্র ৫৫-তে দেখা যাচ্ছে পুরুষ সবলে আকর্ষণ করছে হতভাগ্য নারিকার মধ্যদেশ—তাকে অক্ষশায়িনী করতে, আর স্থ্রীলোকটি চেপে ধরেছে নারকের চুলের মুটি। এ শিম্পবস্তুটি গ্রীক যুগের। আবার দেখুন, এই গ্রীক অনুভাবনাতে মধ্যযুগেও শিম্পী যৌথ-বলাৎকারকেই শিম্পের উপজীব্য করেছেন (চিত্র-৪৯)।

সে যাই হোক, মোটামুটিভাবে দেখছি, গ্রীক যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত শিম্পীরা দুটি ‘টাবু’ মেনে চলেছেন। এক : ন্যূড-শিম্পের একক-মুণ্ডিতে জননেস্ত্রিয় প্রদর্শন করা বৃচিসম্মত হলেও, যৌথ আবস্থায়, বিশেষ করে সঙ্গমদৃশ্যে তা দেখানো যাবে না। কারণ বোধহয় এই : ন্যূডে জননেস্ত্রিয় হস্তপদাদির মতো একটি অঙ্গ-বিশেষ ; কিন্তু মিলন-দৃশ্যে তা ‘অঙ্গ-বিশেষ’ নয় ‘বিশেষ অঙ্গ’!

দুই : মৈথুনরত মিথুনে মিলন-তৃষিত নারক-নারিকার আদিরসের অপেক্ষা চিত্রধর্মকে প্রাধান্য দিতে হবে।

ক্রমশঃ অবশ্য নূতনযুগের চিত্র ধারায় নূতন শিম্পক্ষুরণ দেখা দিল। মধ্যযুগের শিম্পীরা অনুধাবন করলেন যে, বীররস বা রৌদ্ররস অপেক্ষা মিলনদৃশ্য মাধুর্যসই বরণীয়। সুরোপীয় রেনেসাঁ-যুগের শিম্পীরা তাই গ্রীক মানসিকতার একটি ধারণা গ্রহণ করলেন, একটি বর্জন করলেন। মিথুনে-মুণ্ডিতে প্রেম এল, বলাৎকার নয়—নারিকা সক্রিয় অংশীদার হল, সানন্দে দেহদানে স্বীকৃত হল ; কিন্তু এই প্রথম জাতের গ্রীক ‘টাবু’-টা অব্যাহত রইল—অর্থাৎ সঙ্গমদৃশ্যের প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন সামাজিক ছাড়পত্র সাধারণভাবে পেল না। শৃঙ্গাররত মিথুনেই ও পর্ষায়ের সমাপ্তি চিহ্নিত হল এবং সে-ক্ষেত্রে মূল-যোনীজ লুক্কায়িত রাখার ব্যবস্থাটা পাকা থাকল। বলা বাহুল্য এর পিছনে চার্চ-এর প্রভাব অনস্বীকার্য, কারণ খ্রীষ্টধর্মের মূলেই প্রজনন-তত্ত্বকে হেয় করা হয়েছে। নন্দন-তত্ত্ব আদম-ঈভের আদি-পাপ এবং ঈশ্বরপুত্রের আবির্ভাব অযোনীসন্তবের আধিদৈবিক পথে।

দুটি ক্লাসিকাল উদাহরণ এখানে পেশ করছি। দুটি চিত্রেই বিষয়বস্তু অভিন্ন। প্রেম ও প্রজননের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ‘ভেনাস’ এবং ‘মাস’-র মিলনদৃশ্য। দুটি চিত্রেই ‘কিউপিড’ উপস্থিত—অর্থাৎ শিম্পী যেন বলতে চান, বলাৎকার নয়, ‘প্রেমই এ শিম্পাঙ্গুর উপজীব্য।’ চিত্র—৫১তে নারিকা ভেনাস পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেন। তার দৃষ্টিতে সম্মতির লক্ষণ সুস্পষ্ট। কিন্তু তার দক্ষিণহস্তের তর্জনী তার কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। ভেনাস শিকারী, তার পদপ্রান্তে পড়ে থাক। ত্বনীটিকে দেখিয়ে সে বলতে চায় : আমার গাগারী যে ভরা হয়নি।

অপরপক্ষে চিত্র—৫২-তে ভেনাস রীতিমতো রত্নাতুরা। দক্ষিণ হস্ত ও বামজানুর উৎক্ষেপেই-তার মনোভাবের সম্যক প্রকাশ।

লক্ষ্য করে দেখুন, দুটি ক্ষেত্রেই শিম্পী নারক-নারিকার মূল জননেস্ত্রিয় সূকৌশলে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন। মনে রাখা দরকার, সুরোপীয় রেনেসাঁ-যুগের মাঝামাঝি এ দুটি চিত্র-অংকা হলেও বিষয়বস্তু চয়নে মধ্যযুগীয় শিম্পী গ্রীক পরিষ্কম্পনাকেই শূন্য নয়, গ্রীক শৈলীকেও অনুকরণ করেছেন। আর এ দুটি চিত্র অঙ্কিত হবার পূর্বেই মিকেলাঞ্জেলো, রাফায়েল, লিওনার্দো, অর্জনে, তিশিয়ান প্রভৃতি অসংখ্য ন্যূড-চিত্রে জননেস্ত্রিয় দেখিয়েছেন।

প্রাচীণ ছেড়ে যদি বহির্ভারতীয় প্রাচ্যশিম্পের দিকে দৃষ্টি দিই তাহলেও এই একই অবস্থা দেখব। চীন-জাপান বা এশিয়ার অন্যান্য দেশে আদিরসাত্মক শিম্পবস্তুতে মৈথুনদৃশ্য প্রকাশ্য অনুমোদন পায়নি। চীনা চিত্রে নিরাবরণ নারীদেহ, বা ‘ন্যূড’ প্রায় নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে, স্বীকার করতেই হবে—মধ্যযুগের একটি বিশেষ কালে, দু-আড়াইশ বছরের শিম্পক্ষুরণের

করেকটি ক্ষেত্রে, কলিক্কে, খাজুরাহোতে প্রকাশ্য মন্দিরগায়ে সঙ্গমদৃশ্যের অকুট রূপায়ন একটি ব্যতিক্রম। আর সেজন্যই দেশী-বিদেশী পর্যটক কোনার্ক খাজুরাহো দেখতে এসে প্রথমেই ঐ প্রস্তটা পেশ করেন : কেন ?

‘কেন’, সে-কথা বিচার করার পূর্বে বরং আমাদের খুঁজে দেখা উচিত শিল্পবস্তু হিসাবে এই পরিকল্পনাটি ভারতীয় ভাস্কর্যে প্রথম কবে আবির্ভূত হল, কোন পথে এল, কীভাবে এল।

আমার অনুসন্ধান মতো ভারতীয় ভাস্কর্যে মৈথুনরত মৈথুনের প্রথম ঐতিহাসিক উদাহরণ কলিক্কের বৈতাল দেউল। নবম শতাব্দীতে। পুরাতত্ত্ববিদেরা বলতে পারবেন, আমার এই ‘হাইপথেসিস্’টা ঠিক কি না। যদি ভ্রান্ত্যু হয়, তবু হয়তো বলা যায়—নবম শতাব্দীর প্রথম পাদের পূর্বে কোনও ভারতীয় মন্দির ভাস্কর্যে যৌনাজ-বিকশিত করা মৈথুনরত মৈথুনমূর্তি উৎকীর্ণ হয়নি।

আমার মনে হয়, মানসী পত্রিকায় প্রকাশিত আচার্য রতেন্দ্রলাল শীলের বক্তব্যে জোরালো যুক্তি আছে, “মিস্ত্রীরা বৌদ্ধ সম্যাসীদের এই তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতি তাঁহাদেরই অনুজ্ঞাক্রমে খোদাই করিয়া মন্দিরগায়ে প্রকটিত করিত। তদবধি ‘ম্যুরাল ডেকোরেশ’ন’ ঐ চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির ধারা রহিয়া গেল। হিন্দু সভ্যতার লক্ষণ এই যে, সে বাহির হইতে সহজে কোন একটা নতুনভাব গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু একবার গ্রহণ করিলে আর বর্জন করিতে পারে না।” ৪৮ ॥

কী-ভাবে বৌদ্ধ-সম্যাসীদের ঐ তান্ত্রিক-আচার ব্রাহ্মণ্যধর্ম অনুপ্রবেশ করল, এবার আমরা সে-কথাই আলোচনা করব।

বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভারতবর্ষের মহাযান বৌদ্ধধর্মের বহু দেব-দেবীর মূর্তি পরিকল্পনায় চৈনিক প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন। ৪৯ ॥ তাঁর মতে হিন্দুদের ধ্বংসের দেবতা শিব এবং তাঁর শক্তিস্বরূপা দুর্গা যথাক্রমে মহাযান ধর্মের ঐশ্বর্য ও তারার সমতুল্য। আর শাক্ততান্ত্রিক ধারণার ঐ দুটি মৌল দেবদেবীর পরিকল্পনায় চৈনিক বামাচার কার্যকরী। পণ্ডিত সিলভা^{১০} লেভী বলছেন, হরপ্রসাদ-বর্ণিত তারাতন্ত্রের ব্যাখ্যায় বেসব দেবদেবীর বর্ণনা আছে সেগুলি ভিক্ত, নেপাল ও চীনে পূজিত দেবদেবীর রূপান্তরমাত্র। ৫০ ॥ তিনি আরও বলছেন, তন্ত্রে পণ্ড ‘ম’-কার (মদা, মৎসা, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুন) ভারতবর্ষে এসেছে চীনদেশ থেকে। জীবনয়তোষ ভট্টাচার্য তাঁর গবেষণা-গ্রন্থে বলছেন, চীন থেকে এই ‘চীনাচার’ ‘বামাচার’ রূপে শাক্ত-সাধনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিশিষ্টের মাধ্যমে। ৫১ ॥ ‘ভারা-বিশিষ্ট উপাখ্যান’ এই সিদ্ধান্তের মূল উৎস।

তাই যদি হবে—অর্থাৎ ‘মৈথুন’-কে ধর্মসাধনা তথা ঈশ্বর প্রাপ্তির অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করার ভারতীয় ধারণাটা যদি বিশিষ্টের মাধ্যমে চীনখণ্ড থেকেই এসে থাকে তাহলে আমাদের দেখা দরকার : ভারা-বিশিষ্টের সময়কালটা কী? সেটা কি ভারতীয় মন্দির-দেউলে ‘মৈথুনরত-মৈথুন’ প্রথম উৎকীর্ণ হবার পূর্ববর্তী যুগে? যদি তা না হয়, তাহলে বলা যাবে না যে, দেবদেউলে ‘মৈথুনরত-মৈথুন’-এর আদি উৎস চীনাচার, যা তান্ত্রিক বামাচারের মাধ্যমে এদেশে আসে।

ভারা-বিশিষ্টের উপাখ্যানটি আমরা নানা সূত্র থেকে পাচ্ছি। যথা : বুদ্ধ-বামল তন্ত্র, মহাচীনাচার তন্ত্র, ভারা-রহস্য, চীনাচার-প্রয়োগবিধি প্রভৃতি। বিভিন্ন পুঁথিতে সামান্য প্রকারভেদ থাকলেও মূল-কাহিনীর কাঠামোটা নিম্নোক্তরূপ :

বিশিষ্ট মুন কামাখ্যা-মন্দিরের অদূরে কঠোর তপশ্চর্যায় নিরত থেকেও চরমাসিদ্ধি লাভ করতে পারলেন না। তখন দেবী কামাখ্যা ভক্তের সম্মুখে খরং আবির্ভূত হলে বললেন, তুই দক্ষিণাচারে শক্তি-সাধনা করছিস, কিন্তু চরম সিদ্ধি লাভ করতে হলে তোকে বামাচারে অগ্রসর হতে হবে।

দেবীকে সাক্ষাৎ প্রণাম করে বিশিষ্ট বললেন, আমি যে বামাচার জানি না মা, তুমি আমাকে শিখিয়ে দাও।

কামাখ্যা হেসে বললেন, পাগল ছেলে! আমি যে মা! আমি তা তোকে কেমন করে শেখাব? তুই মহাচীনখণ্ডে

চলে' যা। সেখানে গিয়ে দেখবি, "স্বয়ং বুদ্ধদেব চীনাচারে নিরত। তাঁর কাছ থেকে তুই বামাচার শিখে আস। এ দেশে প্রচার কর।"

অগত্যা বিশিষ্ট চীনদেশে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, 'অসংখ্য লোকেশ্বর-সেবিত বুদ্ধ বামাচারে রত।' সবিম্বয়ে দেখলেন, বুদ্ধদেব সেখানে সহস্রাধিক নারিক। পরিবেষ্টিত এবং রমণীগণ 'সালস্কারা, মদালসা, রত্নাতুরা ও নগ্নিকা।' শূদ্ধাচারী জিতেন্দ্রিয় বিশিষ্ট অসংখ্য কামাতুরা কামিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করেন, কিন্তু কামাখ্যাদেবীর আশীর্বাদে তিনি ক্রমশঃ পণ্ড 'ম'-কারে অভ্যস্ত হয়ে অন্তিমে সিদ্ধিলাভ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে এই নূতন সাধনার মাহাত্ম্য প্রচার করেন।

কাহিনী এইটুকুই—কিন্তু এর তথ্যভিত্তিক কতটুকু? বিশিষ্ট কে? কোন দেশের মানুষ? ঐতিহাসিক মানুষ কি?

কামাখ্যা-মন্দিরের অনতিদূরে বিশিষ্টাশ্রমের ভৌগোলিক অস্তিত্ব এ কাহিনীর সমর্থক। মনে হয়, তিনি কামাখ্যাদেবীর একজন সাধক ছিলেন। সেখান থেকেই তিনি চীনে চলে যান, চীন-প্রভাবিক তান্ত্রিক-আচার সেখানে শিখে দেশে ফিরে আসেন। এজন্যই কামাখ্যা হয়ে গেলেন 'কামরূপ' কামাখ্যা। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন, কিন্তু দুটি তীর্থক পন্থায় তাঁর সময়কালটা চিহ্নিত করা সম্ভব। প্রথম কথা, দেখছি চীন দেশে প্রায় সমকালে রচিত একটি বিশালায়ন উপন্যাসে এ ঘটনার উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে উপন্যাসের নায়ক রাজা শী-মেন-চিঙ-এর দরবারে ভারতবর্ষ থেকে একজন সাধু এসেছেন যিনি কামকলায় দক্ষ। ৫২ ॥ এদিকে দেখছি, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের নৃপতি ভাস্করকুমারের বদান্যতায় একটি চীনা গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত হচ্ছে। গ্রন্থটির চৈনিক নাম "তাও-তে-চিঙ"; বলা হয়েছে মূনি বিশিষ্ট এটি চীন দেশ থেকে নিয়ে এসেছেন। বহুত 'তাও-তে-চিঙ'ই হচ্ছে বামাচার বিষয়ে ভারতীয় ভাষায় প্রথম গ্রন্থ। ভাস্করকুমার ঐতিহাসিক ব্যক্তি—শশাঙ্ক, হর্ষবর্ধন ও হিউয়েন-ত্‌সাঙ-এর সমসাময়িক। তার অর্থ : ভারতবর্ষে বামাচারের প্রথম প্রবর্তন এবং গৌড়ানুশাসিত শশাঙ্কের কলিঙ্গ বিজয়, তথা ভুবনেশ্বরে মন্দির নির্মাণের জোয়ার হচ্ছে প্রায় সমকালীন ঘটনা। এবং তার অর্থ : বৈতাল-দেউলে যখন প্রথম মৈথুনরত মিথুন উৎসর্গ করা হল তার দেড়-দু-শ বছর আগেই বামাচারের মাধ্যমে "মৈথুন" ধর্মসাধনার অঙ্গ হিসাবে অন্তত একটি ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায় কতৃক গৃহীত হয়েছে।

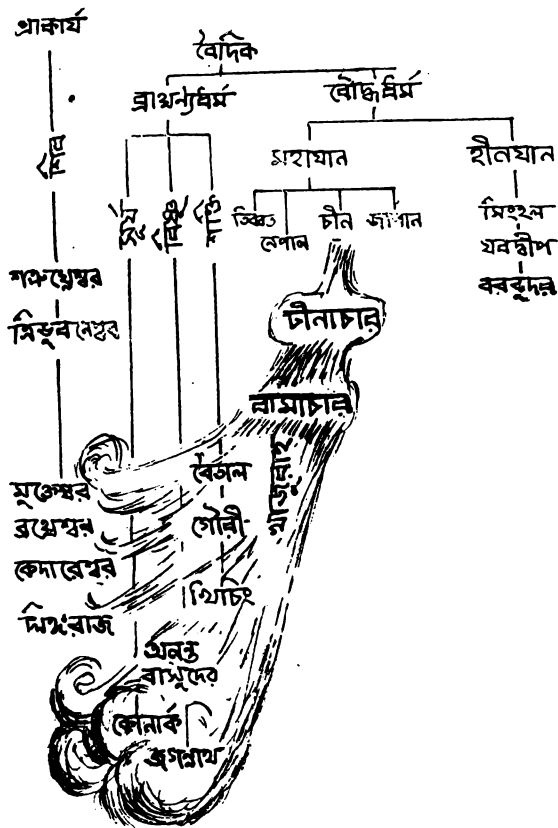
একটা প্রশ্ন থেকে যায় : বুদ্ধদেব 'মার'কে অস্বীকার করেছিলেন। এক্ষেত্রে মদনজয়ী বুদ্ধদেবকে তারা-বিশিষ্ট উপাখ্যানে কেন জড়ানো হল? জবাবটা জানতে হলে বুঝে নিতে হবে ভারতবর্ষ থেকে মহাবান বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে কীভাবে গৃহীত হয়েছিল। অর্থাৎ তাঁর টানে কী ঘটল জানতে হলে খাতরে দেখতে হবে পূর্বযুগে জোয়ারের সময় কী কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল।

ভারতীয় দর্শনে যেমন বলা হয়েছে—পুরুষ ও প্রকৃতির নিত্যানন্দনেই সৃষ্টির মূল বিধৃত, নর ও নারীর দৈহিক মিলনই যেমন ভারতীয় রসতত্ত্বে আদিরস, ঠিক তেমনি প্রাক্-বুদ্ধযুগের চীনা দার্শনিকেরাও বলেছেন—সৃষ্টির মূলে আছে : 'য়াঙ' এবং 'য়িন্'-এর পারস্পরিক আকর্ষণ। 'য়াঙ' পুরুষ ; 'য়িন্' প্রকৃতি। বুদ্ধদেব মারকে পরাজিত করেছিলেন, ইন্দ্রিয়-নিবৃত্তিকেই প্রধান্য দিয়েছিলেন। হীনযান ধর্মে শীল, আচার এবং ইন্দ্রিয়জ সুখসন্ধানের নিবৃত্তিকেই জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চীনে হীনযান ধর্ম শকড় গাড়ে। কাশ্যপমাতঙ্গ অথবা ধর্মরত্ন আনীত হীনযান ধর্ম অনতিবিলম্বে মহাবানী ধর্মপ্রচারের বন্যায়—কুমারজীব, ধর্মক্ষেম, বুদ্ধযশ, বুদ্ধভদ্র, গুণবর্মা, বিনীতবুচি, প্রভৃতির প্রচারে খেরবাদকে পরিত্যাগ করে নানা দেবদেবীর পূজা-অর্চনায় মনোনিবেশ করে। মহাবান-তন্ত্র পুরুষ-প্রকৃতিকে মেনে নিয়েছিল—নানান দেবদেবীর রূপে। ফলে বুদ্ধদেবের ধ্যানযোগকে দ্বীকার করে 'জেন-বুদ্ধিজম্'-এর জন্ম দিলেও মহাচীন তার প্রাকবুদ্ধযুগের তাও-দর্শনের 'য়াঙ-য়িন্'-তত্ত্বকে

অস্বীকার করেন। তাই পরবর্তীযুগের ভারতীয় পরিব্রাজকেরা—পরমার্থ, বোধিধর্ম, বজ্র-বোধি, প্রভাকরমঠ, জিনগুপ্ত, ধর্মগুপ্ত, শিষ্টানন্দরা মহাচীনে গিয়ে দেখলেন চীনা-অহংতের অনেকেই সম্ভ্রাম্যে গাহ'স্থ্য জীবন যাপন করছেন, তাঁরা বিবাহিত, নিবৃষ্টি-মার্গের পাশাপাশি তাঁরা স্থান দিয়েছেন 'রাঙ-রিন্'-তন্ত্রকে।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, ভারতীয় ভাষার্ষে মৈথনরত মিতনর আবির্ভাব শুধু ফা-হিয়েন বা হিউয়েন-ত্সাঙই নন, ই-ৎসিনেরও পরবর্তী কালে। অপর গক্ষে ডঃ ত্যান গুলিক প্রমাণ দিয়েছেন, খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেই চীনাশিল্পে বন্ধকাম মৈথনরত মিতনমূর্তি নিমিত হত। ৫৩ ॥

ডঃ বোসেফ নীডহ্যাম বলছেন, তাও দর্শনে অমৃতলাভের (চীনাশক্তি হচ্ছে 'শীয়েন') জন্য সাধকে ছয়টি আচার মেনে চলতে হত। ৫৪ ॥ সেগুলি হচ্ছে (১) সূর্যপ্রণাম, (২) স্বাস সংবন (৩) হঠ-যোগ (৪) মৈথুন (৫) রাসায়নিক



ମିତ୍ର : ଶ୍ରୀ

ভারত শিল্পে চীনাচারের প্রবেশ

করা মৈথুনরত মিথুন নেই ।

কীভাবে ঐ চিন্তাধারা ভারতশিল্পে প্রবেশ ও প্রসার লাভ করল সে-কথা বোঝানোর চেষ্টা করেছি একটি চিত্রের মাধ্যমে (চিত্র : ৬৫)। প্রসঙ্গত উল্লেখ করে রাখি, এই মতটি সর্বজনস্বীকৃত নয় ; অনেক পণ্ডিতের মতে শান্ত-তন্ত্রে পঞ্চ-ম'কার

প্রক্লিমা (৬) আহাৰ সংৰক্ষণবিধি। এৰ ভিতৰ চৌকৈনক যোগীয়া প্ৰাণায়াম ও সূৰ্যপ্ৰণাম আয়ত্ব কৰেছেন ভারত-সংস্কৃতিৰ সংস্পৰ্শে আসাৰ পূৰ্বযুগ থেকে চৌ-মুগ থেকে। আৰ 'মৈথুন'কে সাধনাৰ অঙ্গীভূত কৰাৰ ধাৰণাটা চীনেৰ সম্পূৰ্ণ নিজস্ব। নীডহ্যাম বলছেন, অন্য কোনও ধৰ্ম তার পূৰ্বে 'মৈথুন'কে সাধনমাৰ্গেৰ অন্তৰ্গত করেনি।

হিন্দুধর্মও মৈথনকে অন্বীকার করেনি, খ্রীষ্টধর্মের মতো বলেনি যে, নর-নারী বা প্রকৃতি-পুরুষের আকর্ষণ হচ্ছে আদি পাপ; বরং বলেছে এই নন্দন-তত্ত্বের মূলে আছে 'আনন্দ'। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে যে, এতাবধিকাল মৈথনকে হিন্দু-সংস্কৃতি গাহ'ছ্যা-শ্রমেই সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছিল। বেদ-উপনিষদ-পুরাণের যুগে সাধনমার্গে—বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস পর্যায়ে মৈথনের কোনও আবশ্যিক ভূমিকা ছিল না; বরং সেটিকে বর্জনের দিকেই একটা প্রবণতা ছিল।

চীনখণ্ড থেকে আনীত তান্ত্রিক বামাচারে প্রতি-
ফলিত 'স্নাঙ-য়িন' তত্ত্ব দৃষ্টিভঙ্গিটাই বদলে দিল।
সেজন্যই প্রাক-বৈতালযুগে, অর্থাৎ প্রাক তান্ত্রিক
অভ্যুত্থানের যুগে ভারতীয় দেবদেউলে যুগলমূর্তি আছে,
শৃঙ্গাররত্ন মিথুন আছে, কিন্তু যোনীত্র-বিকশিত

আদৌ চীনদেশ থেকে আসেনি—‘চীনাচার’ পঞ্চ-মকারের জনক নয়। এ তত্ত্ব বহুদিন থেকেই এ-দেশে ছিল। সে যাই হোক, মন্দিরগায়ে মৈথুনরত মিত্বনের রূপারণে শান্ত-তনুই যে মূলতঃ দায়ী এ-কথা মনে করা অসঙ্গত নয়।

প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক—‘আমাদের অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে মৈথুনরত মিত্বন কেন কলিঙ্গে আবির্ভূত হল, কেন নয় প্রাকজ্যোতিষপুরে, অর্থাৎ কামরূপ কামাখ্যার কাছাকাছি? কেন নয় গোড়়ে, নালন্দায়, বা পূর্বাঞ্চলের অন্যত্র? তার জবাব বোধহয় এই রকম : চীনখণ্ড থেকে চীনাচার এসে সম্ভবত প্রথম লালিত হয়েছিল বজ্রযানী ও মহাযানী বিহারগুলিতে। সেখান থেকে তা চোলাই হয়ে প্রবেশ করে শান্ত-তান্ত্রিক বামাচারে। বৌদ্ধ সঙ্ঘারামগুলি ছড়ানো ছিল পূর্বভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে—বর্তমান বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, বাঙলাদেশ ও ওড়িশায়। নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুর, রত্নাগিরি, ললিতগিরি বাউদ প্রভৃতি সঙ্ঘারামে তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান পালিত হত। যদিও মৈথুনরত মিত্বন চিত্র তিব্বত, নেপাল ও রেশম-সড়কের ধারে ধারে বৌদ্ধ সঙ্ঘারামগুলিতে দেওয়ালগায়ে অঙ্কিত হত, কিন্তু এই পূর্বভারতে চৈতন্য-বিহারের অভ্যন্তরে সম্ভবত তা অঙ্কিত হয়নি। শুধু তাই নয়, পূর্ব-ভারতের মহাযান ও বজ্রযান শিল্পেও ঐ আচার প্রতিফলিত হয়নি। অতি সম্প্রতি, ইউনেস্কোর অর্থানুকূলে ঐশিয়ার্টিক সোসাইটি একটি ‘এ্যালবাম’ প্রকাশ করেছেন। পূর্বভারতের তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের ২৭১টি চিত্র এই এ্যালবামে সংকলিত হয়েছে। মহাযানী দেবদেবী—অবলোকিতেশ্বর, তারা, ভৈরব, জম্বল, মঞ্জুশ্রী, প্রজ্ঞাপারমিতা, মারিচী, হারিতী প্রভৃতি অনেকেই আছেন,—পুরুষ ও স্ত্রী; কিন্তু তাদের যুগল-উপস্থিতি খুবই কম। মৈথুনরত মিত্বনের তো প্রশ্নই ওঠেনা। গ্রন্থের ভূমিকার অধ্যাপক শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী বলেছেন, “It is significant to observe, again, that the erotic element that usually underlines many an iconic concept, though emanating from and propagated by the writings of great Indian teachers of the famous monasteries situated in Eastern India, have seldom been reflected in the art of the Eastern School, whether in sculpture or painting, except in the latest phases. As a matter of fact, this aspect finds very little expression in Indian art as a whole. The iconic forms having such elements are found to have been frequently favoured in Nepal, Tibet and to a certain extent in China. Possibly the soil and environment in these countries were more congenial for such expressions to take place.” ৫৫ ॥

অর্থাৎ সরস্বতী মশায়ের বক্তব্য—যৌন ক্রিয়াকলাপের মূর্তি বা চিত্র পূর্বভারতীয় তান্ত্রিক-বৌদ্ধ শিল্পে কদাচিত দেখা যায়। যদিও এই পূর্বভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা এ বিষয়টি নিয়ে তাঁদের পুঁথিতে অসঙ্কোচ আলোচনা করেছেন, তবু তা এ-অঞ্চলের বৌদ্ধ-তান্ত্রিক শিল্পে প্রতিফলিত হয়নি। অথচ এ ধরনের শিল্পকর্ম নেপাল, তিব্বত এবং মধ্য এশিয়া বা চীনখণ্ডের অনেক সঙ্ঘারামে দেখতে পাওয়া যায়।

তিব্বতের সঙ্ঘারামের ভূগর্ভস্থ গোপন সাধনকক্ষের প্রাচীরে কী জাতের ছবি অঁকা হত সে-কথা এখনই আলোচনা করব। সেখানকার দু-একটি চিত্র নমুনা যা পেয়েছি তাতে লক্ষণীয় যে, দেবদেবীর আসন কামশাস্ত্র সম্বন্ধে বন্ধকাম-আসন; কিন্তু তাঁরা বিবস্ত্র নন। অর্থাৎ শিল্পী সেই টাবুটা ঠিকই মনে চলেছেন। জীমার সাহেবের সংকলিত একটি চিত্রের রেখায়িত অনুলিপি এখানে সংযোজিত হল—চিত্র : ৬৬ এবং চিত্র : ৬৭-তে। প্রথমটি সম্মুখদৃশ্য, দ্বিতীয়টি বিপরীত দিক থেকে দেখা ছবি। ৫৬ ॥

জীমার অবশ্য নারীমূর্তিটিকে প্রজ্ঞাপারমিতা বলেছেন। মহাযানধর্মে প্রজ্ঞাপারমিতার পরিকল্পনা যৌনতাব্যঞ্জিত—

তিনি সরস্বতীর বৌদ্ধপ্রতিরূপ। তাই আমার মনে হয়েছে এটি 'হেবল্জের' মূর্তি। সে যাই হোক, নায়ক-নায়িকার এই বন্ধকাম আসনটি কামশাস্ত্রমতে আর্সতক (উপবিষ্ট)-পর্ষায়ের 'কামসুন্দর-বন্ধ'। বাৎসারন, স্মরদীপিকা, এবং অনঙ্গরঙ্গ্যে এ



চিত্র : ৬৬

বজ্রসত্ত্ব ও হেবল্জ (প্রজ্ঞাপারমিতা)

আসনের যে বর্ণনা আছে চিত্রায়িত রূপটি তা থেকে অভিন্ন। তবু আমাদের আরোপিত সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী এ মিত্খনমূর্তিটিকে কিছুতেই 'মৈত্খনরত মিত্খন' বলা যাবে না, কারণ শিল্পী সময়ে নায়ক-নায়িকাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করে গড়েছেন।

এই প্রসঙ্গে আরও বলি হ্যারিসন ফোরম্যান তাঁরে 'থু ফরবিডন্ টিবেট'-গ্রাছে তান্ত্রিক বৌদ্ধদের বামাচারের একটি বর্ণনা দিয়েছেন। ৫৭ ॥ লাহরুক সজ্জারামের লামার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার পর মঠাধিকারী ফোরম্যানকে কিছু গৃহ্য-তত্ত্ব পরিবেশন করেন। লেখক বলছেন, মঠের ভিতর একটি গোপনকক্ষে তান্ত্রিক-আচারের অংশবিশেষ অনুষ্ঠিত হয়। সেই কক্ষের প্রাচীরে বৌন কামকলার অকুণ্ঠ চিত্র ও নিরাবরণ ভাস্কর্যের নমুনা সাজানো। লামা সেখানেই সাধনা করেন। ক্রমে সেই গোপন কক্ষে একাধিক সুন্দরী রমণী-প্রবেশ করে এবং সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় নৃত্যগীত পরিবেশন করে। লামা কখনও একা থাকেন, কখনও বা সপার্বদ। শুধু তাই নয়, প্রাচীর চিত্রে দৈহিক মিলনের যে-সব দৃশ্য খোদাই-করা অথবা চিত্রিত করা আছে, সাধনার শেষ পর্যায়ে লামাকে সেগুলি বাস্তবে প্রত্যক্ষ করতে হয়। তাতেও যদি তিনি অবিচলিত থাকেন, তখনই বোঝা যায় তিনি সাধনায় উন্নীর্ণ।

মহাযান-ধর্ম যখন বজ্রযানে বিবর্তিত হচ্ছে তখন এই জাতীয় আচার যে পূর্বভারতের বৌদ্ধ সজ্জারামগুলিতে অনুষ্ঠিত হত এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয়। কলিক্বে তখন অনেকগুলি বৌদ্ধ সজ্জারাম ব্রাহ্মণ্যসম্প্রদায়ের সমান্তরালে বিকাশ লাভ করছিল। কটক জেলায় : ললিতাগিরি, উদয়গিরি, রত্নাগিরি, বাগেশ্বরনসী ; বালাসোরে : কোপারী, অযোধ্যা, সোলানপুর :



চিত্র : ৬৭

বজ্রসত্ত্ব ও হেবল্জ (প্রজ্ঞাপারমিতা) তিব্বত

মন্দিরভজ্ঞে : খিচিং ; ফুলবনীতে : বাউদ প্রভৃতি । এইসব বৌদ্ধ সঙ্ঘায়ামে সাধনার অঙ্গ হিসাবে 'মৈথুন'কে গ্রহণ করা হয়েছিল বলে ধরে নেবার যথেষ্ট কারণ থাকলেও এ-কথা স্বীকার করতে হবে যে, তাঁদের শিল্পকলার এর প্রতিফলন হয়নি । উল্লিখিত বৌদ্ধ মঠের ধ্বংসাবশেষে এমন কোনও শিল্প নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি বা এ তথ্যের বিরোধী । কলিঙ্গের বৌদ্ধ মঠগুলির কথা বিশেষ করে বলছি এজন্য যে, সমকালে কলিঙ্গের হিন্দু মন্দিরেই মৈথুনমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল । না হলে, এ-কথাও স্বীকার করতে হবে যে, সমস্ত পূর্বভারতে—বিহারের নালন্দার, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের অন্যান্য মঠের ধ্বংসাবশেষেও যৌনাচারের কোনও নিদর্শন নেই ।

দুই মনে প্রশ্ন জাগে : এ ধারণার মূল উৎস যদি চৈনিক বামাচার, তাহলে পূর্বভারতে সমসাময়িক মহাবাহানী বা বজ্রবাহানী শিল্পে তার প্রতিফলন না হয়ে শাস্ত্র-তাত্ত্বিক মন্দিরেই তার স্ফূরণ হল কেন ? এবং শুমু কলিঙ্গে ?

দুটি বৃত্তি মনে আসছে । এক : বঙ্গদেশে, গোড়ে সে-আমলে ব্রাহ্মণ্যসম্প্রদায়ের যে সব মন্দির নির্মিত হয়েছিল, সেগুলি পাথরের নয়, পোড়ামাটির । ফলে, তাতে যদি 'মৈথুনরত মৈথুন'মূর্তি আদৌ উৎকীর্ণ করা হয়ে থাকে তবে তা হয়তো মহাকালের স্থূল হস্তাবলেপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে । দুই : শুমু ধর্মীয় ও সামাজিক অনুমোদনই তো যথেষ্ট নয়, যে রাজন্যবর্গের অর্থে মন্দির নির্মিত হচ্ছে তাদের মানসিকতা, ইচ্ছা, প্রবণতাও এ জাতীয় শিল্প-স্ফূরণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন । কলিঙ্গে সে আমলে দেবদাসীপ্রথা বহুল পরিমাণে প্রচলিত । রাজারা বিলাস-ব্যাসনে আকর্ষণ নিমগ্ন, প্রত্যেকের অন্তঃপুরে একাধিক মহিষী ও উপগম্মী । ফলে তাঁদের ইচ্ছা ও অনুজ্ঞাতেই মন্দিরে এ জাতীয় মূর্তির প্রতিফলন প্রত্যাশিত ।

কোন কোন পাণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন যে, কলিঙ্গে—বিশেষ করে পুরী ও কোনার্কে 'মৈথুনরত মৈথুন'-মূর্তিগুলি কামশাস্ত্র মতে উৎকীর্ণ করা, অর্থাৎ কামশাস্ত্রকার বিভিন্ন বন্ধের যে লৈখিক বিবরণ দিয়েছেন, ভাস্কর তারই লৈখিক রূপান্তর করেছেন মাত্র । ভাষান্তরে—এগুলি 'সচিত্র কামসূত্র'—চৌষটি কলার নয়নগ্রাহ্য উদাহরণ । কথাটা আংশিক সত্য ।

পুরীর মন্দির আর্মি খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পাইনি । এগ্রছে বহুত পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরের ভাস্কর্য উপেক্ষিত । একাধিক কারণে । প্রথম কথা, যাত্রী ও পাণ্ডাদের জন্য এ-কাজ সরেজমিনে করতে পারিনি । একক প্রচেষ্টায় বোধকরি তা অসম্ভব । যাত্রী ও পাণ্ডাদের কোনও দোষও দেখিনা । কোন একজন যাত্রী যদি শুমুমাত্র মৈথুনমূর্তিতে উৎসাহী হয়, জেহলে সেটা তাঁদের পক্ষে সহ্য করা শক্ত । দ্বিতীয়ত পুরী-মন্দিরের ভাস্কর্য অনেকাংশে পরবর্তীযুগে চুনখালির পলস্তার দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়েছিল । সস্তরের দশকে স্বতবার পুরী মন্দিরে গিয়েছি, দেখেছি, মন্দিরের বাহির দিকে ভারী-বাঁধা আছে, এবং ঐ আস্তর ছাড়িয়ে মূর্তিগুলি উদ্ধার করা হচ্ছে আর সেই ঘেরা-অংশে আমার মত সাধারণ যাত্রীর প্রবেশ নিষেধ ।

কোনার্ক-মন্দির অবশ্য খুঁটিয়ে দেখবার সুযোগ পেয়েছি । স্বীকার করতেই হবে—অনেকগুলি 'মৈথুনরত মৈথুন' কামশাস্ত্র বর্ণিত বন্ধের নয়নগ্রাহ্য রূপায়ন । কিন্তু বাৎসায়ন-বর্ণিত আসনগুলি যে পর্যায়ক্রমে উৎকীর্ণ করা হয়েছে এ-কথা বলা চলে না । সেটা সম্ভবপরও ছিলনা । তার হেতু শিল্পবিচারের নয়, নিতান্ত বহুতাত্ত্বিক । আর্চার বলছেন, "Supine or horizontal designs and compositions would detract from the upward surge of the temple. They would be appropriate in 'feminine buildings, such as the Jefferson Memorial, Washington, or the National Gallery, London—buildings whose flat lines support a rounded breast-like dome...Temples in medieval India were male in their own right. Their towers were like lingams. As sculpture, then the lover's vertical positions are geared to this

conception. But lay them down, make the necessary mental adjustments, and what is wild and fantastic is once again conventional.” ৫৮ ॥

[শায়িত বা জমির সঙ্গে সমান্তরাল পরিকল্পনায় দেউলের উর্ধ্বমুখী ব্যঞ্জন ব্যাহত হত। সে জাতীয় মিথুন ওয়াশিংটনের জেফারসন-স্মৃতিমন্দির অথবা লণ্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারীর পক্ষে উপযুক্ত হত—কারণ তারা স্ত্রী-জাতীয়া সৌধ। তাদের চূড়া স্তনের মতো সুড়ৌল, তাতে জমির সমান্তরাল রেখার আধিক্য।...মধ্যযুগের ভারতীয় মন্দিরগুলি মূলত পুরুষ। তাদের শিখর লিঙ্গপ্রতীকী। সুতরাং খাড়া করে রাখা ভাস্কর্যগুলিতে সেই ছন্দেরই অনুবর্তন। মূর্তিগুলিকে মনে মনে শূইয়ে দিন—যা ছিল অবাস্তব ও অদ্ভুত তা পরিচিত রূপ নেবে।]

এ-কথাটাও আংশিক সত্য মাত্র। এ মতে আপত্তি এজন্য যে, ভারতীয় মন্দিরমাঠেই পুরুষজাতীয় নয়। কোনার্ক জগমোহন—যা আমাদের এবং আচার সাহেবের আলোচ্য মন্দির—সেটি নিঃসন্দেহে স্ত্রী-জাতীয়া। তার চূড়া জেফারসন-স্মৃতিসৌধের মত অর্থাৎ সুড়ৌল-স্তনাকৃতি ‘না হলেও লিঙ্গ-প্রতীকী নয়—একটি ব-ভূমি। তন্ময়ের একটি অতি পরিচিত স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক-চিহ্ন। উচ্চতার অনুপাতে এ মন্দিরের বিস্তারও কম নয়। দ্বিতীয় আপত্তি—যে মৈথুনরত মূর্তিগুলিকে দণ্ডায়মান অবস্থায় বিদেশী লেখকের চোখে ‘wild and fantastic’ মনে হয়েছে সেগুলি ভারতীয় দর্শকের চোখে তা লাগে না। কারণ ভারতীয় কামশাস্ত্রে—বাংস্যায়নে, কল্যাণমঞ্জে, রতিরহস্যে তার নিখুঁত বর্ণনা আছে—তা শাস্ত্রসম্মত আসন।

তবু স্বীকার করতেই হবে কামশাস্ত্রে দণ্ডায়মান বন্ধের সঙ্গে শায়িত বন্ধের যে অনুপাত তার চেয়ে কোনার্ক দণ্ডায়মান-বন্ধ (স্থিতবন্ধ) অনেক অনেক বেশী। তারার কারণ এই :

নদীদৃশ্য আঁকবার সময় শিল্পী সচরাচর এমন কাগজ বা ক্যানভাস বেছে নেন যা চওড়ার বেশি, খাড়াইয়ে কম। শিল্পী ইন্দ্র দুগারের একটি গল্প। গিরিজ আছে, আমি তার খান-পঞ্চাশ ছবি দেখেছি—এমন একখানা ছবির কথা মনে করতে পারছি না, যেখানে কাগজটা খাড়াইয়ের দিকে বড়। কলিঙ্গ খাজুরাহোর ভাস্কর যদি ইচ্ছামতো শিল্পভূমি বেছে নিতে পারতেন, তাহলে বাংস্যায়ন-বর্ণিত শায়িত বন্ধকাম মূর্তিগুলি আমরা যথেষ্ট সংখ্যায় দেখতে পেতাম। কিন্তু সে সুযোগ তাঁরা পাননি। মুরাল-পেইন্টার আজকের দিনেও কী আঁকবেন তা হয়তো তিনিই স্থির করেন, কিন্তু কী মাপের ছবি আঁকবেন সেটা তাঁকে জেনে নিতে হয় আর্কিটেক্ট-এর কাছে। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। যে শিল্পভূমিতে মূর্তিগুলি উৎকীর্ণ করা হবে তা বাস্তবশাস্ত্রের নির্দেশে পূর্বনির্ধারিত। মন্দিরের প্ল্যান বা ভূমি-নকশা কী হবে—ত্রি-রথ, পঞ্চ-রথ অথবা সপ্তরথ তা পূর্বই স্থিরীকৃত। ফলে পিঠ, বাট অঙ্গুল শাস্ত্র নির্দেশে খাঁজ কাটা। রাহাপাগ, কোণাপাগ, অনুরাহাপাগ, অনুরথপাগ প্রভৃতি কোনটি কতদূরে বসবে তা সুনির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয়। অর্থাৎ বিস্তারের দিকে দেউল :বারে বারে খণ্ডিত। অথচ তলজম্বা, উপরজম্বা, প্রভৃতি শিল্পভূমির উচ্চতা অনেক বেশি। সোজা কথায় স্থপতিবিদ মন্দির নির্মাণ করে যে শিল্পভূমিগুলি ভাস্করকে দিলেন সেগুলি চওড়ার কম, উচ্চতার বেশি। এক্ষেত্রে ভাস্করকে যদি নির্দেশ দেওয়া হয় যে, এই শিল্পভূমি বা প্যানেলগুলি মিথুনমূর্তি দিয়ে সাজাতে হবে তখন তিনি যে অনন্যোপায় হয়ে দণ্ডায়মান মূর্তি বেছে নেবেন এতে অথাক হবার কিছু নেই।

এখানে একটি সঙ্গত প্রতিপ্রশ্ন উঠতে পারে : মন্দিরের পিঠ-অংশে, যেখানে সারি সারি হাতী খোদাই করা হয়েছে সেখানে তো শিল্পী মাঝে মাঝে শায়িত মিথুন গড়বার জায়গা পেতেন। সেখানকার শিল্পভূমি তো খাড়াইয়ে অল্প, দীর্ঘায়ত আনুভূমিক। সেখানে শায়িত-মিথুন উৎকীর্ণ করা হয়নি কেন? ঠিক জানি না, অনুমান করতে পারি—শাস্ত্রের নির্দেশ হয়তো অন্য রকম ছিল। মন্দিরের কোন অংশে মিথুন খোদাই করা চলবে, এ বিষয়ে নিশ্চয় কোনও নির্দেশ ছিল; ‘গুরুমুখী বংশ-

পরস্পরার তো বটেই খুব সম্ভবত কোনও বাস্তবশাস্ত্রেও, যা আমরা আজও উদ্ধার করতে পারিনি। না হলে কলিকতের দৃষ্টিতে বিভিন্ন মন্দিরে মিথুন মূর্তিগুলি কেন ভীড় করেছে তলজল্লা ও উপরজল্লা অংশে ?

যে বাই হোক, স্বীকার করতেই হবে কোনার্ক শিম্পী বাবতীর আসনই গড়েছেন—দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট, শায়িত ; বিপরীত ও অধোরত—অনঙ্গরঙ্গের ভাবার : উত্তানক, তির্থগ, উখিত, স্থিত ও আনত।

আমি যদি শিম্পী বিষয়ে গ্রন্থ রচনা না করে কামশাস্ত্র বিষয়ে গ্রন্থ-রচনা করতাম তাহলে ঐ আসনগুলির রেখাচিত্র অথবা আলোকচিত্র অপরিহার্য হয়ে পড়ত ; কিন্তু তাত্ত্বিক প্রয়োজনে শুধু উল্লেখ করা ছাড়া সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা এ শিম্পী-বিবরণে গ্রন্থে নিম্নপ্রয়োজন মনে করছি।

কোনার্ক ধ্বংসাবশেষে, আমার গণনায় বর্তমানে প্রায় দেড়শ মৈথুনরত মিথুন দেখতে পাচ্ছি। তার ভিতর শায়িত অবস্থায় দশটি মিথুন আছে কি না সন্দেহ। নমুনা হিসাবে একটিমাত্র উদাহরণ এখানে সন্নিবেশিত হল (চিত্র—৫৬)। এটি আকারে বিঘ্ন-প্রমাণ, আছে রথচক্রের নোঁমিতে, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মেডালিয়ান-এ। প্রকৃতি নিচে, পুরুষ উপরে। কল্যাণমন্দের ‘অনঙ্গরঙ্গ’-মতে এটি উত্তানবন্ধ পর্ধায়ের ‘নাগরবন্ধ’ :

‘উত্তানিতয়া স্মরমন্দিরে যঃ স্থিতস্তদুপবস্তুমুদগৃহীত্ব।

সংস্থাপ্য বাহ্যং কটিভোরমেত কান্তস্তদাম্যাকিল নাগরাখ্যং ॥” ৫৯ ॥

ঠিক পরবর্তী রথচক্রের নোঁমিতে শিম্পী কৌতুক করে উৎকীর্ণ করেছেন বিপরীতবন্ধের একাট দৃশ্য। পুরুষ নিচে, প্রকৃতি উপরে। ভারতচন্দ্র যে প্রসঙ্গে বলেছিলেন, “গিরি অধোমুখে কাঁদে, চকোরী পাইয়া চাঁদে...” ইত্যাদি। ‘কৌতুক করে’ বললাম এ জন্য, যেন শিম্পী কল্যাণমন্দের দ্বোকটি স্মরণ করেই ঠিক পরবর্তী প্যানেলে ঐ আসনটি (পুরুষায়িতবন্ধ) রূপায়িত করেছেন :

“জাতপ্রমং বীক্ষ্য পতিং পুরস্তী দেখ্যন্তরে বাহ্যরতেশতপ্তা।

কন্দর্প বেগাকুলিতা নতাজীকুবীত তুষ্ঠৌ পুরুষায়িতং সা ॥” ৬০ ॥

অর্থাৎ পূর্ববর্তী দৃশ্যে নায়ককে প্রান্ত দেখেই যেন : ‘সামিল বামা বিপরীত কাজ।’

চিত্র-৪০-এ আমরা চুয়নরত যে দম্পতিকে দেখেছিলাম তাদেরই বিস্তারিত রূপ চিত্র-৫৪-তে দেখা যাচ্ছে। এটি দণ্ডায়মান অবস্থায়—কোককপাণ্ডিত রচিত ‘রতিরহস্য’-শাস্ত্র মতে স্থিত (দণ্ডায়মান) আসনভুক্ত ‘ষিতল-আসন’। প্রকৃতির সম্পূর্ণ দেহভার নায়ক তার দুই করতলে গ্রহণ করেছে। চিত্র-৫৪-এ আমরা যে স্থিত আসনটি ইতিপূর্বে দেখেছিলাম সেটি ‘বাৎস্যায়ন’ তথা ‘অনঙ্গরঙ্গ’-মতে ‘বৃক্ষাধিরুদ্ধম্’ আসন :

“চরণকমলমেকেনাংলিগাংক্রম্যভতু’-

রপরপদসরোজে নাক্ষত্রশীতদুর্ভম্।

তরুমিব ভূজবল্ল্যাং পীডা চুয়নতাজী

কথিতমিহ মুনীশ্রেষ্ঠাঙ্ক বৃক্ষাধিরুদ্ধম্।” ৬১ ॥

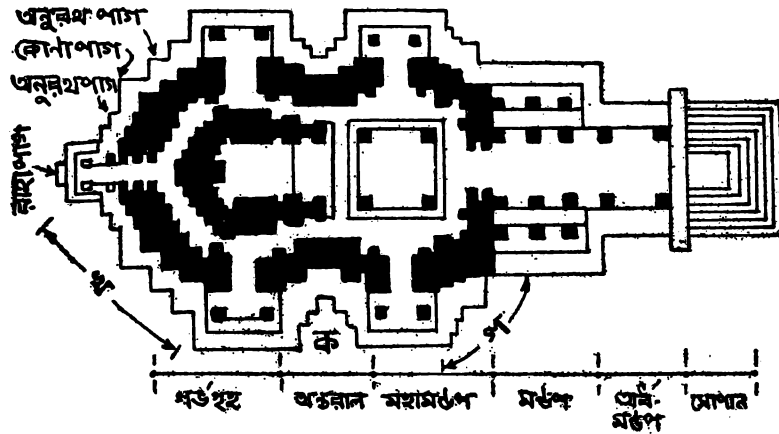
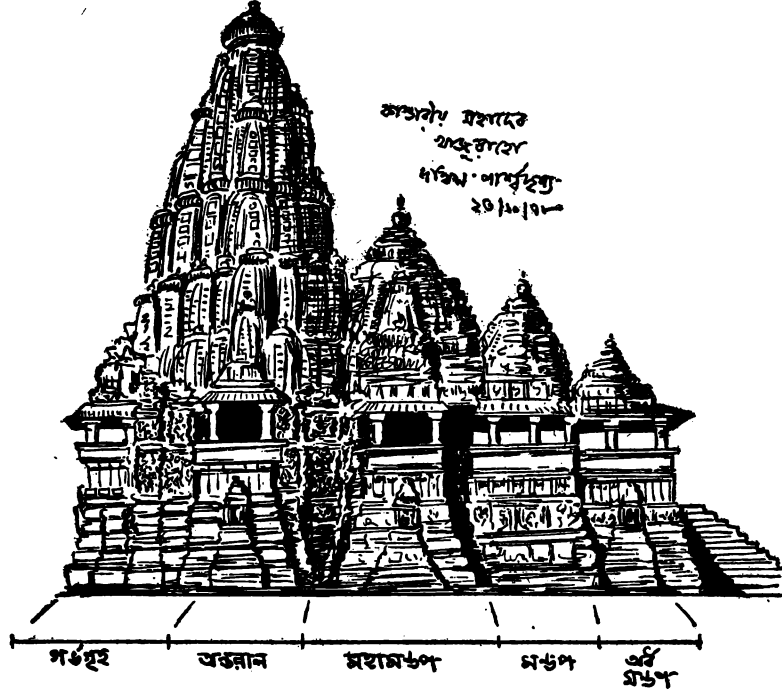
“পতির এক চরণে নিজ এক পদ স্থাপনা করে, এবং ষষ্ঠীয় পদ তার জানুতে সংস্থাপিত করে—যাকে যে ভঙ্গিতে লতা বেঁটন করে উঠে যায় সেই ভঙ্গিমান যখন নারিকা নারিককে আলিঙ্গনবদ্ধ করে চুষন করে তখন মহামুনির (বাৎস্যায়নের) নির্দেশে ‘বৃক্ষাধিমুঢ়’-আসন হয় ।”

উদাহরণ বৃদ্ধি করা নিম্নপ্রয়োজন । হেতু সেই একটাই—শারিত মৈথুনরত মৈথুন মূর্তিগুলিতে শুধুমাত্র মৈথুনক্ৰিয়াই বিজ্ঞাপিত । যৌনতা-অতিক্রান্ত শিম্পসৌকর্য সেগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত । আমি কোনার্ক জগমোহনের স্নাত-জগলের বৃহদায়তন দণ্ডায়মান (যথা চিত্র—৩৬, ৩৮ প্রভৃতি) মৈথুনরত মৈথুন মূর্তিগুলির কথা বর্তমানে বলছি না, বলছি অন্যান্য ক্ষুদ্রায়তন মূর্তিগুলির কথা, যেগুলি নিচের অংশে, অধিকাংশই রথচক্রের নৈমিতে খোদিত হয়েছে । বিপন্নিত-বন্ধ, পুরুষায়িত-বন্ধ, নাগর-সাধারণবন্ধ, অধোরত এমন কি ইংরাজীতে যাকে *Cunnilingus*, এবং *felatio* বলে । এগুলিতে যৌনতা-অতিরিক্ত, শিম্পরস কদাচিত দৃষ্ট হয় ।

সুতরাং সেগুলির উদাহরণ অথবা বিস্তারিত আলোচনা নিম্নপ্রয়োজন ।

॥ তের ॥
 ॥ খাজুরাহোতে মৈথুনবাদ ॥

পর্যায়ক্রমে এ পল্লিচ্ছেদে আমাদের যৌথ সৌনাচার বিষয়ে আলোচনা করার কথা। এবারও আমরা সেটা স্থগিত রেখে



চিত্র : ৬৮

কাগুরীয়া মহাদেব মন্দিরের পার্শ্বদৃশ্য ও ভূমি নকশা।

খাজুরাহো-দেউলগুলিতে মৈথুনবাদের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসটা খুঁজে দেখার চেষ্টা করব। কারণ ভারতীয় ভাস্করকে যদি

অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করতে হয় তাহলে আসামী খুঁজতে আমাদের তল্লাস করতে হবে পূর্বভারতে—আসামীর সাকিন হয় কোনার্ক, নয় খাজুরাহো। আমাদের মতে বৌথ-বৌনাচার পরিকল্পনা কলিঙ্গ তথা ভারতীয় ভাস্কর্যে সংক্রামিত হয়েছিল খাজুরাহো থেকে। কারণ আমাদের অনুসন্ধান,—পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে জেনেও আবার বলব—দশম-একাদশ শতাব্দীর পূর্বে কোনও ভারতীয় দেউলে বৌথ-বৌনাচার দৃশ্য ব্যাপক এবং দুঃসাহসিকতার নিদর্শন হিসাবে উৎকীর্ণ হতে দেখি না। ভারত-বুদ্ধগয়া-সংগী-অজন্তা থেকে শুরু করে আহিওল, বাদামী, পাট্টাকাদল, বিজয়নগর, হাম্পি, মহাবলীপুরম—কোথাও এ দুঃসাহসিকতা নেই। অথচ খাজুরাহোর দু-তিনশ বছর পরে মাত্র ষাটশ বৎসরে নির্মিত কোনার্ক মন্দিরে এর ব্যাপক ব্যবহার হতে দেখছি। সুতরাং খাজুরাহোকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখা দরকার।

যে ভূখণ্ডে আমরা বর্তমানে খাজুরাহোর মন্দিরগুলি দেখতে পাই, মহাভারতের যুগে তার নাম ছিল বৎসরাজ্য। পরবর্তীকালে এরই নাম হয় জেজাকভূক্তি। এখানে দশম-শতাব্দীতে গড়ে উঠেছিল এক শক্তিশালী রাজ্য—চাণ্ডীয়া, রাজবংশ। তাদের রাজধানী খাজুরাহোতে ছিল না। এখানে কোন রাজপ্রাসাদ, হাতিশালা, তোবাখানা, দুর্গ প্রভৃতি কোন কিছুই ভগ্নাবশেষ দেখতে পাই না। মন্দির যখন পাথরের তখন রাজশক্তির প্রয়োজনে ঐসব নিশ্চয়ই পাথরের সৌধ হত—তার কোন চিহ্ন খুঁজে না পাওয়ার মনে করছি—খাজুরাহো। ছিল নিতান্তই মন্দির নগরী, তার বেশী নয়। চাণ্ডীয়া রাজারা কোল-কাপালিক তত্ত্ব গোপন সাধন-ভজন করতেন। মন্দিরের আশেপাশে অনেক দেবদাসী থাকত। সম্ভবত রাজপুরুষেরা এখানে শুধু পূজা দিতে



চিত্র : ৬৯

শালভাজিকা ॥ লক্ষণ দেউক

এবং তান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাধন ভজন করতে সমাগত হতেন। রাজপুরুষদের সকলেই যে প্রকৃত ধার্মিক ছিলেন এমন মনে করার কারণ নেই—ধর্মের অজুহাতে, কোল-কাপালিক তত্ত্বের সাধন-ভজন করার সুবাদে তাঁদের কেউ কেউ যে বৌন কামলা-বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ নিতে দেবদাসীদের সংস্পর্শে এখানে আসতেন এমন মনে করাও অসঙ্গত নয়। সেই জাতের রাজপুরুষদের অতৃপ্ত বাসনার তীর্ষক প্রতিফলন হিসাবে মন্দিরগায়ে বৌনাচারের উপস্থিতি অন্যতম কারণ কিনা সেটা বিচার্য। যাই হোক, জেজাকভূক্তির অন্তর্গত এই ভূখণ্ডের নাম সে যুগে ছিল ‘খজুরবাহক’—যার থেকে ‘খাজুরাহো’ নামের উৎপত্তি।

কিংবদন্তী বলে, মর্ত্যের বালবিধবা সুন্দরী হৈমবতী ছিলেন, কলিঙ্গর মহারাজের রাজজ্যোতিষীর কন্যা। প্রথমত্রে রাজ-জ্যোতিষী নাকি একবার একটি অমাবস্যাতে পূর্ণিমারাত্রি বলে চিহ্নিত করেন। পিতাকে অসম্মান ও অপমানের হাত থেকে রক্ষা করতে হৈমবতী চন্দ্রদেবের শ্রবণ শুরু করলেন। শ্রবণে তুষ্ট হয়ে ঘোর অমাবস্যা রাতে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হল। রাজজ্যোতিষীর প্রতিপক্ষ দল—যারা বলেছিল সৌদীন অমাবস্যা, পূর্ণিমা নয়, তারা হল অপদম্ব। রাজজ্যোতিষীর সম্মান অলৌকিকরূপে রক্ষিত হল। কিন্তু এদিকে জ্যোতিষীর গৃহান্তান্তরে ঘটল অন্য একটি নাটক। চন্দ্রদেব বললেন, সুন্দরী, তোমার আহ্বানে আমি এসেছি। আমি-অতিথি। আমাকে পরিতুষ্ট করার দায় তোমার—

হৈমবতী বললেন, আমি সামান্য বালবিধবা, নিতান্ত দরিদ্র ঘরের মেয়ে—কেমন করে আপনাকে পরিতুষ্ট করব? কী আছে আমার সংসারে?

পূর্ণচন্দ্র সহাস্যে বললেন, চন্দ্রাননে, তোমার রক্তনডালা শূন্য হতে পারে, কিন্তু শরৎ অনঙ্গদেব তোমার বরঅঙ্গে স্তবকে-
স্তবকে যে সম্পদ সঞ্চিত করেছেন তাতে দেবতারও লুপ্ত হয়। তুমি আমাকে ভজনা কর—

কাহিনী দীর্ঘত্তর করে লাভ নেই—বালবিধবা হৈমবতী যে রসে বঞ্চিত
ছিল চন্দ্রদেবের আশীর্বাদে তাতেই অবগাহন স্নান করল। কালে হৈমবতী যখন
গর্ভিণী হয়ে পড়ে তখন সে চন্দ্রদেবকেই বলল : এখন উপায় ?

চন্দ্রদেব বললেন, তুমি চিন্তিত হয়ে না। তোমার গর্ভে যে সন্তান জন্মায়ে
সে সসাগর। ধরণীর অধীশ্বর হবে। কালে সে এই খজুরবাহক জনপদে একশতটি
মন্দির নির্মাণ করবে। তাতেই তোমার পাপ-স্ফালন হবে এবং তোমার স্বর্গধাম
অক্ষয় হবে।

দেবতার বরে হৈমবতীর সন্তানই হলেন এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।
কাহিনী অনুসারে জানা যাচ্ছে, মন্দিরগুলি নির্মিত হওয়ার সময় রাজমাতা তাঁর
ভিত্ত-মধুর অভিজ্ঞতার অকুণ্ট স্বীকৃতি দিতে মন্দিরের বিহীর্ণায়ে বিভিন্ন আসনগুলি
উৎকীর্ণ করান। যেন রোমান-ক্যাথলিক
তার 'কনফেশন' করছে।



চিত্র : ৭১

কণ্টকমোচনরতা

আমরা খাজুরাহোর ছয়টি মন্দিরে মিথুন-সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছি—ছয়টিই হিন্দু মন্দির; যে-হেতু
জৈনমন্দিরে শেষ দু-জাতের মূর্তি আদৌ নেই। পরিসংখ্যান-তথ্য পেশ করার পূর্বে মন্দিরগুলিকে কালানুক্রমিক ভাবে সাজিয়ে



চিত্র : ৭০

বংশীবাদিকা

কিংবদন্তী থাক, ইতিহাস বলছে—এই
অঞ্চলে চাণ্ডেল্য রাজবংশ দশম শতাব্দীর
প্রথমপাদ থেকে একাদশ শতাব্দীর মাঝা-
মাঝি পর্যন্ত সগৌরবে রাজত্ব করে যান।
ঐ সময়কালের ভিতরেই মন্দির-নগরী
খাজুরাহোর জন্ম ও বিকাশ। এখানে আনুমানিক আশি পঁচাশিটি মন্দিরের
অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে, যার ভিতর বিশ-পঁচিশটি আজও টিকে আছে। আরও
লক্ষণীয়, ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের নানান মন্দিরের পাশাপাশি জৈনরাও এখানে অনেকগুলি
মন্দির নির্মাণ করান। সেগুলি স্থাপত্য-ভাষ্যে খাজুরাহো শৈলীর একান্ত অনুসারী,
অথচ আশ্চর্য, সে মন্দিরগুলিতে মিথুনবাদ বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করা
হয়েছে। সে মন্দিরগুলিতে প্রথম তিন জাতের মিথুনই উৎকীর্ণ করা হয়েছে—
মুগলমূর্তি, উত্তোজিত মিথুন এবং শৃঙ্গাররত মিথুন। মিথুনরত মিথুন বা যৌথ
যৌনাচার দৃশ্য আমি ব্যতিক্রম হিসাবেও উদ্ধার করতে পারিনি। বেশ বোঝা যায়,
জৈন-সম্ম্যাসীরা কোল-কাপালিক তত্ত্বের চিন্তাধারায় আদৌ প্রভাবিত হন নি। জৈন
ভাস্করদের এই স্বকীয়শৈলী ও দৃঢ়তার কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার। এই তত্ত্বটি
খাজুরাহো-বিষয়ক শিল্পগ্রন্থে কেন যে লিখিত হয়নি বুঝে উঠতে পারি না।

নেওয়া ভাল। আমাদের উদ্দেশ্য, খাজুরাহো ভাস্কর্যের বোনভা কলিঙ্গে সংক্রামিত হয়েছিল কিনা বুঝে নেওয়া, তাই সমসাময়িক কলিঙ্গ দেউলের নামও তালিকার উল্লিখিত হল। বলাবাহুল্য, সময়কাল সন্দেহাতীতরূপে নির্ধারিত হয়নি। পুরাতত্ত্ব বিভাগে যেভাবে ধরা হয় সেই হিসাবেই সাজিয়েছি :



চিত্র : ৭২

প্রতীক্ষারতা

সময়কাল (আনুমানিক)	রাজার নাম	খাজুরাহের মন্দির	সমসাময়িক কলিঙ্গ দেউল
৯১৭-৯২৫	হর্ষ	হনুমান, ব্রহ্মা	
৯২৫-৯৫০	যশোবর্মন	লক্ষ্মণ	মুক্তেশ্বর
৯৫০-১০০২	ধ্বজ	বিশ্বনাথ, পার্শ্বনাথ (জৈন) বিদ্যানাথ (ঐ)	ব্রহ্মেশ্বর
১০০২-১০১৭	গণ্ড	দেবী জগদম্বা চিগুগুপ্ত	গৌরী রাজারানী
১০১৭-১০২৯	বিদ্যাধর	কাণ্ডারীয় মহাদেব	কেদারেশ্বর
১০২৯-১০৫০	বিভিন্ন	বামন, যাবরী আদিনাথ (জৈন) চতুর্ভুজ দুলাদেও	

কলিঙ্গ-স্থাপত্য বিবর্তিত হতে কয়েক শতাব্দী সময় লেগেছিল—ক্ষুদ্রায়তন একক দেউল শত্নেশ্বর থেকে ঐত-দেউল পরশুরামেশ্বর অতিক্রম করে পূর্ণায়তন চার-দেউল অনন্ত-বাসুদেবের পরিকল্পনার উপনীত হতে কলিঙ্গ-স্থপতির সময় লেগেছিল চার-পাঁচশ বছর। তুলনায় একক-দেউল ব্রহ্মামন্দির থেকে ঐত-দেউল অতিক্রম করে পূর্ণায়তন চার দেউলে উপনীত হতে খাজুরাহো-স্থপতির সময় লাগল মাত্র একশ বছর। শেষ পরিণামে কলিঙ্গে যেমন দেখেছি একই কেন্দ্রীয় অক্ষরেখায় চার-দেউল : ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির, জগমোহন, বিমান, খাজুরাহোতে তেমনি শেষ পর্যায়ে পেলাম একই কেন্দ্রীয় অক্ষরেখায় পরপর চারটি দেউল : অধর্মগুপ, মণ্ডপ, মহামণ্ডপ ও বিমান (চিত্র—৬৮)।

খাজুরাহো স্থাপত্যের ক্রমবিবর্তন বর্তমান প্রবন্ধে নিম্নপ্রয়োজন, যেটুকু উল্লেখ করলাম তা শুধু জানাতে যে, মন্দির পরিকল্পনার দিক থেকে খাজুরাহো স্থপতিবিদ সমান্তরাল চিন্তা করেছেন, একই জাতের সমস্যা একই পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে সমাধান করেছেন। লক্ষণীয়, কলিঙ্গ-ভাস্কর চার-দেউলের পরিকল্পনা করার পূর্বেই খাজুরাহোতে তা সগৌরবে নির্মিত হয়েছে। ভাস্কর্য-চিন্তা অর্থাৎ মিথুনবাদ খাজুরাহো থেকে কলিঙ্গে আদৌ সংক্রামিত হয়েছিল কিনা বুঝে নিতে তথ্যটা হয়তো কাজে লাগবে, অর্থাৎ পরিকল্পনের মধ্যে চেনা-জানা ছিলই।

হ্রাপতা না হলেও খাজুরাহো ভাস্কর্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য। খাজুরাহো ভাস্কর্যকে আমরা মূল দুটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি : আদি-রসাত্মক এবং অন্যান্য রস-সজাত।

কলিঙ্গ-ভাস্কর্যের মতো এখানেও আদি-রসাত্মক মূর্তিগুলি আবার স্পষ্টতই স্বিধারায় বিভক্ত—এক জাতের উৎস রমণী-সৌন্দর্য, সেখানে তারা একক ; দ্বিতীয় জাত হচ্ছে ‘মিথুন’, পণ্ড প্রকারের। প্রথম জাতের মূর্তিগুলিকে আমি সম্মিলিতভাবে সুরসুল্লরী বলাচ্ছি। তাদের পরিকল্পনায় কলিঙ্গ ও খাজুরাহোতে প্রায় সমান্তরাল চিন্তা করা হয়েছে। যেমন দুই শৈলীতেই সুরসুল্লরীগুলিকে এভাবে প্রণীত করা চলে :

সুরসুল্লরী :

প্রসাধনরতা— দর্পণে মুখ দেখছে, অথবা সীমন্তে সিন্দুর-বিন্দু দিচ্ছে (চিত্র-৭৭, ৭৮)।

সন্তানবৎসলা—সন্তানকে স্তন্যদান করছে, খেলা করছে।

অভিসারিকা— নৃপুং খুলে ফেলছে, কণ্টক উৎপাটন করছে (চিত্র-৭৯, ৭৬)।

নৃত্যগীতরতা— নানানজাতের বাজনা বাজাচ্ছে, বা নাচছে (চিত্র-৭০, ৭৫)।

অলসকন্যা— প্রতীক্ষারতা, আগ্রহশয়না, শালভাজিকা প্রভৃতি (চিত্র-৬৯, ৭২)।



চিত্র : ৭০

উত্তেজিত মিথুন ॥ লক্ষণ দেউল



চিত্র : ৭৪

উত্তেজিত মিথুন ॥ পাশ্বনাথ

বিষয়বস্তু বা পরিকল্পনার দিক থেকে সুরসুল্লরীদের রূপায়নে কলিঙ্গ ও খাজুরাহোতে আপাত সাদৃশ্য থাকলেও—তীক্ষ্ণ অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করলে আমরা কিছু বৈপরীত্যও অনুভব করব। দু-দল ভাস্করই নারীদেহের সৌন্দর্যকে মূলধন করে ছেনি-হাতুড়ি ধরেছেন, তবু তাঁদের শৈলীতে কিছু পার্থক্য আছে। তালিকাকারে সেগুলি, আমার যা মনে হয়েছে তা নিম্নোক্ত প্রকার :

- (i) কলিঙ্গে (একমাত্র ‘রাজারানী’ দেউলবাদে) সুরসুল্লরীরা কিছু স্থূলকায়—‘স্থূলকায়’ শব্দটা ঠিক সুপ্রযুক্ত নয় : বলা যায়, ‘প্রাণীভারাদলসগমনা’। তারা যেন নাটকের নায়িকা—পরিপূর্ণ যৌবনা, স্তোকনন্না প্রভৃতি। কেবল বিশেষে তারা সাবলীল, তরী, এমন কি নাটকের নায়িকার পরিবর্তে তারা নৃত্যনাট্যের নটী। তুলনায় খাজুরাহোর সুরসুল্লরীরা যেন ‘ভেরা তেরেকোভা’। তারা রীতিমতো acrobatic, সার্কাসে তারের খেলা দেখাতে পারে, ব্যাল-নাচের ভারহীনতা তাদের মজ্জাগত। খাজুরাহোর নায়িকা যেভাবে নিজ অক্ষরের চারিদিকে ক্রমাগত পাক খেয়েছে একমাত্র রাজারানী ব্যতিরেকে কলিঙ্গ দেউলে সেটা আমার নজরে পড়েনি। চিত্র-৬৯ থেকে

চিত্র-৭২-এর চারটি সুরসুন্দরী কলিঙ্গ-খাজুরাহো মিলিত শৈলীর। তারা কোথা থেকে সংকলিত বলা কঠিন ; [আমি চিত্রগুলি বাদুঘরে এঁকেছি] কিন্তু চিত্র ৭৫ থেকে চিত্র ৭৮ নিঃসন্দেহে খাজুরাহো শৈলীতে



চিত্র : ৭৫

সুরসুন্দরী ॥ পুষ্পধন্য

দৃষ্টিভঙ্গির নানান রকম বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ চিত্র-৭০ উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি কাশ্মীরের মহাদেব মন্দির থেকে সংকলিত। শিল্পী তাঁর মডেলকে দেখেছেন সম্পূর্ণ পিছন থেকে। এতটা দুঃসাহসিকতা কলিঙ্গে কদাচিৎ দেখা যায়। সম্পূর্ণ পেছন থেকে খোদাই করা এই মূর্তিটি এ মন্দিরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য-উদাহরণ।

সুরসুন্দরী ও মিশ্রনমূর্তিগুলিকে যদি আদিরসসজ্জাত বলে ধরে নিই তাহলে বাদ্যবাক্য ভাস্কর্য নিদর্শনগুলিকে মোটামুটি এভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে :

অন্যান্যরস :

দেবমূর্তি—গর্ভগৃহের মূল দেবতা ছাড়াও মন্দিরের বহু অংশে নানান দেবদেবীর মূর্তি। অধিকাংশই চতুর্ভুজ এবং দণ্ডায়মান, আভঙ্গ্যামের দেবমূর্তি। তাঁদের আয়ুধ, উপকরণ, বাহন, চারিগ্রন্থক বৈশিষ্ট্য—যেমন অগ্নিদেবের অশ্রু, কুবেরের ক্ষীতোদর প্রভৃতি—শাস্ত্রোক্ত নির্দেশানুসারে।

নির্মিত। তারা যদি রাজারানী মন্দির থেকে সংকলিত হয়, তবু বলব তারা-খাজুরাহো-শৈলী প্রভাবিত। লিঙ্গরাজ, ব্রহ্মেশ্বর প্রকৃতি মন্দিরে কচিৎ দু-একটি এমন উদাহরণ আছে—যা রাজারানীর অনুপ্রেরণায় উৎকীর্ণ বলে মনে হয়। চিত্র-৭৫-এর সুরসুন্দরীর ধনুকটি পুষ্পধন্য বলেই মনে হয়। লক্ষ্যস্থল নায়কের হৃদয়ের পরিবর্তে পশুপক্ষী হলে ঐ নৃত্যস্থল প্রয়োজন হত না। চিত্র-৭৬-র সুন্দরীর এক পায়ে নৃপুর—সে অভিসারিকা। পাছে নৃপুর-নিকনে প্রতিবেশীর নিদ্রা ভগ্ন হয়, তাই তার ঞ সাবধানতা। চিত্র-৭৮-এর নায়িকা স্নানান্তে কবরী-বন্ধনরত। তার সিন্ধু-কবরীর মোচড়ানো ভঙ্গির সঙ্গে সম্পূর্ণ দেহাবয়ব একতান রচনা করেছে। চিত্র-৭৭-এর নায়িকা সীমস্তে সিন্দুর কিছু লেপনে বাস্ত ; সে প্রসাধনরত।

(ii) খাজুরাহোতে 'সন্তান-বৎসলা' সুরসুন্দরীর পরিকল্পনা অপেক্ষাকৃতভাবে কম, খুবই কম। কলিঙ্গ-ভাস্কর এদিক থেকে পরিণত মানসের স্বাক্ষর রেখেছেন ; নৃত্যগীত-প্রসাধন-অভিসারই যে রমণীয়-চিত্তার শেষ কথা নয়, এ বোধ তাঁর জন্মেছে—সৌন্দর্য থেকে খাজুরাহো শিল্পী যেন তারুণ্য অতিক্রমই করেননি ; তাই পরিণত-বৌবনার সন্তানকোড়ে মাতৃমূর্তি তাঁর পরিকল্পনায় অনুপস্থিত।

(iii) অপরপক্ষে খাজুরাহো-ভাস্কর



চিত্র : ৭৬

সুরসুন্দরী ॥ অভিসারিকা

কম্পলোক : বাস্তব জগতে দেখা যায় না। এ জাতীয় ‘কম্পিত মূর্তি’—তার ভিতর ‘শাদুল’ এবং ‘ব্যাল’ বা বিরালই সমৃদ্ধ। এ কম্পনাটি কলিঙ্গের আছে। দাক্ষিণাত্যের ‘কীর্তিমুখ’ অলঙ্করণ কলিঙ্গের তুলনায় কম। স্বক-গন্ধর্ব-কিমর প্রভৃতিও আছে।

রাজসিক : শিকার, যুদ্ধদৃশ্য, রাজসভা, ইত্যাদি। লক্ষ্মণ দেউলের বাহিরের প্রাচীরে তার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। একটি নমুনা চিত্র-৭৯-তে সঙ্কলিত হল—রাজকুমার একদল সৈনিক শিবিরে প্রত্যাবর্তন করছে।

আদি রসাত্মক মূর্তির সঙ্গে অন্যান্য রসসজ্জাত মূর্তির অনুপাতটা কী রকম তা কলিঙ্গের পরিমাপ করে উঠতে পারিনি। খাজুরাহোর একটিমাত্র মন্দিরে আমি সেটা গুণে দেখেছিলাম। বিশ্বনাথ-দেউলের বিহীভাস্তিস্থিত মূর্তিগুলিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে গুণিত করে যে পরিসংখ্যান পেয়েছি তা নিম্নোক্ত প্রকারের :

আদিরস :	(ক) সুরসুন্দরী ... ৮৬টি ... ২৬.৭%	} ৫৪%
	(খ) মিথুন ... ৮৮টি ... ২৭.০%	
অন্যান্যরস :	দেবমূর্তি, কম্পমূর্তি প্রভৃতি ১৪৬টি...	৪৬%

অর্থাৎ আদিরসই সংখ্যা গরিষ্ঠ এবং মিথুন পশুমাংশের অধিক।



চিত্র : ৭৭

সুরসুন্দরী ॥ সীমান্তিনী



চিত্র : ৭৮

সুরসুন্দরী ॥ কবচীবন্ধনরতা

সময়ের ব্যাপ্তিতে সংক্ষিপ্ততর হওয়ার কলিঙ্গের মতো খাজুরাহোতে মিথুনবাদের বিবর্তনের ধারাবাহিকতা ভৌল করা অসুবিধাজনক। কলিঙ্গের ভাস্কর ক্রমে ক্রমে নারিকার সলঙ্কভাবটা অপনোদন করেছেন। খাজুরাহোতে বিবিভিন্নজাতের মিথুন প্রায় একই সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছে। হনুমান বা ব্রহ্মামন্দিরের পরেই লক্ষ্মণ দেউলে উৎকীর্ণ করা হয়েছে পাঁচজাতের মিথুনই। তবু আমরা বিভিন্ন উদাহরণ চরন করে নারিকার পক্ষে উত্তেজনার ক্রমবিন্যাসটা দেখাতে পারি। কলিঙ্গের ক্ষেত্রে যেমন দেখেছিলাম, (চিত্র-২০ থেকে চিত্র-২৮) খাজুরাহোর ক্ষেত্রেও তেমনি চারটি উদাহরণ সঙ্কলিত করা গেল : চিত্র-৭০, ৭৪, ৮০ এবং ৮১।

চিত্র-৭০-এর নারিকার সঙ্গে চিত্র-২৫-এর নারিকার সাদৃশ্যটা লক্ষ্য করে দেখুন। উভয় ক্ষেত্রেই নারিকা বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। খাজুরাহো মূর্তিষয়ের কবচীবন্ধন রীতিটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

চিত্র-৭৪-এর নারিকার মধ্যদেশ গ্রিভঙ্গঠামে নারকের বিপরীতি দিকে ঝুঁকেছে। অবনীন্দ্রনাথের সূত্রানুসারে বলা যায়, নারিকা পূর্ব-মুহূর্তেই হয় ভো। অভিমানিনী ছিল, বর্তমানে যে সে তা নয় তা তার দক্ষিণবাহুর আবেষ্টনীতেই প্রকাশ।

চিত্র—৮০-এর নায়িকা স্বিধাঙ্কন সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে ফেলেছে। এই ভঙ্গিমাটি খাজুরাহো শিল্পীর বড় প্রিয়। আলোচ্য মূর্তিটি যদি দেবী জগদম্বা মন্দিরে খুঁজে বার করতে পারেন তাহলে বিশেষভাবে একটি জিনিস লক্ষ্য করবেন : পুরুষ-মূর্তির বুকে প্রতিহত হয়ে নায়িকা-মূর্তির সুডৌল বামস্তনটি কীভাবে পিষ্ট হয়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় না যে, ঐ বর-অঙ্গটি প্রস্তরখণ্ড—মনে হয়, তা রক্ত-মাংস-চর্মের উপাদানে সৃষ্ট। নায়কের বাম হস্তের মুদ্রাটিও লক্ষণীয়। সে নরসহচরীর বেণীটিকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরেছে।

চিত্র—৮১ আর একটি অপূর্ব মিলনদৃশ্য। এটিকে তুলনা করতে পারেন কোনার্ক জগমোহনে ইন্ড দুগারের আঁকা ছবিটির সঙ্গে (চিত্র—২৮)। উভয় ক্ষেত্রেই রমণী রত্নাতুরা।

মিথুন মূর্তিগুলির বিবর্তনধারাকে ভৌল করতে আমি যে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছি এবার সেটা তালিকাকারে প্রকাশ করি।

মন্দিরের নাম	রাজার শাসনকাল [আ: নির্মাণকাল]	যুগল মূর্তি	উত্তেজিত মিথুন	শৃঙ্গাররত্ন মিথুন	মৈথুনরত্ন মিথুন	যৌধ যৌনাচার	যৌনভার মান
লক্ষণ	১২৫—১৫০	১০ ৩৫%	১৮ ৪৮%	২ ৫.৭%	২ ৫.৭%	২ ৫.৭%	৩১.৮
বিখানাথ	১৫০—১০০২	৩০ ৩৪%	৪২ ৪৭%	৬ ৬.৮%	৬ ৬.৮%	৪ ৪.৬%	৩১.১
চিগুগুপ্ত	১০০২—১০১৭	৩ ৫.৭%	৩১ ৭৩-৬%	৯ ১৭%	২ ৩.৭%	০ —	৪৩.৭
জগদম্বা	ঐ	৭ ৮.৯%	৪৪ ৫৫.৭%	২০ ২৫.৩%	৮ ১০.১%	০ —	৪৭.৩
কান্তারী	১০১৭—১০২৯	৩৭ ৪৫.৬%	২৮ ৩৪.৬%	৬ ৭.৪%	৪ ৫%	৬ ৭.৪%	৩৮.৮
চতুর্ভুজ	১০২৯—১০৫০	১১ ১১.৬%	১ ৮.৪%	০ —	০ —	০ —	২১.৬

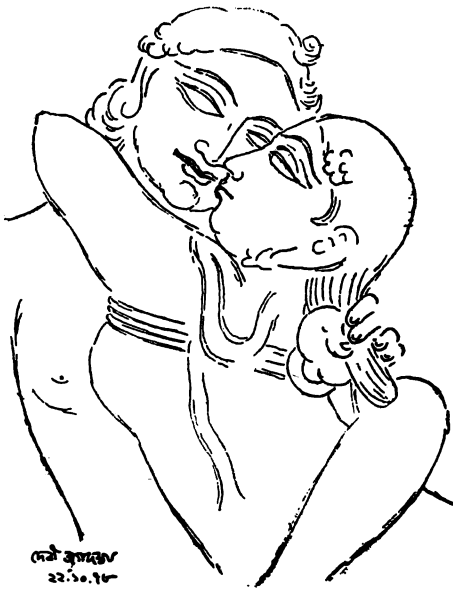
অঙ্কের ফলাফলটা গ্রাফের আকারে রেখান্বিত করলে (চিত্র—৮২) আমরা দেখতে পাব, খাজুরাহোতে যৌনতা কলিক্সের মতো সর্বসময়েই ক্রমবর্ধমান নয়। প্রথম যুগ থেকে শুরু করে জগদম্বা মন্দির গঠন পর্যন্ত তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে, এবং তারপর

সেটা কমেছে। সবচেয়ে অধিক করা মন্দির—চতুর্ভুজ-দেউল। আমার গণনা অনুযায়ী এ মন্দিরে ১৬০টি মূর্তি আছে,



চিত্র : ৭৯ ॥ রণকান্ত সেনাদল ॥ লক্ষ্মণ-দেউল

তার ভিতর মাত্র ১১টি হচ্ছে যুগল মূর্তি এবং একটি মাত্র উত্তোজিত মিথুন। শৃঙ্গাররত বা মৈথুনরত মূর্তি আদৌ নেই—



চিত্র : ৮০ ॥ আলিঙ্গনাবদ্ধ মিথুন ॥ দেবী জগদম্বা



চিত্র : ৮১ ॥ চুম্বন-ভূষিতা ॥ দেবী জগদম্বা

যৌথ যৌনাচারের তো কথাই ওঠে না। শাস্ত্রকার বলেছিলেন, কামের দ্বারা কামনার নিরসন হয় না, 'হবিষ্য কৃষ্ণবন্ধে'ব

কোথাও বা 'ঘে'বা'ঘে'বি। আমরা বুঝতে পারি—কোনটা গ্রামাঞ্চল, কোনটা শহর। খাজুরাহোর প্রতিটি মন্দিরে তেমন তিন-দুটুকুনে ছয়টা শহরাঞ্চল আছে, আর বাদব্যাকি অংশ মঞ্চস্থল। প্রথমেই কাণ্ডারীর মহাদেব মন্দিরের ভূমিনকশাটা লক্ষ্য করুন (চিত্র—৬৮)। মহামণ্ডপ ও গর্ভগৃহের অন্তর্বর্তী 'ক'-চিহ্নিত অংশটা হচ্ছে প্রধান শহর—দু-পাশে দুটি। উত্তরে এবং দক্ষিণে, যেহেতু প্রতিটি দেউলই পূর্বমুখী। মূর্তির ভীড়ের অনুপাতে তারপর স্থান হওয়া উচিত 'খ'-চিহ্নিত অংশ অর্থাৎ বিমানের দুই কোণায়। তারপর 'গ'-চিহ্নিত অংশ—যেখানে মণ্ডপ এসে মহামণ্ডপে মিশেছে। বাদব্যাকি অংশে মূর্তিগুলি ইতস্ততঃ বিকিণ্ড অথবা সারিবদ্ধভাবে সাজানো।

বিবর্তনটা দেখাতে সুবিধা হবে মনে করে মন্দির-অনুপাতে আলোচনা না করে, অংশ অনুপাতে আলোচনা করছি; অর্থাৎ লক্ষণ, বিব্রনাথ ও কাণ্ডারীর মন্দিরের 'ক' চিহ্নিত প্রধান অংশের বিন্যাসটা প্রথমে আলোচনা করছি।

'ক'-চিহ্নিত অংশ : লক্ষণ-দেউল : এই কেন্দ্রীয় অংশটিতে আছে দুই সারি মূর্তি (চিত্র—৮০)। এক-একদিকে পাঁচ-দুটুকুনে দশটি প্যানেল এবং কেন্দ্রীয় অবস্থানে দুটি প্যানেল।

দেবমূর্তি										
মুরসুন্দরী	দ্যাল	মুরসুন্দরী	দেবতা	মুরসুন্দরী	নারী-পুরুষের সম্মাহার [যৌনতাবজিত]	মুরসুন্দরী	দেবতা	মুরসুন্দরী	দ্যাল	মুরসুন্দরী
মুরসুন্দরী	উত্তেজিত	মুরসুন্দরী	দেবতা	মুরসুন্দরী	যৌথ যৌনচার	মুরসুন্দরী	দেবতা	মুরসুন্দরী	উত্তেজিত	মুরসুন্দরী

চিত্র : ৮০ ॥ কেন্দ্রীয় অংশে মূর্তির বিন্যাসছন্দ ॥ লক্ষণ-দেউল

সু = সুরসুন্দরী

উ = উত্তেজিত মিথুন

বি = বিরাল

দে = দেবমূর্তি

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, কেন্দ্রীয় অক্ষরেখার বামদিকের অংশ রসের বিচারে দক্ষিণ দিকের অংশের দর্পণ-প্রতিবিম্ব। যেমন ধরা যাক, টেক্সরী মূর্তির থেকে বামদিকে নিচের সারির চতুর্থ মূর্তিটি যদি উত্তেজিত মিথুন হয় তাহলে অনায়াসে বলে দেওয়া যায় দক্ষিণ দিকের নিচের সারির চতুর্থ মূর্তিটিও তাই হবে। অথচ তারা একে অপরের নয়নগ্রাহ্য দর্পণ-প্রতিবিম্ব নয়। হয়তো ঐ দুটি মিথুনের দুটিতেই নারিক। বামে আছে—কিন্তু তারা একজন 'যুগলমূর্তি' অপরজন 'উত্তেজিত মিথুন' নয়। এই অদ্ভুত বিন্যাসছন্দ কলিত্রের কোনও মন্দিরের নেই, অথচ খাজুরাহোর প্রতিটি মন্দিরে আছে।

এবার কেন্দ্রীয় অবস্থানের মূর্তি তিনটিকে লক্ষ্য করুন। উপর থেকে প্রথমে একটি দেবমূর্তি, তার নিচে নারী-পুরুষের

সমাহার, যদি ও তারা বোঁনাচারী নয়। এবং সর্ব নিম্নে একটি বৌধ বোঁনাচার দৃশ্য। আমার অনুসন্ধান খাজুরাহোতে—শুধু খাজুরাহোই বা বলি কেন, ভারতীয় দেউলে এটি প্রথম-উৎকর্ণ বৌধ-বোঁনাচার ভাস্কর্য। ‘এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিয়া’ মতে লক্ষণ দেউল ১৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত। অর্থাৎ রাজা যশোবর্মনের রাজত্বকালে এর নির্মাণ শুরু এবং রাজা ধর্মের শাসনকালের চতুর্থবর্ষে এর সমাপ্ত। ফলে বলা মুশ্কিল কৃতিত্বটা কে দাবী করবেন—যশোবর্মন, না ধর্ম। কেন্দ্রীয় প্যানেলে উপর থেকে নিচে বোঁনতার ক্রমবৃদ্ধি দেখে এমন অনুমান করা যেতে পারে যে, শিল্পী তিনটি ধাপে ক্রমাবনতির একটি তীর্থক ইঙ্গিত দিয়েছেন; যেন স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল কিম্বা সত্ত-রজ-তম। স্বীকার করি, এ আমার নিছক কামি-কল্পনাও হতে পারে। কিন্তু রাজাজ্ঞায়, ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি কাপালিকদের নির্দেশে ভাস্করকে এই বৌধ-বোঁনাচার মূর্তি নির্মাণে বাধ্য করা হয়ে থাকে তাহলে এই জাতীয় বিন্যাসের মাধ্যমেই বৃদ্ধমান শিল্পী ভবিষ্যৎ কালের কাছে তাঁর নীরব প্রতিবাদ পৌঁছে দেবার চেষ্টা করবেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

‘ক’-চিহ্নিত অংশ : বিশ্বনাথ দেউল : বিশ্বনাথ দেউল আন্দাজ পাঁচশ বছর পরে নির্মিত। এখানে দেখছি, দুই-সারির বদলে তিন-সারি মূর্তির অবতারণা করা হয়েছে এবং এক-এক দিকে পাঁচটি নয়, আটটি প্যানেল। ফলে কেন্দ্রীয় তিনটি প্যানেল বাদ দিলেও সর্বসমেত প্যানেলের সংখ্যা $2 \times 3 \times 4 = 24$ টি।

৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
দেবতা	মুগ্ধমূর্তী	মুগ্ধমূর্তী	দেবতা	দেবতার মুগ্ধমূর্তী	মুগ্ধমূর্তী	দেবতা	মুগ্ধমূর্তী	মুগ্ধমূর্তী	দেবতা	মুগ্ধমূর্তী	মুগ্ধমূর্তী	দেবতা	মুগ্ধমূর্তী	মুগ্ধমূর্তী	দেবতা
দেবতা	মুগ্ধমূর্তী	মুগ্ধমূর্তী	দেবতা	বিরাম	মুগ্ধমূর্তী	দেবতা	মুগ্ধমূর্তী	মুগ্ধমূর্তী	দেবতা	মুগ্ধমূর্তী	মুগ্ধমূর্তী	দেবতা	মুগ্ধমূর্তী	মুগ্ধমূর্তী	দেবতা
দেবতা	মুগ্ধমূর্তী	মুগ্ধমূর্তী	দেবতা	উত্তোজিত মিথুন	মুগ্ধমূর্তী	দেবতা	মুগ্ধমূর্তী	মুগ্ধমূর্তী	দেবতা	মুগ্ধমূর্তী	মুগ্ধমূর্তী	দেবতা	মুগ্ধমূর্তী	মুগ্ধমূর্তী	দেবতা

চয় : ৮৪ ॥ কেন্দ্রীয় অংশে মূর্তির বিন্যাসছন্দ ॥ বিশ্বনাথ দেউল

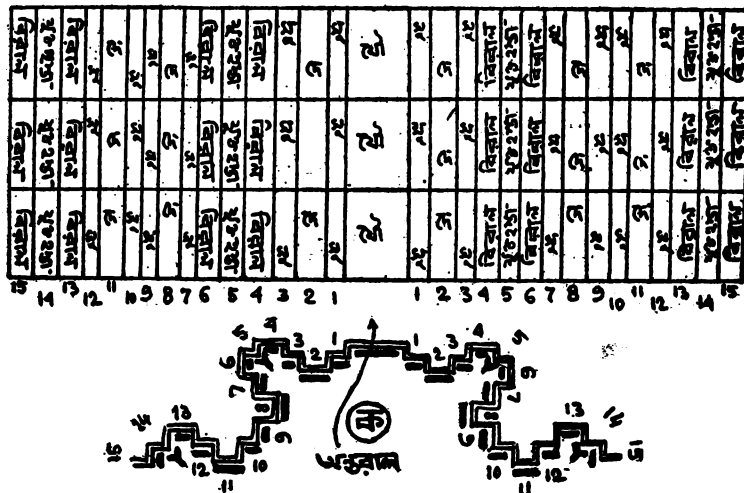
এবারও লক্ষ্য করে দেখুন, কেন্দ্রীয় অক্ষরেখার দু-পাশে মূর্তিগুলির সাজানোর কায়দায় কী সুন্দর একটা ছন্দ আছে। ছন্দটা রৈখিক নয়, রসের; ভঙ্গির নয়, ভাবের। দেবতা-বিরাম ইত্যাদি যথেষ্টবিহারী নয়, তারা সুসম-ছন্দে সুবিন্যস্ত। আর একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে বাধ্য হচ্ছি : মিথুন-মূর্তিগুলি তাদের বোঁনতার তীব্রতা অনুসারে, অর্থাৎ তাদের যে শ্রেণী বিন্যাস আমি এ গ্রন্থে ‘আঁবিটারালি’ বা মনগড়া-ভাবে গ্রহণ করেছি, সেই শ্রেণীবিন্যাস অনুসারে সজ্জিত। অর্থাৎ উত্তোজিত মিথুনের দর্পণ-প্রতিবিম্ব উত্তোজিত মিথুন। শৃঙ্গাররত মিথুনের দর্পণ-প্রতিবিম্ব শৃঙ্গাররত মিথুন। কেমন করে এমনটা হল? নিতান্ত কাকতালীর? আমি পর পর চারটি মন্দিরে চার দুকুনে আটটা উদাহরণে অন্তত কয়েকশত প্যানেলে ঐ ছন্দ মেনে সাজানো দেখেছি। কয়েক শত মূর্তি! এ তো কাকতালীর হতে পারে না। তবে কি ধরে নেব : যদিও আমাদের শিল্প-সমালোচনা-সাহিত্যে আমরা গত দেড়শ বছরের ভিতর এ জাতীয় শ্রেণীবিন্যাস মেনে নিয়ে মিথুন-মূর্তিগুলিকে তোল

করিনি, তবু তদানীন্তন শিল্পীর অন্তরে রসের বিচারে, আদিরসের পরিমাণে ভিন্ন-ভিন্ন মিথুনের ভিন্ন ভিন্ন মূল্য আরোপিত হয়েছিল ?

আরও একটা কথা : সুরসুল্লরীদের বিন্যাস কিন্তু ঐ প্রণীত্বীকৃতি দিয়ে নয়। অর্থাৎ প্রসাধনরতার দর্পণ-প্রতিবিম্ব কখনও অভিসারিকা, কখনও শালভঞ্জিকা। এজন্য আরও মনে হয়, মিথুন মূর্তিগুলির বিন্যাস কাকতালীয় নয়, সম্ভাবনকৃত।

কেন্দ্রীয় অংশের তিনটি প্যানেলের প্রথম দুটিতে উপর থেকে যৌথ বোনাচার দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি ; নিম্নতম প্যানেলে এক-দেবতার দু-পাশে দুই দেবী। তাঁরা বোনাচাররত নন।

ক-চিহ্নিত অংশ : কাণ্ডারীয় মহাদেও দেউল : আরও প্রায় অর্ধশতাব্দী পরের কথা। মূর্তি তিনসারিই আছে বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে যৌথ-বোনাচার পরিবর্তন। কেন্দ্রীয় প্যানেলের তিনটি খাপই অধিকার করে বসেছে।



চিত্র : ৮৫

কাণ্ডারীয় দেউলের কেন্দ্রীয় অংশের মূর্তির বিন্যাসছন্দ

যৌ—যৌথ বোনাচার

দে—দেবতা

সু—সুরসুল্লরী

অর্থাৎ এ মন্দিরে যৌথ-বোনাচারের প্যানেল সংখ্যা হজ্জ—উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্ব সমেত, তিন দুকুনে ছয়টি। প্রতিটি চৌখুঁপিতে চারজন মানুষ—দুটি নর, দুটি নারী। তাদের উপস্থাপনা—‘নর-নারী-নর-নারী’ এই পর্যায়ক্রমে। কার্লে চৈতোর প্রবেশ পথেও ঐ পর্যায়ে নর-নারীর মূর্তি আছে—কিন্তু তারা দু-জোড়া মিথুন মাত্র ; এরা তা নয়। এরা প্রত্যেকে একাধিক বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে বোনাচার-রত। ক-চিহ্নিত অংশে এবার সর্বসমেত তিরানব্বইটি প্যানেল। তাদের বিন্যাসছন্দ চিত্র—৮৫-এ সূচীত হয়েছে।

প্রতিটি দেবমূর্তি আভরণে সমৃদ্ধ, চতুর্ভুজ মূর্তি। কেন্দ্রীয় ক-চিহ্নিত অংশে গুণে দেখুন, সর্বসমেত ১৮টি দেবমূর্তি আছে—তাঁদের ঠাম দিক পরিবর্তন করেছে, কখনও বামে কখনও দক্ষিণে। তাঁরা কখনও আশ্রয়িত কখনও বা আশ্রয়িত ;

কিছু তাঁদের আয়ুধ ও মুদ্রায় খুব বেশী পার্থক্য নেই। উপরের দুই হাতে ট্রিশূল ও চক্র; নিচের দক্ষিণ হস্তে বরদামুদ্রা, বামে কমণ্ডলু। প্রতিটি দেবতার দু-পাশে জন সুরসুন্দরী। চিত্র—৮৫-তে নিচে ঐ অংশের প্রাণ বা কীৰ্তিত ভূমি-নকশা (সেক্শানাল-প্রাণ) দেওয়া হয়েছে এবং উপরের অংশে দেখানো হয়েছে বর্ধিত পার্শ্বদৃশ্য (এক্সটেণ্ডেড এলিভেশান)। প্রাণে সংখ্যাচিত্র দিয়ে মূর্তিগুলির অবস্থান সূচিত করেছি; এলিভেশানে তাদের জাত-নির্ণয় করা হয়েছে।

এবারেও আমরা সেই একই বিন্যাস-ছন্দ পাচ্ছি; অর্থাৎ তিন সারিতেই একই জাতের মূর্তি এবং দক্ষিণেই হোক, অথবা বামেই হোক—তার জাত নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় অক্ষরেখা থেকে দূরত্বে। আরও লক্ষণীয়, ১৪,৫,৫,১৪ এই চারটি কোণায় একটি করে রমণী মূর্তি আছে—যাদের চিত্রে, যুক্তহস্তা নামে অভিহিত করেছি—সেগুলি এই মন্দিরের একটি বৈশিষ্ট্য বলতে পারেন। নারীমূর্তিগুলি কৃতাজলিপুটে সমভঙ্গি দণ্ডায়মান; তাদের দুপাশে, খাঁজের ভিতর (১৫-১০,৬-৪,৪-৬,১০-১৫) একটি করে ব্যাল বা বিরাল।

উত্তর ও দক্ষিণ দু-পাশ একত্রে এই 'ক'-চিহ্নিত অংশে তিরানবাই-দুকুনে একশ ছিন্নাশিটি প্যানেল আছে। তাদের প্রত্যেকের অবস্থান কেন্দ্রীয় অক্ষরেখার দূরত্বের উপর নির্ভরশীল। তাদের সংখ্যায় শতকরা হার নিম্নোক্তরূপ;

সুরসুন্দরী	...	$৬ \times ০ \times ২ \times ২$	=	৭২	...	০৮.৭ %
বিরাল	...	$৪ \times ০ \times ২ \times ২$	=	৪৮	...	২৬.৮ "
দেবমূর্তি	...	$০ \times ০ \times ২ \times ২$	=	০৬	...	১৯.৪ "
যুক্তহস্তা	...	$২ \times ০ \times ২ \times ২$	=	২৪	...	১২.১ "
মৌখ-বোনাচার		$০ \times ১ \times ১ \times ২$	=	৬	...	০.২ "
				১৮৬		১০০.০%

এই যে মূর্তি সাজানোর সুপরিষ্কৃত বিন্যাস-ছন্দ এটি 'খ'-চিহ্নিত এবং 'গ'-চিহ্নিত অঞ্চলেও সমান ভাবে প্রযুক্ত। আমি এই 'হাইপথেসিস' বা অনুপপত্তি ধরে নিয়ে পর পর তিনটি বড় মন্দিরে সংখ্যাতত্ত্ব সংগ্রহ করেছি—লক্ষণ, বিখ্যাত এবং কাণারীয় মহাদেও। প্রতিটি মন্দিরের দুই পিঠ ধরে, ক-খ-গ অংশে মোট $০ \times ০ \times ২ = ১৮$ বার পরীক্ষাটি করা হয়েছে; তাতে প্রায় এক হাজার প্যানেল বা মূর্তি পরীক্ষিত হয়েছে। এর ভিতর একটিও ব্যতিক্রম পাওয়া যায় নি! প্রতিটি ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় অক্ষ থেকে দূরত্ব অনুসারে মূর্তির জাত নির্ধারিত। সুতরাং ঐ হাইপথেসিসকে 'ল' বলে স্বীকার করতে বাধ্য দেখি না। এই আইনের সূত্র ধরে বলব: খাজুরাহো-ভাস্কর কলিঙ্গ-ভাস্করের ছন্দে মূর্তি সাজাননি। কলিঙ্গ-দেউলে শুধুমাত্র পার্শ্বদেবতা ও অর্ধদিকপালের অবস্থানই সুনির্দিষ্ট; বাদ-বাকি অংশে কী-জাতের, কী-রসের মূর্তি বসবে তার কোন বাধ্যধারা নিম্নম নেই। 'ব্যালেন্স' বা ভারসাম্য কোনও ব্যত্যয় না করে, এবং দিকপাল, পার্শ্বদেবতা ইত্যাদির শাস্ত্রীয় নির্দেশ মেনে ভাস্কর যে-কোন জাতের, যে কোন রসের মূর্তিকে যে-কোনও অবস্থানে বসাতে পারতেন।

খাজুরাহো প্রধান পরিকল্পনাকার ভাস্করকে সে স্বাধীনতা দেন নি।

সমরাসাবে মাত্র তিনটি দেউলের মোট আঠারোটি অংশের সংখ্যাতত্ত্ব লিখে এনেছি। সবগুলি সংখ্যাতত্ত্ব লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন দেখি না; তবু আরও একটি উদাহরণ পেশ করি:

কাণারীয় দেউলের খ-চিহ্নিত কোণা অংশ : খ-চিহ্নিত অংশে মৌখ-বোনাচারের কোনও প্যানেল নেই; শুধু কাণারীয় দেউল নয়, কোন দেউলেই তা নেই। কোণা-অংশে চার জাতের মূর্তি : সুরসুন্দরী, বিরাল (বা ব্যাল), দেবমূর্তি এবং যুক্তহস্তা। বিরাল বা যুক্তহস্তা মূর্তিতে কোনও বৈচিত্র্য নেই; অপর পক্ষে দেবমূর্তি ও সুরসুন্দরী পরিকল্পনার কিছু

বৈচিত্র্য আছে। এবারও হিসাব করে দেখা যাচ্ছে ঐ চারজাতের মূর্তির অনুপাত একই রকম। উত্তর ও দক্ষিণপ্রান্ত মিলিয়ে মূর্তির সংখ্যা ;

সুরসুল্লরী	...	$১২ \times ৩ \times ২$	=	৭২
বিরালা	...	$৮ \times ৩ \times ২$	=	৪৮
দেবমূর্তি	...	$৬ \times ৩ \times ২$	=	৩৬
যুক্তহস্তা	...	$৪ \times ৩ \times ২$	=	২৪
১৮০				

অর্থাৎ 'ক'-চিহ্নিত কেন্দ্রীয় অংশে ঠিক যে-যে সংখ্যা পেরিয়েছিলাম এখানেও তাই পেলাম। যৌন-যৌনাচারের ছয়টি দৃশ্য বাদ যাওয়াতে মূর্তির সংখ্যা একই রকম।

কলিঙ্গ এবং খাজুরাহোতে যৌনতার তুলনা : অশ্বশাস্ত্রমতে খাজুরাহোতে যৌনতার পরিমাণ কোনাধিকের অপেক্ষা কম। এ-গ্রন্থে যে গাণিতিক সূত্র=অনুসারে 'তথাকথিত অঙ্গীলতা' বা যৌনতার মান নির্ণয় করা হয়েছে, সে-বিষয়ে আপনার মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু এ-কথা ভোঁ নিশ্চয়ই মানবেন যে, প্রথম তিনজাতের মিথুনের (যুগলমূর্তি, উত্তেজিত মিথুন ও শৃঙ্গাররত মিথুন) তুলনায় শেষ দুই জাতের ('মৈথুনরত ও যৌথ যৌনাচার') মিথুনে যৌনতা বেশি? তাহলে আসুন, সেই সূত্র ধরেই আমরা খাজুরাহোর সঙ্গে কলিঙ্গের তুলনা করে দেখি :

দেউলের নাম	মোট মিথুন	প্রথম তিন জাতের [যুগল, উত্তেজিত ও শৃঙ্গাররত]		শেষ দুই জাতের [মৈথুনরত ও যৌথ যৌনাচার]	
		সংখ্যা	শতাংশ	সংখ্যা	শতাংশ
লক্ষ্মণ—খাজুরাহো	৩৭	৩০	৮১	৪	১১
বিশ্বনাথ—ঐ	৮৮	৭৮	৮৯	১০	১১
চিরগুপ্ত—ঐ	৫০	৫১	৯৬	২	৪
জগদম্বা—ঐ	৭৯	৭১	৯০	৮	১০
কাণ্ডারী—ঐ	৮১	৭১	৮৭	১০	১০
চতুর্ভুজ—ঐ	১২	১২	১০০	—	—
সম্মিলিতভাবে—ঐ	৩৫০	৩১৬	৯১	৩৪	৯
কোনার্ক—কলিঙ্গ	৩৮৭	১৯০	৪৯	১৯৭	৫১

তালিকাকারে সাজিয়ে দেখতে পাচ্ছি খাজুরাহোতে যে ছয়টি প্রধান মন্দিরে আমরা পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছি সেখানে সন্মিলিতভাবে প্রথম তিন জাতের মিথুনের অনুপাত ৯১% এবং শেষ দুই জাতের মিথুনের অনুপাত মাত্র ৯%। অপরপক্ষে কোনাৰ্কে প্রথম তিন জাতের মৈথুন সংখ্যা-লক্ষ্যে, মাত্র ৪৯% এবং মৈথুনরত ও যৌথ যৌনচাররত একত্রে ৫১%।

বহুতপক্ষে, আমার বিশ্বাস যৌনতা রূপকার যদি কোনও বিজ্ঞানসম্মত মানদণ্ড পাওয়া যায় তাহলে মেপে দেখে প্রমাণ করা যায়, খাজুরাহোর যে-কোন মন্দিরে যৌনতা কোনাৰ্কে বা পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু সাধারণ যাত্রীদের ধারণা তা নয়। যারা দু জায়গাই ঘুরে এসেছেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করে দেখবেন—তাঁদের ধারণা খাজুরাহোতে যৌনতা কোনাৰ্কের সমপৰ্যায়। এ রকম একটা ধারণা হওয়ার একটি মাত্র হেতু : খাজুরাহোতে যৌথ যৌনচার দৃশ্যগুলির স্থান নির্বাচন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেখানে তারা আছে সেখানে আছে একেবারে কেন্দ্রীয় অবস্থানে—নজর এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। উদাহরণ স্বরূপ ধরুন, কাশ্মীরী দেউলের দুপাশের দুটি ‘ক’ চিহ্নিত অংশ এবং দুই কোণের দুই ‘খ’-চিহ্নিত অংশে মূর্তির সংখ্যা ৩৬৬; এবং এর ভিতর মাত্র ছয়টি হচ্ছে মৈথুন, বাদবাকি ৩৬০টি যৌনতা বিবর্তিত। কিন্তু ঐ ছয়টি মূর্তি আছে কাশ্মীরী মন্দিরের সবচেয়ে দুর্ভি-আকর্ষণকারী অবস্থানে।

যৌনতা-ব্যঞ্জক মূর্তিগুলির তিনটি শ্রেণী : কলিঙ্গের সঙ্গে তুলনা করতে আর একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হয় : কলিঙ্গ-দেউল প্রসঙ্গে বলছিলাম, মৈথুনবাদ শিম্পসার্বকতার তুঙ্গশীর্ষে পৌছোঁতে শৃঙ্গাররত মিথুন পৰ্যায়। তারপর যৌনতা যত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে শৈম্পিক মান ততই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। কলিঙ্গে শায়িতবন্ধে মৈথুনরত মিথুনমূর্তিতে জাতশিম্পীর সাক্ষাৎ আদৌ পাইনা; যৌথ যৌনচারের পরিকল্পনায় একটিও, আবার বলি : একটিও, সার্বক শিম্পিসূচী কলিঙ্গে কোনও মন্দিরে দেখিনি। খাজুরাহো সম্বন্ধে কিন্তু সে কথা বলা যাবে না।

শৈম্পিক সার্বকতার বিচারে খাজুরাহোতে উৎকীর্ণ শেষ দুটি পৰ্যায়ের মিথুনমূর্তিকে স্পষ্টতঃ তিনভাবে বিভক্ত করা যায় :

(ক) **দণ্ডায়মান অবস্থায় :** এই শ্রেণীভুক্ত মূর্তির অধিকাংশই শৃঙ্গাররত, বাদবাকি মৈথুনরত। এগুলির অধিকাংশই অতি উৎকৃষ্ট রচনা। দুটি উদাহরণ এ-গ্রন্থের চিত্র-৮০, এবং চিত্র-৮১-তে সংযোজিত হয়েছে; যদিও শুধুমাত্র উদ্বাহরণ। এগুলি কলিঙ্গ, বিশেষ করে কোনাৰ্কে জগমোহনের বাড় অঞ্চলের অনবদ্য মূর্তিগুলির (চিত্র-৩৫ থেকে চিত্র-৩৮) সঙ্গে তুলনীয়। দর্শক যদি তাঁর নীতিবোধের বাধা অতিক্রম করে শিম্পীর নৈতিক সমতলে নিজেকে প্রক্ষিপ্ত করতে পারেন, অর্থাৎ শিম্পী কী দেখাতে চেয়েছেন তাই যদি খুঁধু দেখতে চান তাহলে অনুভব করবেন— এই শ্রেণীভুক্ত মৈথুনরত মিথুনগুলিতে কী কলিঙ্গে, কী খাজুরাহোতে আমরা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাস্কর শিম্পীর সাক্ষাত পাই।

(খ) **শায়িত বন্ধ এবং ‘তথাকথিত কামবিকার’ :** যথা Cunnilingus, felatio, অধোরত, পশুমৈথুন প্রভৃতি। এগুলি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত নিকৃষ্ট রচনা। মূর্তিগুলি স্থূল, পেলংতা বর্জিত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাপ-জোপ ভ্রান্তিতে ভরা : যৌনতা-ভিন্ন তাতে আর কিছু নেই। আশ্চর্যের বশা, এই সত্যটা খাজুরাহো সমালোচকের দল স্বীকার করে যাননি। মার্গ পরিচকার খাজুরাহো বিশেষ সংখ্যায় এজাতীয় ভাস্কর্যের অনেকগুলি আলোকচিত্র দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোথাও স্বীকার করা হয়নি—এগুলির সঙ্গে সাধারণ প্রস্রাবাগারে কাঠ-কয়লা দিয়ে আঁকা আনাড়িহাতের ছবিবিশিষ্ট শিম্পগতভাবে কোনও পার্থক্য নেই। উদাহরণ স্বরূপ লক্ষ্মণ-দেউলের দক্ষিণ দিকে পূর্বপ্রান্তস্থিত লম্বা প্যানেলটির কথা বলা চলে। অনুসন্ধিসূ পাঠক মার্গ পরিচকার ‘খাজুরাহো’ বিশেষ সংখ্যাটিতে তার আলোকচিত্র দেখতে পাবেন। বিশ্বনাথ দেউলের

উত্তরদিকে দ্বিতীয় সারিতে অবস্থিত মূর্তিগুলিও এই শ্রেণীর। কলিঙ্গ, বিশেষ করে কোনার্কের জাতীয় ক্ষুদ্রকায় মূর্তিগুলি একই রকম নিম্নমানের।

(গ) মন্দিরের কেন্দ্রীয় ক-চিহ্নিত অংশে যৌথ যৌনাচার দৃশ্য: এখানেই যৌনতা-বিষয়ে কলিঙ্গের সংজ্ঞা খাজুরাহোর মৌল প্রভেদ। কোনার্কের ৫৬টি যৌথ যৌনাচার দৃশ্য আমার নজরে পড়েছে। তার ভিতর একটিকেও সার্থক শিল্পসৃষ্টি বলতে পারছি না। অপরপক্ষে খাজুরাহোতে সব কয়টি মন্দির একত্র করে ১২টি যৌথ যৌনাচার দৃশ্য দেখেছি; তার শতকরা আশি নব্বই ভাগ সার্থক ভাস্কর্য-নিদর্শন। প্রতিটি নরনারীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাপজোপ, শিল্পী শাস্ত্রমতে যাকে বলে 'রূপভেদ ও প্রমাণ', তা নিভুল। তার চেয়েও বড় কথা, শিল্পী 'ভাব ও লাবণ্য-যোজনা'তেও সার্থকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। নৈতিক আপত্তি আছে কিনা আপাতত ভুলে যান—শিল্পী যা দেখতে চেয়েছেন, তা সার্থকভাবে দেখাতে পেরেছেন কি না সেটুকুই বিচার করুন। স্বীকার করতেই হবে, এ গুলি অবক্ষয়ী হাতের কাজ নয়। একটি উদাহরণ এখানে পেশ করছি।



চিত্র : ৮৬

কাণ্ডারী মহাদেও মন্দিরের যৌথ যৌনাচাররত মিথুন

কাণ্ডারী দেউলের দক্ষিণ দিকের কেন্দ্রস্থ (ক-চিহ্নিত) অংশের মাঝের প্যানেলে যৌথ যৌনাচাররত মূর্তিচতুষ্টয়কে কাছে থেকে এঁকেছি চিত্র-৮৬-তে। লক্ষ্য করে দেখুন, নারিকা যে ভয়হস্তা, শঙ্কিতা—সে যে কোন কিছু দেখে ভয় পেয়ে সবলে প্রেমাস্পদকে জড়িয়ে ধরেছে এ বিষয়ে দর্শকের মনে কোন সংশয় থাকে না। এ মেয়েটির ভাগ্যময় যেন মূর্ত হয়েছে কালিদাসের সেই অনবদ্য শ্লোকটি:

“অদ্রোঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং দ্বিতিত্যুন্মুখীভিঃ
দৃষ্টোৎসাহশ্চকিত চকিতং মুগ্ধ সিদ্ধাঙ্গনার্ভঃ॥”

বজ্রবিদ্যুতের বিক্রম দেখে সিদ্ধাঙ্গনা ভয় পেয়েছে—বাতাসে বুঝি পাহাড়কেই উড়িয়ে নেয় এবার—ভয় পেয়ে সে দয়িতকে সবলে আলিঙ্গন করে ধরেছে। কিসের ভয় এক্ষেত্রে? তা জানি না।

কোনার্কের ৫৬টি যৌথ-যৌনাচার দৃশ্যের পরিকল্পনায় এ জাতীয় শিল্পীমানসের স্বাক্ষর নেই।

এবার বঙ্গ বুকে নেবার চেষ্টা করি—খাজুরাহো শিল্পী এই যৌথ-যৌনাচার পরিকল্পনাটাকে কেন বারে বারে কেন্দ্রীয় অবস্থানে উপস্থাপিত করছেন। বাস্তবিকপক্ষে এ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য আমাদের কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয় না। অনেক পণ্ডিতের মতে এই চিন্তাধারাটি এসেছে কোল-কাপালিক তন্ত্রের প্রভাবে।

প্রথম কথা, চাণ্ডীয়া রাজবংশের ধর্মনীতিই মিশ্রিত ছিল আদিবাসী রক্ত। অন্তত ভিক্টোরিয়ার গবেষণা তাই বলে। ৬৩ ॥ আদিযুগে—সিংহাসনে আরোহণের পূর্বকালে হয়তো তাদের সমাজ ছিল বহুপত্নিক, polyandrous। কে জানে হয়তো, বৌধ বিবাহও প্রচলিত ছিল তাদের সমাজে। যদিও রাজ্যভাঙের পরে তাদের বংশে এ-জাতীয় বিবাহের নজির নেই। তবু ধরে নেওয়া যায়, ব্যবস্থাটা তাদের চোখে হয়তো অতটা বিসদৃশ লাগত না, যেমন লাগবে কোনো স্বর্ণহিন্দুর চোখে।

দ্বিতীয় কথা, প্রথম যুগ থেকেই রাজন্যবর্ণ কৌল-কাপালিক তত্ত্বাচারে আসক্ত ছিলেন। কাণ্ডারীয় দেউল নির্মাতা বিদ্যাসুরের দেহাবসানের পরে চাণ্ডীয়াবাহিনী কলচুরি রাজ লক্ষ্মীকর্ণের কাছে পরাজিত ও নিগৃহীত হয়। পরবর্তী যুগে কীর্ত্তিধর্মের সেনাপতি সামন্ত গোপালের অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হলে চাণ্ডীয়া রাজসভায়—সম্ভবতঃ কলিঙ্গের, একটি বিজয়োৎসবের অনুষ্ঠান হয়। ঐ বিজয়োৎসবে কৃষ্ণমিত্র রচিত ‘প্রবোধচন্দ্রোদয়’ নাটকটি অভিনীত হয়। সেই নাটকের তৃতীয় অঙ্কে একটি বৌধ যৌনাচারের দৃশ্য ছিল ॥ ৬৪ ॥

এই প্রসঙ্গে আরও বলি, উপরোক্ত তথ্যটি ‘প্রমা’ পত্রিকার একটি সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে আমি প্রকাশ করায় ॥ ৬৫ ॥ বৃন্দাবন বসু লেনবাসী শ্রীঅসীমকুমার মিত্র পরবর্তী সংখ্যায় সম্পাদককে লেখা চিঠিতে প্রতিবাদ জানান ॥ ৬৬ ॥। অসীমবাবু লেখেন, “‘প্রবোধচন্দ্রোদয়’ একটি নৃপক নাটক। অন্য সব দর্শনপ্রস্থানের পরাজয় ঘটিয়ে (বিশেষ করে লোকায়ত মত, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন) যদ্যন্তের প্রেষ্ঠ স্ব প্রতিবেদনই নাট্যকারের উদ্দেশ্য। কাপালিক বৌদ্ধ ও জৈনকে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করার জন্যই। ফলে অনেক অতুষ্টিও আছে। সুতরাং ঐ নাটকের তৃতীয় অঙ্কে যদি ‘বৌধ যৌনাচার দৃশ্য’ থাকতও (আদৌ অবশ্য সেটি নেই) তবুও তার থেকে সত্যাসত্য প্রমাণ হত না।”

সুতরাং নাটকের ঐ দৃশ্যটি নিয়ে আর একটু বিস্তারিত আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ছে। আলোচ্য দৃশ্যে কাপালিক বৃণধারী সোম-সিন্ধাস্ত কাপালিকা বৃণধারিণী শ্রদ্ধাকে বলছে; ‘প্রিয়ে, এনং দুর্য্যভিমানিনং ভিক্ষুং তাবদ্ গৃহান’ (প্রিয়ে, এই মিথ্যা-অভিমানী ভিক্ষুকে আলিঙ্গন কর); এবং সে একথা বলছে তার বন্ধু দিগম্বর ক্ষপণকের উপস্থিতিতে। মণ্ডনির্দেশে বলা হলঃ শ্রদ্ধা ভিক্ষুকমালিঙ্গিত (শ্রদ্ধা ভিক্ষুকে আলিঙ্গন করে)। এর পরে ভিক্ষু সোমসিন্ধাস্তের অনুরোধে কাপালিকা তার বন্ধু ক্ষপণককে কামালিঙ্গন প্রদান করে। ক্ষপণক তখন বলে উঠে, ‘অহো অহ’ন্। অহো অহ’ন্। কাপালিক্যাঃ স্পর্শসুখম্। সুন্দরী, দেহি দেহি পুনরপ্যঙ্কপালীম্ (অহো অহ’ন্! অহো অহ’ন্! কাপালিকীর স্পর্শসুখ। সুন্দরী, দাও দাও আবার আমার কোলে বসে আলিঙ্গন দাও)। দেখা যাচ্ছে, পর্যায়কর্মে দুই বন্ধুর অঙ্কে উপবিষ্ট অবস্থায় আলিঙ্গন দেবার পর তিনজনেই মদ্যপান করে, এবং মস্তাবস্থায় নৃত্যরঙ্গ শুরু করে।

অসীমবাবুর মতে এ দৃশ্যে বৌধ যৌনাচারের লক্ষণ নেই। এ সবই প্রতীকী। আমাদের বক্তব্যঃ দৈহিক রিলন যে-ক্ষেত্রে একই স্থান-কালে শুধুমাত্র একজন পুরুষ ও একজন নারীতে সীমিত নয় তাকেই বৌধ যৌনাচার বলা হি।

তত্ত্বগতভাবে কৌল-কাপালিক ধর্মের বক্তব্য বাই হোক; এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, একাধিক চাণ্ডীয়া রাজা এই সূত্রে মন্দির গায়ে বৌধ যৌনাচার বিচারিত করার ধর্মীয় নজির খুঁজে পেয়েছিলেন। ধর্মীয় নির্দেশ ব্যতিরেকে এ জাতীয় ব্যভিচার নিজের খেলালে মন্দির গায়ে উৎকীর্ণ করাবার মত ক্ষমতা কোন রাজার ছিল না। সঙ্গীন উণ্টিয়ে গায়ের জোরে কোন রাজা ব্যক্তিগত বিকৃতকামের তাগিদে অমন কাজ করলে পরবর্তী যুগের নৃপতি

তা নিঃসন্দেহে ভেঙে ফেলতেন। খাজুরাহোর মন্দিরে প্রায় একশ বছর ধরে পরপর চারজন নৃপতি—যশোধর্ম, খজ, গণ্ড, এবং বিদ্যাধর কিছুতেই ঐ যৌথ যৌনচার পরিকল্পনাকে মন্দিরের প্রধানতম স্থানে বসাতেন না—যদি না এর পিছনে ধর্মীয় নির্দেশ থাকত। আর যেহেতু ঐ চারজন রাজাই ছিলেন তান্ত্রিক—কৌল কাপালিক তন্ত্রের প্রভাবাধিত, তাই প্রায় সত্য: সিদ্ধান্তের মতো মনে নিতে হচ্ছে যে, খাজুরাহোর এই আচারের পিছনে কাজ করেছে ঐ কাপালিক তন্ত্র।

এই সঙ্গে আরও স্মরণ্য: রাজা-রাজড়ার মহলে কৌল-কাপালিক তন্ত্রের ঐ আচার গৃহীত, আদারিত এবং মন্দির গায়ে তা প্রতিফলিত হলেও এতে শূভবুদ্ধি সম্পন্ন জনসাধারণ এবং বিশ্বজ্ঞানের সার ছিল না। একাধিক চিন্তাবিদ ঐ জাতীয় ব্যভিচারের বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। দশম শতাব্দীতে সোমদেব^{১৬৭}, একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কেমেন্দ্রদেব^{১৬৮} এবং ঐ শতাব্দীর শেষভাগে বমুনাচাঁদ^{১৬৯}। কিন্তু ভোগেশ্বরে আকর্ষণ নিমজ্জমান রাজন্যকুল তাঁদের বুদ্ধিতে কর্ণপাত করেননি। সাধারণ শূভবুদ্ধি সম্পন্ন সমসাময়িক মানুষেরও যে এতে সার ছিল না তা বুঝতে পারা যায় হারমান গোয়েংজ-এর বক্তব্যে: It is evident that public opinion disapproved of their (Kaula-Kapalika) practices as depraved, though moral standards then were rather lax, and prostitution acknowledged as quite a reputable profession—of course only the expensive type, catering for the high society^{১৭০}।

[বেশ বোঝা যায়, এতে (কৌল-কাপালিক তত্ত্বাচারে) সাধারণ মানুষের সার ছিল না। যদিও সামাজিক নীতিবোধ সাধারণ ভাবে যথেষ্ট শিথিল ছিল, এবং ব্যবসায় হিসাবে পতিতাবৃত্তিকে যথেষ্ট খাতির করা হত—অবশ্য উচ্চকোটির ধনবানদের নিয়ে যে বান্ধাজনাদের কারবার।]

অর্থাৎ কোনাক প্রসঙ্গে যে কথা বলেছি আবার কি সেই একই কথা বলতে হবে? প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের এতে সার ছিল না? রাজ্যদেশেই তা শুধু উৎকর্ষ করে গেছেন? পার্থক্য এই যে, এবার মন্দিরের সর্বোৎকৃষ্ট ‘পঞ্জিশনে’ পান্ডুদৃশ্যের কেন্দ্রীয় অবস্থানে যৌথ-যৌনচার প্যানেলগুলি স্থাপনিত করার নির্দেশ ছিল। ফলে কোনাকের Magister Artrium (প্রধান শিল্পনির্দেশক) যেমন ভাবে ঐ সব প্যানেল দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাস্করকে দিয়ে খোদাই করিয়েছিলেন, খাজুরাহোর প্রধান ভাস্কর তা করতে পারেননি। তাঁকে বাধ্য হয়ে বারে বারে সহস্রে ছেনি-হাটুড়ি ধরতে হয়েছে। একশ বছর ধরে — লক্ষণ, বিশ্বনাথ, জগদম্বা, চিত্রগুপ্ত, এবং কাণ্ডারীর মহাদেও দেউলে; কারণ প্রতিটি মন্দিরের দু-দিকের পান্ডুদৃশ্যে প্রধানতম অবস্থানে তাঁকে অনিবার্যভাবে খোদাই করতে হয়েছে যৌথ যৌনচার দৃশ্য।

একথা যদি সত্য হয় তাহলে চিত্র-৮৬-প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটার জবাব তখন দিতে পারেনি, এখন যেন তার উত্তর খুঁজে পাচ্ছি। বুঝতে পারছি, ঐ নারিকা কিসের ভয়ে তার দয়িতকে আঁকড়ে ধরেছে! ইতিপূর্বে যে স্বিমূল সমীকরণের কথা বলেছিলাম—কোরাড্রোটিক ইকোয়েশন, সেই পদ্ধতিতেই এ অঙ্কটি কষতে হবে। নারিকার ঐ ভয়, ঐ লোকলজ্জা আসলে শিল্পীর মানসিক স্বন্দের প্রতিফলন। মিলন মূহুর্তে দ্বিতীয় পুরুষের উপস্থিতিতেই মেরেটি ভয় পেয়েছে।

অথচ, আশ্চর্য—‘মার্গ’ পত্রিকার ঐ খাজুরাহো-বিশেষ সংখ্যায় এই সত্যটার কোন স্বীকৃতি নেই। সোমদেব-কেমেন্দ্রদেব-বমুনাচাঁদ প্রভৃতির প্রতিবাদের কোনও উল্লেখও সেখানে নেই। ঐ অতি যৌনচার কলুষিত স্থূল ভাস্কর্য=নিদর্শনগুলিতে ধারাই আপত্তি জানাতে চেষ্টা করেন, তাঁদেরই বলা হয়েছে—‘biased, Westerners, prude, die-hard bourgeois’ ইত্যাদি। তার মানে কি ধরে নেব ‘মার্গ’ পত্রিকার মতে কেমেন্দ্রদেব, সোমদেব, বমুনাচাঁদরা Westerner? Die-hard bourgeois?

চৌদ্দ ॥ যৌথ যৌনাচার ॥

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মহা-মহা পণ্ডিতের প্রশংসা সত্ত্বেও এবং চিত্র—৮৬ আলোচনার সময় সেটিকে আমি নিজেও অভিনন্দিত করা সত্ত্বেও বলতে বাধ্য হচ্ছি : এই জাতের মিথুনে-মুর্তিগুলির অধিকাংশই আমার চোখে রসোত্তীর্ণ মনে হয়নি। কোনাঙ্কের একটিও আমার কাছে ভালো লাগেনি। জানি, অসংখ্য রবীড়ংন্যাগিয়ানের অরণ্যে আমি একা লিলিপুটিয়ান। তবু আমি আমার মতে দৃঢ়। কারণ আমি খুঁটিয়ে দেখেছি, পূর্বাচার্য পণ্ডিতরা—রাজেন্দ্রলাল, ফাগু'সন, হ্যাভেল, কানিংহাম, কুমারস্বামী, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতিরা কোথাও এই জাতের 'যৌথ যৌনাচাররত' মিথুনের স্পষ্ট উল্লেখ করে তার প্রশংসা করেননি। স্বীকার করি, এই জাতের মিথুনের স্পষ্ট উল্লেখ করে তারা কেউ নিন্দাও করেননি। গ্রন্থারম্ভেই বলেছিলাম : তাঁদের শিষ্য-সমালোচনা পড়ে ঠিক বোঝা যায় না—কখন কোন্ জাতের মিথুনের প্রসঙ্গে কোন কথা বলছেন।

সে যাই হোক, এ বিষয়েও একমাত্র ব্যতিক্রম দেখছি, মার্গ পার্শ্বকার সম্পাদক লিখিত-কলা-বিশারদ ডক্টর মুল্ক রাজ আনন্দ,। তিনি স্পষ্টাক্ষরে এই জাতের মিথুনের উল্লেখ করে এবং ছবি ছেপে তার সমর্থন করেছেন, প্রশংসা করেছেন। বলছেন, 'The supra-sensual kingdom of belief in one Absolute God, Brahman, who splits Himself through desire into many.' ॥ ৭১ ॥ [অনুভূতির অতীত বিশ্বাস ওগতে বিরাজমান যে 'একদর্শ' ব্রহ্ম তিনি বাসনার মাধ্যমে 'বহুধা' হলেন] শব্দ প্রয়োগের ব্যঞ্জনা চমকপ্রদ, কিন্তু যুক্তি দিয়ে এই মত যৌথ যৌনাচার পরিকল্পনার সমর্থনে গ্রহণ করতে পারছি কই? একটি পুরুষ যখন একই সময়ে একাধিক রমণীর সঙ্গে সঙ্গমরত তখন উপনিষদের এই ব্যাখ্যা কি প্রযুক্ত হতে পারে? এ চিন্তাধারা ভারতীয় ভাবনায় তো কোন যুগে, কোথাও পাইনি—না উপনিষদে, না পুরাণে, না মহাকাব্যে না কৃষ্ণভক্তে। একটু বিস্তারিত আলোচনা এখানে অপরিহার্য : ডক্টর আনন্দ এই প্রবন্ধে যৌথ যৌনাচার পরিকল্পনার তাত্ত্বিক সমর্থনে উপনিষদের যে শ্লোকটি উপস্থাপিত করেছেন সেটি বৃহদারণ্যকে একটি সুপরিচিত মন্তব্য : "স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপন্নিস্তৌ স ইমমেবাস্মনং ধ্বেথাপান্তরন্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভাবতাং তস্মাদিদমর্থবৃগলমিব স ইতি স্মহে যাজ্ঞবল্ক্যাস্তমাদরমাকাসঃ স্ত্রীয়া পূর্ষত এব তাং সমভবন্ততো মনুষ্যা অজ্ঞায়ন্ত।" ৭২ ॥

যার অর্থ : কিন্তু তিনি (পরমব্রহ্ম) আনন্দলাভ করিলেন না ; কারণ, কেহই একাকী থাকিয়া আনন্দ পায় না। তিনি দ্বিতীয় এক সন্তায় রূপান্তরিত হইতে ইচ্ছা করিলেন। স্ত্রী ও পুরুষ অলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় যে পরিমাণ (আনন্দিত) হয়, তিনি সেই পরিমাণ (আনন্দিত) হইলেন। তিনি দ্বীয় দেহকে দ্বিধাবিভক্ত করিলেন। এইরূপে পতি ও পত্নী হইল। এই হেতু যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, 'প্রত্যেকে শুধু স্বয়ং অসম্পূর্ণ। এই শূন্যস্থান স্ত্রী-দ্বারা পূর্ণ হয়। তিনি দ্বীয় পত্নীসন্তায় মিথুনেভাবে উপগত হইলেন। ইহা হইতে মনুষ্যজাতির উৎপত্তি।"

আমাদের বর্তমান প্রতর্কের দিক থেকে এই শ্লোকে "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ 'দ্বিতীয়ম্ একৈচ্ছৎ'—অর্থাৎ "দ্বিতীয় হইতে ইচ্ছা করিলেন।" 'দ্বিতীয়' অর্থে একাধিক, কিন্তু তিন বা চার নয়। তা হলে এই শ্লোকটি কীভাবে যৌথ যৌনাচারের সমর্থক হয়, তা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বোধগম্য হল না।

বরং বৃহদারণ্যকের ঠিক পরবর্তী শ্লোকটি আমাদের যুক্তিকেই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে, ডক্টর আনন্দ সমর্থিত যৌথ যৌনাচারকে নয়। ঠিক পরের শ্লোকটিতেই উপনিষদকার বলছেন, “সদ্যোজাতা সেই স্ত্রী সত্তা অতঃপর চিন্তা করিলেন—‘আমাকে আপনা হইতে উৎপন্ন করিয়া ইনি (পরমব্রহ্ম) কী প্রকারে আমাত উপগত হইতে চাহিতেছেন ? (আমি তো এ ক্ষেত্রে তাঁর কন্যাস্থানীয়া)। আমি তিরোহিত হই।’—এই কথা চিন্তা করিয়া তিনি গাভী হইলেন।

“অতঃপর প্রজাপতি ব্রহ্মা বৃষরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাতে উপগত হইলেন। এইরূপে গো-জাতির উৎপত্তি হইল। তদনন্তর একজন অশ্ব হইলেন, অপরজন অশ্বা হইলেন ইত্যাদি।” ॥ ৭০ ॥

এই ভাবে বিভিন্ন জীবের সৃষ্টি হল।

লক্ষণীয়, এই শ্লোকে প্রত্যেকটি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ আছে একবচনে : গো, বড়বা, গর্দভী, অজ্ঞা, অবিঃ প্রভৃতি। অর্থাৎ জীবসৃষ্টি-মানসে প্রজাপতি ব্রহ্মা একই কালে একাধিক স্ত্রী-সংসর্গ করলেন এমন নির্দেশ উপনিষদের আলোচ্য অংশে আদৌ নেই।

কৃষ্ণতত্ত্বও এমন ইঙ্গিত নেই। এক পরম ‘পুরুষ’ এবং একাধিক ‘প্রকৃতি’ কথা আছে, এক কৃষ্ণ এবং ষোড়শ গোপিনীর প্রসঙ্গও আছে—কিন্তু এ অর্থ নয়। রাসলীলার শত শত চিত্র-ভাস্কর্যে দেখেছি : এক কৃষ্ণ বহুরূপ ধারণ করেছেন, প্রত্যেকটি গোপিনী তাঁর বাঞ্ছিত কৃষ্ণকে পেয়েছেন। প্রতিটি গোপিনীর হাত ধরে তাঁর মনোময় কৃষ্ণ কায়াময় হয়ে লীলা করছেন। এক কৃষ্ণ একাধিক গোপিনীর বস্ত্রধারণ করে বদনবৃক্ষের শাখায় বসে আছেন এমন পরিবর্তন আছে—কিন্তু রাসলীলার আসরে এক কৃষ্ণ দু-পাশে দুই গোপিনীকে নিয়ে কামকেলী করছেন এমন পরিবর্তন কখনও কোথাও দেখেছেন ? আকৃতি-ভেদে দেখিনি। পাহাড়ী কলম, বাশোলী কলম, চম্পা-কাংড়া-রাজস্থানী-কাশ্মীরী-কলমে সহস্র সহস্র রাসলীলার চিত্র পাওয়া যায়—কোথাও খাজুরাহো-কোনার্ক টঙে এক কৃষ্ণ একই কালে একাধিক রমণীরমণ করছেন এমন পরিবর্তন নাই। সবচেয়ে সেই ‘একবর্ণ’ শক্তি যোগে ‘বহুধা’ হয়েছেন, ‘বর্ণনানেকান’ বহু-কৃষ্ণরূপ পরিগ্রহ করেছেন। বুদ্ধিমন্ডল তাঁর ‘কৃষ্ণচরিত্রে’ প্রাজ্ঞল ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন তার অর্থ কী ?

তাহলে বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়ে ডক্টর আনন্দ কেন এই পরিবর্তনের সমর্থন করতে চাইলেন ? একটিমাত্র যুক্তিই মনে আসছে :

মূলকরাজ তথা মার্গ পট্টকাগোষ্ঠী যেন-তেন প্রকারেণ এই জাতীয় যৌথ যৌনাচারকেও সমর্থন করতে উদ্যত। শুধু শিম্পের সীমিতক্ষেত্রে এগুলি স্বীকার্য ও রসোত্তীর্ণ এটুকু বললেই হত ; কিন্তু না—ওঁরা প্রমাণ করতে চাইলেন শুধু তত্ত্বগত নয়, তথ্যগতভাবে এই আচারটিও সমর্থনযোগ্য। তাই যৌথ যৌনাচারের একটি আলোচ্য পরিবেশন করে ডক্টর আনন্দ এই বিশেষ সংখ্যায় লিখলেন “The property relations of the medieval period were different and our own dominantly monogamous age cannot understand the psychology of involvement of more than one female in the private life without a shock. Polygamous and polyandrous societies took different views. As in this composition, the one male and two females here get their coherence from the way the faces and hands are dramatically posed in active involvement. “[নরনারী সম্পর্কে অধিকার ভেদের ব্যবস্থাটা মধ্যযুগে অন্যরকম ছিল। আমাদের এই একান্তভাবে একপত্নিক-যুগে তদানীন্তন মানসিকতাটা ধারণার বাইরে—এখন একযোগে একাধিক রমণীরমণের মানসিকতায় আমরা শিউরে উঠি। বহুপত্নিক ও বহু পত্নিক সমাজে দৃষ্টান্তটাই ছিল অন্যজাতের। যেমন দেখছি

আলোচ্য চিত্রে : একটি পুরুষ ও দুইজন রমণী তাদের হাতের মুদ্রার ও মুখভাবে বোধ-সম্ভোগের দৃশ্যটি মাটকীয়ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে ।] ৥ ৭৪ ৥

এ 'polyandrous (বহুপতিক) শব্দটির প্রয়োগই বুঝিয়ে দেয় ডক্টর আনন্দ্ তথা মার্গ-জুলের মানসিকতা । একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, ডক্টর আনন্দ্-এর মতো পণ্ডিত জ্ঞানেন না যে, ভারতীয় আৰ্য সম্রাজ কোন যুগেই বহু পতিক ছিল না । কলিঙ্গর রাজ্যে চাণ্ডিয়া রাজবংশের ধমনীতে হয়তো আদিযুগের আদিবাসী রক্ত প্রবাহিত হাচ্ছিল—কিন্তু রাজস্ব পাওয়ার পর তারা বর্ণহিন্দু সমাজেই বিবাহ করেছে এবং বর্ণহিন্দুর সামাজিক বিধিনিষেধ বেনে চলেছে । চাণ্ডিয়া রাজাদের বংশ তালিকায় এক নারীর একাধিক পতিগ্রহণের কোনও নজির ইতিহাসে নেই । কোনাঙ্কের ক্ষেত্রে তো এ জাতীয় প্রশ্নই ওঠেনা । কারণ উড়িষ্যার তদানীন্তন রাজা বর্ণক্ষত্রিয় । বহুত পক্ষে দ্রৌপদীর একমাত্র ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে এ দেশীয় শাস্ত্রে, ইতিহাসে, সাহিত্যে কোথাও এক নারীর একাধিক স্বামী-গ্রহণের সামাজিক স্বীকৃতি নেই । দ্রৌপদীর বৌধিবিবাহের প্রস্তাব বিবেচনা প্রসঙ্গে স্বয়ং যুধিষ্ঠির অনেক চিন্তা-ভাবনা করে দুটিমাত্র ব্যতিক্রম উদাহরণ স্মরণ করতে পেরেছিলেন । ৥ ৭৫ ৥ বলছেন, “পুরাণে শুনছি, গৌতম বংশীরা জটীলা সাতজন স্বামীর পত্নী ছিলেন ; মুনিকন্যা বাকীর দশজন পতি ছিল, তাঁদের সকলেরই নাম প্রচোতা ।”

দ্রৌপদীর পণ্ডপতিগ্রহণ শাস্ত্রসম্মত এবং সামাজিক বিধান অনুযায়ী গ্রাহ্য কি না এই ছিল সেই প্রত্যেক-সভার বিচার্য বিষয় । সমস্ত হুঁতি শূনে মহাভারতকার স্বয়ং ব্যাসদেব বললেন ;

নায়ং বিধিমানুযানাং বিবাহে দেবা হোতে দ্রৌপদী চাপি লক্ষ্মীঃ ।
প্রাক্ কর্মণঃ সুকৃতাং পাণ্ডবানাং পণ্ডানাং ভাৰ্য্যা দেবদেবপ্রসাদাং ॥
তেষামেবারং বিহিতঃ স্যাৎবিবাহো যথা হোষ দ্রৌপদীপাণ্ডবানাম্ ।
অন্যেযাং নৃণাং যোষিতাঞ্চ ন ধৰ্মঃ স্যান্মানবোক্তো নরেন্দ্র ॥” ৭৬ ৥

অর্থাৎ “মনুষ্যের বিবাহে এতদুপ বিধান নাই; তবে পাণ্ডবেরা দেবতার অবতার, দ্রৌপদীও স্বর্গলক্ষ্মীর অবতার ; সুতরাং পূর্বসুকৃতিবশতঃ এবং মহাদেবের অনুগ্রহে এক দ্রৌপদী পণ্ডপাণ্ডবের ভাৰ্য্যা হইবেন । দেবতাদেরই এইরূপ বিবাহ বিহিত আছে ; সুতরাং দেবাবতার বলিয়াই দ্রৌপদী ও পণ্ডপাণ্ডবের এই ব্যতিক্রম বিবাহ সিদ্ধ । কিন্তু মহারাজ ! অন্য মানুষের পক্ষে ইহা ধর্ম নহে, মনুষ্যহিত্য প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রোক্ত বিধানই মানুষের পালনীয় ধর্ম ।”

এ ছাড়া আদিপর্বের অর্জুনবনবাসপর্বাদ্যায়ের বর্ণনা আছে—একদিন যখন যুধিষ্ঠিরের কক্ষে দ্রৌপদী উপস্থিত ছিলেন সেই সময় অর্জুন বাধ্য হয়ে সেই কক্ষে প্রবেশ করেন । এজন্য অর্জুনকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দ্বাদশবৎসর বনবাসে যেতে হয় ।

এই যখন সামাজিক বিধি, তখন সেই সমাজকে polyandrous বা বহুপতিক বলা শোভন, না স্বাভাবিক ? তবু, সবজেনে বুঝেও ডক্টর আনন্দ্ লিখলেন, “The ethics of the medieval period did not forbid the princes to indulge in love-making with two or more women *at the same time* (italics ours) [মধ্যযুগে কোন নৃপতির পক্ষে দুই বা ততোধিক নারীকে বোধভাবে একই সঙ্গে সম্ভোগ করার সামাজিক সমর্থন ছিল ।] ৭৭ ৥

আজ্ঞে না । ছিল না ।

,ছিল, এ-কথার প্রমাণ মূলকরাজ দেননি। আগুবাকোর মতো ঐ-কথা ঘোষণা করেছেন। 'ছিল না' যে, তার প্রমাণ শুধু মহাভারতেই নয়, স্বয়ং বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রেও আছে।

স্মরণে রাখা ভালো যে, বাৎস্যায়ন এদিক থেকে সম্পূর্ণ স্পষ্টবক্তা; হ্যাভলক এলিস বা ডঃ কিন্‌য়ের মত বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠায় বা ভালো বুঝেছেন স্পষ্টভাবে বলে গেছেন। এলিস বা কিন্‌য়ের মতো কোন প্রচলিত যৌনক্রিয়াকেই তিনি অস্বাভাবিক, অনুচিত, abnormal, perverted বলেননি। বরং বলেছেন, “এ-ছাড়া ভিন্ন লোকের ভিন্ন বুচি।” এতেন বাৎস্যায়ন যৌথ যৌনাচার প্রসঙ্গে কি বলে গেছেন শুনুন।

কিন্তু তার পূর্বে আর একটি প্রসঙ্গ। Polyandrous শব্দটি অহৈতুকী (অপরাধবোধসম্ভব ?) প্রয়োগ হলেও polygamous শব্দটি তো তা নয়। এককথা মানতে হবে যে, আমাদের এই বিংশ-শতাব্দীর প্রায় বিশ্বব্যাপী একপাক্ষিক যুগের বাতাবরণে মানুষ আমরা সে-যুগের বহুপাক্ষিক সমাজ ব্যবস্থার ধরন-ধারনটা ধারণা করতে পারি না। অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রে আমরা এমন একটা যুগের শিম্পবিচার করছি যখন অধিকাংশ পুরুষ এই ভারতবর্ষে বহুবিবাহ করত। তাদের যৌন জীবন সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি? একই ছাদের নীচে, একই ঘরে দুই জনিটি স্ত্রীকে নিয়ে যারা বাস করত তারা কি একই শয়ন করত, একই শয্যা শয়ন করত? তদানীন্তন লৌকিক বিচারে যদি একাধিক স্ত্রীকে নিয়ে একত্রে শয়নের সামাজিক অনুমোদন থেকে থাকে, তাহলে আমার-আপনার ভাতে আপত্তি জানাবার কী অধিকার? আর তা যদি স্বাভাবিক ঘটনা হয়, তখন স্বামী-স্ত্রীর মিলন মুহূর্তে তৃতীয় জনের, অর্থাৎ দ্বিতীয় স্ত্রীর উপস্থিতিও স্বাভাবিক ঘটনা। সে অবলোকন-কামের অকর্মক কর্মী না হয়ে সাক্ষরক হলেই বা বাধা কি?

কিন্তু সেটা স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত ঘটনা হলে তার চিত্র আমরা সাহিত্যে পাব না কেন? প্রবোধচন্দ্রোদয়ের কোনো চরিত্রের চণ্ডে পঞ্চপাণ্ডবের কোন একজনও তো অপর ভ্রাতার উপস্থিতিতে অষ্টাদশপর্বে মধ্য একবারও দ্রৌপদীকে বলতে পারলেন না—‘সুন্দরি, দেহি দেহি পুনরপ্যক্ষপালীম্।’ বৈশ্যায়ন ব্যাস থেকে কালিদাস—বিশেষ করে আদিকবীরাঙ্গক রচনায় ধারা খ্যাতিলাভ করেছেন, ভর্তৃহরির শৃঙ্গারশতকে, কল্যাণমল্লের, রত্নরহস্য—কেউই সে চিত্র আঁকেন না কেন? এঁরা কেউই তো Westerner, Die-hard bourgeois ছিলেন না? আদি ও মধ্যযুগের শাস্ত্র, পুরাণ, মহাকাব্য, লৌকিক গাথা, নাটক, ইতিহাস সর্বত্র উপেক্ষিত হয়ে কেন তা শুধু মাত্র প্রতিফলিত হল ‘প্রবোধচন্দ্রোদয়ের’ তৃতীয় অঙ্কে এবং খাজুরাহো-কোনার্কের কয়েকটি মন্দির প্রাচীরে?

এ প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছেন কামশাস্ত্রের জনক স্বয়ং বাৎস্যায়ন—

“বাসকপাল্যস্থ যশা বাসকো যশ্মচতীতে ॥” ৭৮ ॥

বাৎস্যায়ন বলেছেন, “হে রাজন! তোমার ভিন্ন ভিন্ন মহিষীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন রাগের আয়োজন করবে। যেদিন যার ‘বাসক’ বা পাল্য পড়বে, সেদিন সেই মহিষীকে নিয়ে শয়ন করবে।”

দিবাভাগেই স্থির হয়ে যাবে, কোনরূপে কার বাসক (পাল্য)। রাজা প্রাতঃরাশের সময়েই রানীদের একজনকে (বস্তুত যেদিন যার পাল্য) অঙ্গুরীয় গ্রহণ করে ইঙ্গিতে তাঁর মনোগত বাসনাটি জ্ঞাপন করবেন:

“তত্র রাজা যদ্ গৃহীয়াত্তস্য বাসকমাস্ত্রেয়ং।” ৭৯ ॥

: তার মধ্যে রাজা যার অঙ্গুরীয় গ্রহণ করবেন সে-রাতে তারই পাল্য।

সেই রাণীই সেদিন সায়াক্ষে অলঙ্করণে বিশেষ করে রঞ্জিত করবে তার রাতুল চরণ, সীমন্তে দেবে সিন্দূর বিন্দু, কপোলে লোধরংগুর প্রলেপ, শুনযুগলে চন্দনের আলিম্পন। স্বাধি বাৎস্যায়ন আরও বলেছেন, হে রাজন! তুমি সমদর্শী হতে ভুলো

মিথুন—১৫

না। দেখো, যেন রূপযৌবন-নিরপেক্ষভাবে প্রতিটি 'মহিষী' সমান কালের ব্যবধানে তার বাসক পায়! যেমন তোমার প্রজারা জাতিবর্ণনির্বিশেষে তোমার সুবিচার প্রত্যাশা করে, ওরাও তেমনি তোমাকে চায়।

তাহলে কি যৌধ যৌনাচার পরিকল্পনা কামশাস্ত্রে নেই?

না, আছে। একটি যাত্রা শ্লোকে, ব্যতিক্রম হিসাবে বাৎসর্য্যন ঐ যৌধ যৌনাচারের কথাও বলেছেন:

"গ্রামনারীবিংয়ে স্ত্রীরাজ্যে চ বহ্লীকে বহবো যুবানহন্তঃপুরসংগে ঐকৈকস্যাঃ পরিগ্রহভূতাঃ।

তেষামেকৈকশা যুগপচ্চ যথাসম্মাং যথায়োগ্যং গজরেনু ॥" ॥ ৮০ ॥

অর্থাৎ, স্ত্রীরাজ্যের নিকটবর্তী গ্রামনারী দেশে, স্ত্রীরাজ্যে এবং বহ্লীকদেশে নারীদের প্রভাব খুব বেশি। ঐসব অঞ্চলে প্রত্যেকটি নারীর একাধিক প্রণয়ী থাকে। তাহারা ঐ ঐশ্বর্য্যদেবীর রক্ষিতরূপে অস্তঃপুরে বাস করে। ঐ সকল রমণীগণ অত্যন্ত কামাতুরা এবং এক পুরুষের সহিত রতিভ্রমণ ইহাদের কামোত্তেজনার নিবৃত্তি হয় না। ইহারা নিজেদের রক্ষিত প্রত্যেক পুরুষের সহিত পরাক্রমে অথবা যুগপৎ কামকলিতে রত হয়।"

এই শ্লোকে আমাদের আলোচ্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঐ 'যুগপচ্চ' শব্দটি মারাত্মক। সেটি যে প্রাক্ষিপ্ত বা পরবর্তী কালের সংযোজন নয় তা বোঝা যায় ঠিক পরবর্তী শ্লোকের বিস্তারে:

"একো ধরয়েদনামনো নিবেষিত। অনো জঘনং, মুখমনো,

ইতি বারংবারেণ ব্যতিকরেণ চানুভিষ্ঠেবুঃ।"

অনুবাদ আর নাই করলাম। কিন্তু ঐ, সীমিত ভৌগোলিক অঞ্চলের এই ব্যতিক্রম ব্যবহারে যে বাৎসর্য্যনের সাধারণ অনুমোদন নেই, সে কথা এর পরবর্তী শ্লোকে পরিষ্কার বোঝা যায়। কারণ পরবর্তী শ্লোকে বাৎসর্য্যন বলেছেন, "যদি কয়েকজন পুরুষ একত্র হয়ে কোনো যেতনভুক্ত বারবণিতাকে একই সঙ্গে যৌধভাবে ভোগ করে, অথবা একাধিক nympho-maniac (অত্যধিক কামাতুরা) নারী একযোগে কোনো একজন বা একাধিক গুপ্ত প্রণয়ীর সঙ্গে অবৈধ সঙ্গমে মিলিত হতে চায়, তবেই এই 'চিহ্নরত' ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়।"

অর্থাৎ 'চিহ্নরত' একটি ব্যতিক্রম যৌন ব্যবহার। তার সামাজিক অনুমোদন নেই, ছিল না। এ তত্ত্বের আর একটি তীর্থক প্রমাণ হয়তো রয়ে গেছে ভাষাতত্ত্বে। একটা সাধারণ বাঙলা গালাগালে: 'বোল্লিক'! শব্দটি হয়তো 'বহ্লীক' শব্দ থেকে এসেছে। বর্তমানে তার অর্থ কাণ্ডজ্ঞানহীন; হয়তো সেকালে তার অর্থ ছিল: 'বেজন্মা।' 'স্ত্রীবিদ্যাবু' হলে যে বর্ণশব্দের জন্মগ্রহণ করে হয়তো সে আমলে তারাই ছিল বোল্লিক। এ অবশ্য আমার অনুমান।

প্রশ্ন হতে পারে—তাই যদি হবে তবে চিহ্ন-৮৬ আলোচনাকালে আমি কেন বলেছিলাম, সেটি একটি সার্থক শিল্পসৃষ্টি। তার জবাব তো গ্রন্থার ভেঁই শুনিয়েছি আচার্য নন্দলালের জবানীতে: শিল্পবস্তুর শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নীতিগত দিক থেকে নয়, রসের দিক থেকে।"

যে শৈল্পিক সমতলে দাঁড়িয়ে শিল্পী তাঁর শিল্পবস্তুটি রূপায়িত করেছেন সেই কালীক, সামাজিক, নৈতিক সমভূমে এসে দর্শককে দাঁড়াতে হবে। তারপর রসের বিচারে ভোল করে দেখতে হবে সেটি উৎরেছে কি না। সেই বিচারে চিহ্ন-৮৬ রসোত্তীর্ণ। কোনােকের ৫৬টি যৌধ যৌনাচার দৃশ্য তা নয়। যেমন নয়, খাজুরাহো-কোনােকের অধিকাংশ শায়িত বহুকাম ছোট-ছোট প্যানেলগুলি—অধোরত, পশুমৈথুন, সমকাম, felatio-র অধিকাংশ মূর্তি। এর ভিতর খাজুরাহোর ঐ যৌধ যৌনাচার দৃশ্যগুলি—যেগুলি যে-কোন কারণেই হোক বেস্ত্রীয় অবস্থানে উৎকীর্ণ করা—অধিকাংশই সার্থক শিল্পসৃষ্টি। রসের বিচারে; নৈতিক বিচারে নয়। এই কথা বলতে ঐ আচারটাকেও—ঐ 'চিহ্নরত' ব্যতিক্রমটাকে সমর্থন করতে মার্গ

গোষ্ঠী অমন উঠে পড়ে লাগলেন কেন ? উপনিষদের সূত্র আউড়ে, তার অপব্যাখ্যা করে, আর্থ-ভারতীয় সমাজকে Polyandrous বলে, কেন তার নৈতিক সমর্থন যোগাতে হবে ? শিম্পীরা কোনো অপরাধবোধে ভুগেছেন বলে তো মনে হয় না—যা বলতে চান, মন্দির ফাসাদের সবচেয়ে দৃষ্ট-আকর্ষণকারী অবস্থানে অধিরোহণ করে তাঁরা তা সোচ্চারে বলে গেছেন ; তাহলে বিংশশতাব্দীর শিম্পসমালোচকের এ অপরাধবোধ কেন ?

সহজ সরল সত্যটা সবিনয়ে স্বীকার করে নেওয়াই তো মঙ্গল : এই যৌথ যৌনাচার পরিকল্পনায়, বা চিত্ররথ ব্যতিক্রম আচারের স্বপক্ষে ভারতীয় ঐতিহ্যে কোনো ব্যাপক সমর্থন নেই। সেটা তদানীন্তন অবক্ষয়ী সমাজের প্রতিফলন। কোল-কাপালিক তন্ত্রে দীক্ষিত চাণ্ডাল রাজাদের এক বিচিত্র মানসিকতার প্রতিফলন। কিন্তু যে শিম্পীদের ছেনিহাতুড়ি সেই চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিল তারা সাফল্যলাভ করেছিল—রসের বিচারে। এর মূলে যে ঐ মধ্যযুগের ভোগবিলাসী রাজনৈতিকগর্ভাই অধিষ্ঠান করছেন এ তথ্যটা ডঃ আনন্দেরও অবশ্য অজানা নয়। তাই তিনি বলছেন “The erotic sculptures in medieval temples did not spring up *Suddenly* through the *perversity of some local Raja*” (*italics ours*) [মধ্যযুগের মন্দিরে এই যৌনতা-ভারাক্রান্ত মূর্তিগুলি কোনও স্থানীয় রাজার বিকৃত-কামের সুযোগে হঠাৎ জন্মায়নি]। ৮১ ॥

হঠাৎ যে জন্মেছিল—যৌথ যৌনাচার পরিকল্পনা—এটা তো ঐতিহাসিক সত্য। এখন হেতুটাকে অস্বীকার করি কি করে ? হেতুটা এই, “It cannot be denied that for all these loose sculptures there could be the plain and simple explanation that the period in which these were carved was one of declining morals and of degenerate men. The walls of the temples depict a society which, if not already thoroughly corrupt, was fast becoming that. “[অস্বীকার—করার .উপায় নেই যে, ঐ স্থূল ভাস্কর্য নিদর্শনগুলির পিছনে সহজ সরল হেতুটা হচ্ছে : যুগটাই ছিল অবক্ষয়ী, এবং নীতিহীন কতকগুলি মানুষের প্রভাবে ।] ৮২ ॥

স্মরণে রাখা দরকার, খাজুরাহোর বাণভায় যৌনাচার দৃশ্যের কথা এখানে বলা হয়নি। বলা হয়েছে সেই মূর্তিগুলির কথা। বেগুনি ধর্মীর অনুমোদনের সুযোগে নিছক যৌনতার জন্যই উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

পনের মৈথুনবাদ কি অশ্লীল ?

শিল্পসমালোচক হয়তো রসের নিক্তি দিয়েই শিল্পবস্তুর বিচার করবেন ; কিন্তু সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে আমাদের দায়িত্বটা বোধ করি ওখানেই শেষ হয় না। তাই এই মৌল প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

কিন্তু সে বিচারের আগে ‘অশ্লীল’ শব্দটার একটা সংজ্ঞার্থ নির্দেশ করতে হয়। অশ্লীল বলতে কী বুঝি? আইনের ভাষায় “Obscene means that the average person, applying contemporary standards, the predominant appeal of the matter, taken as a whole, is to the prurient interest in a shameful or immoral interest in nudity, sex or excretion. which goes substantially beyond customary limits of candour in description or representation of such matter and in matters which is utterly without any redeeming social importance.”

অর্থাৎ : “সমসাময়িক ধ্যানধারণায় পুষ্ট একজন সাধারণ ব্যক্তি যদি কোন বস্তুর সামগ্রিক বিচারে মনে করে যে, সেটা অসৎ বা কুৎসিত-চিন্তার উদ্বেক করছে তাহলে সেই বস্তুকে ‘অশ্লীল’ বলে চিহ্নিত করতে হবে। অসৎ বা কুৎসিত-চিন্তা বলতে নগ্নতা, যৌন-ক্লিয়াকলাপ অথবা মলমূত্র ত্যাগ, ইত্যাদি ন্যাকারজনক চিত্র যদি এভাবে বিজ্ঞাপিত বা উপস্থাপিত হয় যাতে শালীনতার সীমা লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে মনে হয় তাহলেই সেটা অশ্লীল—বিশেষ, সে শিল্পবস্তুতে যদি সমাজ-সংস্কারের কোন উপাদান না থাকে।”

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, যদি আজকের বিচারে ঐ মূর্তিগুলি ‘অশ্লীল’ বলে চিহ্নিত হয়, তবু একথা বলা যাবেনা যে, শিল্পীরা ‘অশ্লীল’ মূর্তি গড়েছিলেন। কারণ ‘অশ্লীলতা’ বস্তুটা দেশকালের চিন্তা-ভাবনানির্ভর। আজকের ধ্যানধারণায় সেদিনের শিল্পীর বিচার করতে বসটা হবে পৃথিবী থেকে বাটকারা নিয়ে গিয়ে চাঁদে বসে ওজন করা।

অর্থাৎ সোজা কথায় আমাদের দুবার ওজন করতে হবে। একবার তদানীন্তন বাটকারায় বুকে নিতে হবে শিল্পী ‘অশ্লীল’ কিছু গড়েছিলেন কিনা এবং দ্বিতীয়বার আজ আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তা ‘অশ্লীল’ কি না।

নীতিবোধ, অশ্লীলতার সংজ্ঞা প্রভৃতি যে কী দূত বদলায় তা কারও অজানা নয়। অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া চলে এ বিষয়ে। ‘লরেন্সের লেডি চ্যাটালিজ ল্যান্ডার’ বা জেমস্ জয়েসের ‘ইউলিসিস’ যে অপরাধে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল তার শতগুণ প্রকটভাবে যৌনদৃশ্য বর্ণনা করা সত্ত্বেও আধুনিক ইংরাজী উপন্যাসগুলি সমগ্র ইংরাজী-ভাষী জগতে আজ বিক্রি হচ্ছে। ভিক্টোরিয়া যুগে কোনও মহিলা সর্বসমক্ষে পায়ের মোজা খোলার প্রস্তাবে মূর্ছা যেতেন, অথচ আজ টপলেস্ বিকিনি পরিহিতা মহিলার দল অবাধে সমুদ্রস্নান করে থাকেন। শিল্পের জগতেও তাই। মিকেলান্জেলোর ডেভিড, ব্যাকাস প্রভৃতি সম্পূর্ণ নগ্ন হওয়ায় আপত্তির কিছু ছিল না, কিন্তু ‘মানে’-র ‘লাগেন অন দ্য গ্রাস্’ প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

দ্রাষ্টা ঐখানেই। ‘অগ্নীলতা’ কোন শিল্পে বহুগুণভাবে থাকে না। তার মূল্যায়ন শিল্পের উপলব্ধিতে। পাঠক-দর্শক-শ্রোতা বা গ্রহীতা-নিরপেক্ষ কোনও শিল্পসত্তার অগ্নীল নয়, হতে পারে না। দর্পণের যেমন ক্ষমতা নেই জ্ঞানানোর—চেখ বুজলে আমাকে কেমন দেখায়, কোন শিল্পবস্তুও তেমন ক্ষমতা নেই বলায় : দর্শক-নিরপেক্ষ সে কতটা অগ্নীল। মধ্যযুগের ঐ মৈথুনবাদকে তাই প্রথমে বিচার করতে হবে সে-কালের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

ভারতবর্ষে যৌনতা বিষয়ে গোপনীয়তার অবকাশ কোন কালেই ছিল না—এ-কথা আগেই বলেছি। বৈদিক মন্ত্রে, উপনিষদে, মহাকাব্যে সেটা গোপন করার কোনও প্রয়োজনীয়তা কেউ অনুভব করেনি। মহাভারতকার ব্যাসদেব নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায় অকুণ্ঠভাবে বর্ণনা করতে পেরেছেন—কীভাবে তিনি শয়ং ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর জননীর গর্ভসঞ্চার করেছিলেন। মধ্যযুগে এ সত্যভাষণ অব্যাহত ছিল—এমনকি দেব-দেবীদের ক্ষেত্রেও। কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভবম্কে তাই অষ্টমসর্গে টেনে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। জয়দেব রসের বিচারে রাধাকৃষ্ণের প্রেমে তথাকথিত গ্নীলতা অগ্নীলতার বাধা মানলেন না।

পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু এমনটা হয়নি। গ্রীক যুগে অবশ্য অবস্থাটা ছিল ভারতবর্ষেরই মত। যৌনতার বিষয়ে গোপনীয়তার প্রয়োজন ছিল না। ‘ডায়োনিসাস’ উৎসবে নির্বিচারে যোগ দিত সবাই। প্রথমে শুধু স্ত্রীলোকেরা, পরে স্ত্রী-পুরুষ। তারপর সেনেটের আদেশে ১৮৬খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ঐ উৎসব আইন করে বন্ধ করা হল। পম্পাই ও হারিকিউলিসারের শিল্পেও আমরা তা দেখেছি।

খ্রীষ্টধর্মের প্রাদুর্ভাবের পর অবস্থাটা বদলে গেল। বাইবেল-মতে মানুষের জন্মটা হল আদি পাপ। তাই সহস্রাব্দ-পুষ্ট ধ্যানধারণায় পশ্চিমে যৌনতা বিষয়ে একটা নূতন মূল্যায়ন করা হল। রেনেসাঁ যুগ পর্যন্ত।

অপরপক্ষে ভারতবর্ষ বলল : ‘আনন্দাধেব খল্লিমানি ভূতানি জায়ন্তে’—বলেছে, জীবের জন্মের মূলে পাপ নেই, আছে ‘আনন্দ’। স্মরণে রাখতে হবে মধ্যযুগের শিল্পীদল সেই মন্ত্রেরই উত্তরসাধক।

তা হোক তবু শিল্পের নিজস্ব কতকগুলো ‘টাবু’ থাকে—ঐ যৌনতা বিষয়ে। তার রূপ বদলায়, যুগে যুগে। কয়েকটি কৌতুককর উদাহরণ আলোচনা করলে বিষয়টা বুঝতে সুবিধা হবে :

ভারতীয় মন্দিরে অযুত-নিযুত নায়িকা এবং অলসকন্যার ভিতর সম্পূর্ণ নায়িকা নারীমূর্তি নজরে পড়েছে? ষাকে বলে ‘ন্যুড’? না পড়েনি। নিল’জ্জ সঙ্গমরতা নারীর সঙ্গে আছে আভরণ, কটি দেশে মেখলার আভাস। কেন? ভারতবর্ষে তো ‘সান্তানোরেলা’-র আবির্ভাব ঘটেনি, এখানে চার্চ ছিল না, স্টেট ও বিষয়ে সংস্কারমুক্ত—তাহলে এখানে ‘ন্যুড’ গড়ে উঠল না কেন? ভারতীয় শিল্পী কি এ-কথা অনুধাবন করতে পারেননি যে, বিশেষ মুহূর্তে রমণীর রমনীয়তায় ঐ মেখলার আভাস, ঐ রক্তহার বা স্ফুটন্ত অস্তরায় হয়ে পড়ে? তবু মধ্যযুগ পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পী তাঁর নায়িকাকে ডেকে বলতে পারলেন না :

“ফেলো গো বসন ফেল, ঘুচাও অঙ্গল।

পরো শুধু সৌন্দর্যের নয় আবরণ।

অতনু ঢাকুক মুখ বসনের কোণে

তনুর বিকাশ হেঁরি লাজে শিরনত।

আসুক বিমল উষা মানব-ভবনে

লাজহীনা পবিত্রতা—শুভ্র বিবসনে ॥” ৮৩৥

আবার দেখুন, পশ্চিমখণ্ড নগ্ন নারীদেহ রূপায়নে সর্বমুখে উৎসাহিত হওয়া সত্ত্বেও কতকগুলি 'টাবু' বা বিধিনিষেধ মেনে চলত। প্রাচ্যে সে কথা চিন্তাই করা হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ ফরাসী শিল্পী মানে-র ফালজরী চিত্র 'মাসের উপর ভোজ' (১৮৬০) উল্লেখ করা যেতে পারে। সে প্রসঙ্গে এইমাত্র কিছু বলেছি—বোধকারি কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

উনিবিংশ-শতাব্দীর মাঝামাঝি 'মানে' ঐ তৈলচিত্রটি একে প্যারিসের বার্ষিক প্রদর্শনীতে পাঠিয়েছিলেন। বুদ্ধভায়া অশ্লীলতার দায়ে ছবিটি বাতিল করলেন। কী ছিল ছবিতে? তার একটি রেখা চিত্র (চিত্র-৮৭) এখানে



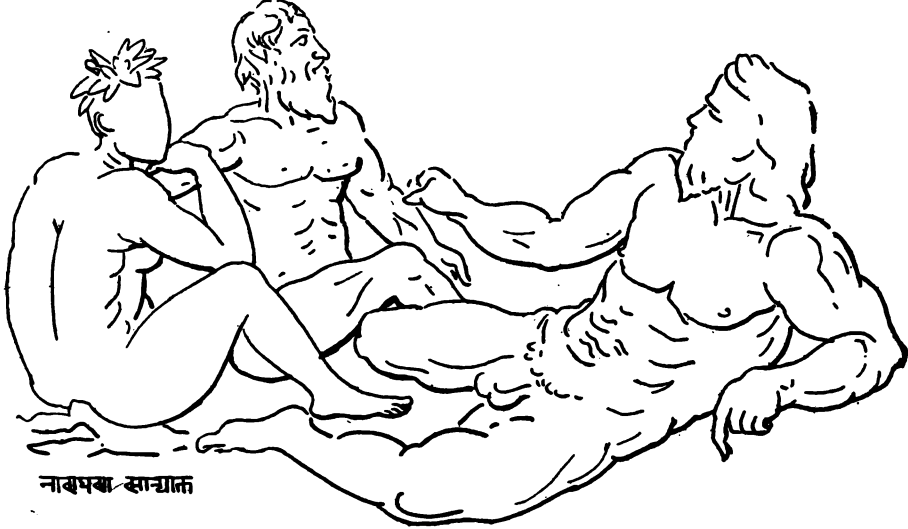
চিত্র : ৮৭ ॥ মাসের উপর ভোজ—মানে ॥

দেওয়া গেল। দুটি সুসজ্জিত পুরুষ, একজন অর্ধ-আবরিতা মহিলা, এবং অপর একজন সম্পূর্ণ নগ্নিকা নারী। তাঁরা সমবেত হয়েছেন—কী বলব? কুঞ্জবনের একান্তে বনভোজনে। মানে-র এই চিত্রের আঙ্গিক ও পরিকল্পনা রাফায়েল-এর একটি বিখ্যাত চিত্রের অনুসরণে।

চিত্রটির নাম 'প্যারিসের বিচার' (আঃ ১৫২৫)। বিষয়বস্তু ভিন্ন প্রকারের, কিন্তু চরিত্রগুলির সংস্থাপন বা কম্পোজিশন এক সুরে বাঁধা। তুলনা করতে সুবিধা হবে মনে করে সুবৃহৎ চিত্রটির অংশবিশেষের একটি রেখা চিত্র এখানে সংযোজিত হল (চিত্র-৮৮)।

রাফায়েলের ঐ ক্লাসিকাল চিত্রটি শিল্পজগতে স্বীকৃত; তাহলে মানে কেন প্রত্যাখ্যাত হলেন? তবে কি বুঝতে হবে, যে-হেতু মানে তাঁর পুরুষ মূর্তি দুটিকে পোষাক পরিগেহন তাই ছবিটা শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করল? অর্থাৎ বিবস্ত্রা রমণী নয়, সুসজ্জিত যুবকবরের উপস্থিতিই এ চিত্রটিকে অশ্লীল করে তুলেছে। আপাতঅদ্ভুত মনে হলেও হুক্তিটা উড়িয়ে দেবার নয়। আজও পশ্চিমখণ্ডের ন্যাডিস্ট-কলোনিতে পোষাক-পরিহিত স্ত্রী-পুরুষদের প্রবেশাধিকার নেই—সেই মুক্ত-পরিবেশে সুসজ্জিত নারীপুরুষ শূন্য বেমানান নয়, অশ্লীল! কিন্তু এক্ষেত্রে তাও যে মেনে নিতে পারছি না।

সে আইন তো শিম্পঞ্জগতে প্রযোজ্য নয়। জর্জনের 'টেম্পেস্ট' (ষোড়শ শতাব্দী) তৈলচিত্রে পুরুষটি সুসজ্জিত নারী ন্যূড। এই একই চিত্রকরের Fete champetre (আঃ ১৫০৫)-এ দেখছি পোষাক পরা দুটি যুবক, একটি



চিত্র : ৮৮ ॥ প্যারিসের বিচার—রাফায়েল ॥

প্রায়-নিগ্নিকা রমণী এবং অপর একটি সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা স্ত্রীলোক (চিত্র—৮৯)। মানের সমসময়ে এই চিত্রদ্বয় তিনশ বছরের পুরাতন শিম্পসম্পদ—স্বীকৃত এবং অভিনবিত। তাহলে ?

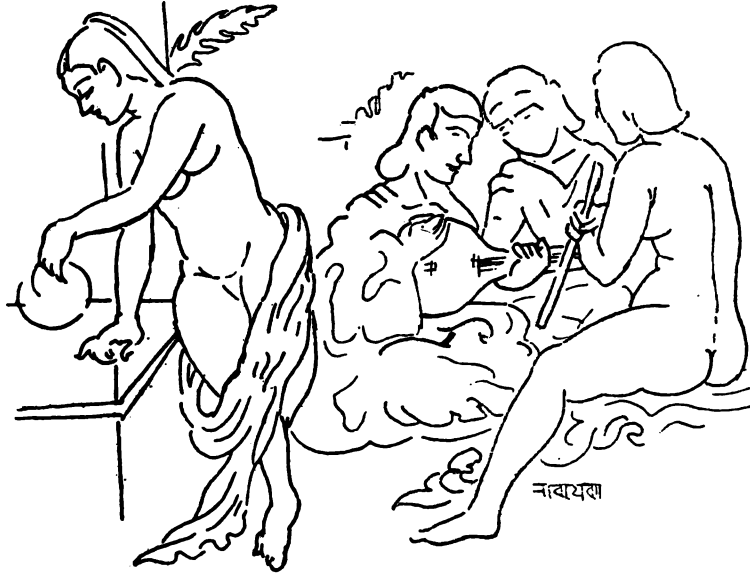
বস্তুতপক্ষে ফরাসী বিচারকদের চোখে যেটা বিসদৃশ লেগেছিল তা হচ্ছে মানে-র আঁকা যুবকদ্বয়ের আধুনিক পোষাক। ওদের পরিধানে ছিল তদানীন্তন ফরাসী-ফ্যাসনের 'থ্রু-পাঁস সুট'। এই বাস্তবতাবোধকে কিছুতেই অস্বীকার করা যাচ্ছিল না। তাই ক্লাসিকাল বিষয়বস্তুটা তার ক্লাসিকাল হারিয়ে ওঁদের চোখে অঙ্গীল বলে মনে হয়েছিল। যুবকদ্বয়ের আধুনিক পোষাকের পরিপ্রেক্ষিতে এই অনাবৃত্তা রমণী আর 'ন্যূড' থাকেনি, হয়ে গিয়েছিল 'নেকেড'।

মজা হচ্ছে এই যে, উনিবিংশ শতাব্দীতে শিম্প-বিচারকেরা চিত্রটিকে প্রত্যাখ্যান করলেও পরবর্তী যুগে সেটি দর্শকের মূল্যায়নে শুধু স্বীকৃত নয়, অভিনবিত হয়েছিল। বর্তমানে মানে-র এই তৈলচিত্র বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিম্প-সম্পদ।

এতকথা বলতে হল এজন্য যে, আমাদের খেলায় রাখতে হবে—কোন শিম্পবস্তু গ্রীলভার মাত্রা অতিক্রম করেছে কি না তা নির্ভর করছে—'কে দেখছে' তার উপর। সমকালীন দর্শকের শিক্ষা, সামাজিক বোধ, তার শৈল্পিক ধ্যান-ধারণা ইত্যাদির উপরই শিম্পবস্তুটির বিচার সম্ভব।

আরও একটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে : নারীবক্ষের সোল্‌বর্ষ। যৌবনবতীর এই যুগজরন্তুর প্রশংসায় বিশ্ব-শিম্প দেশকালভেদে উচ্ছ্বসিত। সাহিত্যে, কাব্যে, চিত্রে ভাঙ্কর্ষে। কী প্রাচ্যে, কী প্রতীচ্যে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—দেশকালভেদে শালীনতা এ বিষয়ে ভিন্ন প্রকার নির্দেশ দিয়ে রেখেছে। প্রতীচ্য যদিও গ্রীক

রোমক যুগ থেকেই নগ্ননারীর বক্ষকে শিল্পের উপাদান করে নিয়েছিল তবু তা ছিল নৈর্যাত্তিক শিল্পবস্তু। যখনই চিত্রের বিষয়বস্তুটি পরিচিত—অর্থাৎ সমসাময়িক পরিচিত রমণীর পোয়েট বা বাল্ট-স্টাড, তখনই শিল্পী সেই পরিচিতা মহিলার বুকের উপর লাজবস্ত্র টেনে দিয়েছেন। ইয়ান-ভ্যান আইক-এর ‘গিওভার্মি ও তার স্ত্রী’ থেকে শুরু করে ওয়াডেন-এর ‘পোয়েট অব এ লেডি,’ লিওনার্দোর ‘গিনেভ্রা দেই বেনসী’ অথবা মোনালিসা, তিজিয়ানোর ‘লা বেলা’ প্রভৃতি। দেলাক্রোয়ার ‘মাদমোয়াজ্জেল রোজ’ অথবা মানের ‘অলিম্পিয়াকে’ ব্যতিক্রম বলা যাবে না, কারণ ‘রোজ’ অথবা মানে-র মডেল জিতোরিন ম’-রেন্স সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা নন, সর্বজনপরিচিতা আর্টিস্টের মডেল—ফুঁডিওর একান্তে ন্যূত চিত্র আঁকানো যাদের জীবিকা। বরং ব্যতিক্রম : ক্রোদের আঁকা স্নানরতা দুই ভগিনী—সেখানে দেখা যাচ্ছে, গ্যাব্রিয়েল ভ’স্টে এবং ভিলায়ের ডাচেস—দুই ভগ্নী, একটি বাথটবে নেমেছেন এবং শেষোক্ত মহিলা বিকচ-উন্নত গ্যাব্রিয়েলের



চিত্র : ৮৯ ॥ Fate Champetre—জর্জনে ॥

দক্ষিণ স্তনবৃত্তটি দুটি আঙুলে ধরেছেন—অর্থাৎ বলতে চাইছেন, রাজা চতুর্থ হেনরীর, গ্যাব্রিয়েলের স্বামীর, সন্তানলাভ আসন্ন। এই জাতীয় দু-চারটি নিতান্ত ব্যতিক্রম ছাড়া রূপোপায় প্রতিকৃতিতে নারীবক্ষ দেখানো হয়নি, যেখানে মহিলাটি পরিচিত। বরং দেখা যাচ্ছে, ঐ অলিখিত ‘টাবু’-র নির্দেশ যখন শিল্পী নিতান্তই অগ্রাহ্য করেছেন, তখন তাঁকে তা আঁকতে হয়েছে গোপনে। যথা : গোইয়ার ‘মাজা দ্য ন্যুড;’ অথবা মোনালিসার অনুপ্রেরণায় ভবিষ্যত যুগের শিল্পীর ‘অনাবৃতা মোনালিসা’। পলিন বোনাপার্ট ছিলেন অসামান্য সুন্দরী, সুতনুকা। শিল্পী কানোভার অনুরোধে তিনি তাঁর নগ্ন মডেল হতে স্বীকৃত হলেন ; কিন্তু সর্ব হল সে-ক্ষেত্রে নগ্নিকাকে পৌরাণিক পরিবেশে আঁকতে হবে। অর্থাৎ তামুকুট সেবনে আপত্তি নেই, তবে নলুচের আড়ালটা চাই। পশ্চিমখণ্ডের এই ‘টাবু’ বোধ হয় সর্বপ্রথম অস্বীকার করলেন উনিবিংশ-শতাব্দীতে রেনোয়ঁ তাঁর *La Baigneuse blonde* চিত্রে। বিকচ-বক্ষা মডেল হচ্ছেন মহান শিল্পীর সহধর্মিনী স্বয়ং।

তুলনায় দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষে অসংখ্য সমসাময়িক নারীমূর্তি চৈতন্যদ্বারা উৎকীর্ণ করা হয়েছে—অধিকাংশই দাতার সহধর্মিণী, রাজমহিষী অথবা শ্রেষ্ঠিণী, যেখানে মহিলাটি সগৌরবে স্তনযুগল বিকশিত করে দণ্ডায়মান। (চিত্র—১৬ একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ)। জানি না, ভারতীয় আর্থনারী সে-যুগে ও-ভাবে বিকচ-উরসা সজ্জায় সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন কি না, অথবা শিল্পী তাঁর কম্পনায় ঐ রমণীয় বরাদ্দ রূপায়িত করার শৈল্পিক তথা সামাজিক অনুমোদন লাভ করেছিলেন। অথচ আরও লক্ষ্য করে দেখুন—মন্দির বা চৈতন্যদ্বারা উৎকীর্ণ দাতার সহধর্মিণী, শ্রেষ্ঠিণী বা রাজমহিষীদের নিয়াজ আবশ্যিকভাবে আবৃত। যে-ভাবে অসম্প্রোচ দাঁড়িয়ে আছে মহেন-জো-দারোর কিশোরী (চিত্র—৭), সঁচী বৃক্ষিকা (চিত্র—১) অথবা মথুরা-বৃক্ষিণী- (চিত্র—৮)—কিংবা প্রতীচ্যখণ্ডের সংখ্যাতীত ন্যূড-মডেল, সেভাবে তাঁদের দাঁড়ানো মানা।

যে-কারণে এত-এত উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করছি এবার সেই মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাই : মধ্যযুগের শিল্পীদল ঐ যে মৈথুনরত মিথুন উৎকীর্ণ করেছেন, তাতে তাঁরা তৎকালীন শ্রীলতার সংজ্ঞা সম্বন্ধে লক্ষ্যন করেছিলেন অথবা করেন নি। তখন শিল্পজগতে ঐ রকম কোন ‘টাবু’ বা বিধিনিষেধ ছিল, কি না। স্বীকার করতে হবে, না ; ছিল না বলেই ভারত উপদ্বীপের বিভিন্ন প্রান্তে ঐ বিষয়বস্তুটি বিভিন্ন যুগে রূপায়িত হয়েছে—কম আর বেশী। কোনার্ক ও খাজুরাহাতে হয়তো তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ—কিন্তু কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, দ্বারকা থেকে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর তাদের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। সুতরাং স্বীকার করে নিতেই হবে যে, মধ্যযুগের শিল্পীদল অশ্রীলতার তদানীন্তন সংজ্ঞা অনুযায়ী মাত্রাতিরিক্ত কোন কিছু করেননি—*not beyond the customary limits of candour*।

এবার ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বিতীয়বার বিচার করি : অর্থাৎ বর্তমান-যুগের মানদণ্ডে, আজকের দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনার্ক-খাজুরাহোর ঐ মূর্তিগুলি কি অশ্রীল ?

ললিতকলায় কোনটা শ্রীল, কোনটা অশ্রীল—কোনটা রসোন্মীর্ণ, কোনটা নয়,—কাকে বলব ‘পর্নোগ্রাফী’, কাকে ‘আর্ট’, তা মেপে দেখার নতুন মাপকাঠি আজকে খুঁজে দেখতে হবে। বেনিদত্তো ক্রোচে থেকে টস্টের, অবনীন্দ্রনাথ থেকে নন্দলাল আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, ‘আর্ট’ বা বিশুদ্ধ শিল্প বলতে কী বুঝি। পৃথিবী তার পরে আরও কয়েক কদম এগিয়ে গেছে, আমাদের ধ্যানধারণা অনিবার্যভাবে আরও কিছুটা বদল হয়েছে। এখন, আজকের দিনে আমরা ‘আর্ট’ ও ‘পর্নোগ্রাফী’র সীমারেখাটা নতুন ভাবে নির্ণয় করতে পারি তিনটি মূল সূত্রে :

(ক) শিল্পীকে তাঁর শিল্পকর্মে উদ্বুদ্ধ করার মূল প্রেরণাটি যেন তাঁর আন্তরিক তাগিদে হয়—বাহ্যিক আরোপিত কারণে না হয়।

(খ) শিল্পীর আন্তর-উষ্ণতা যেন শিল্পের মাধ্যমে দর্শকের অন্তরে সংক্রামিত হয়—এবং একই মানস-সমতলে দণ্ডায়মান শিল্পী ও দর্শকের অন্তরে একই রেসনেসে এক্যতান রচনা করে।

(গ) দৃশ্যমান শিল্পবস্তু থেকে যাত্রা শুরু করে, তারই ইঙ্গিতে দর্শক যেন নতুন কোন মানস-দিগন্তের দিকে অভিযানের সুযোগ পায়।

ঐ তিনটি সর্ব স্বীকৃত হলেই সেটি সার্থক শিল্পপদবাচ্য। এবার একটু বিস্তারিত করে বাল :

বাহ্যিক আরোপিত কারণ অনেক রকম হতে পারে ; যদি কোনও কথা-সাহিত্যিক গরম কেক-এর মতো বই বিক্রি হবে আশা করে যৌনদৃশ্যের অথবা যৌনসঙ্গমের নিরাবরণ বর্ণনা দিতে থাকেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই শিল্পদৃষ্টি করছেন না। অপরাপক্ষে বিস্তারিত যৌনদৃশ্যের বর্ণনা দিলেই যে গ্রন্থটি পর্নোগ্রাফী পর্যায়ভুক্ত হবে এমন কোনও কথা নেই। যেমন ধরা যাক, লরেন্সের

‘লোডি চ্যাটার্জ ল্যান্ডার’ গ্রন্থটি। স্বামী বৌদ্ধমতাহীন, স্ত্রীর মানসিকতা বোঝাতে লেখক যে দৃশ্যগুলি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন তা গ্রন্থের মূল উপজীব্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। আরও একটি অনবদ্য উদাহরণের কথা হঠাৎ মনে পড়ল। লেখকের নাম বা গ্রন্থের নাম মনে নেই—তবে পরিবেশটা মনে আছে :

কাহিনীর নায়িকা একটি বাইশ বছরের জার্মান ইহুদী মেয়ে। ঘটনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমলের। মেয়েটি একটি ইহুদী ছেলেকে ভালবাসল। সোনালী চুল, তারুণ্যের প্রতীক—বোসেফ। কিন্তু ওদের বিয়ে হওয়ার আগেই জার্মান গেস্টাপো বোসেফকে ধরে নিয়ে গেল। মেয়েটি পালিয়ে গেল ছাত্রাবাসে। সেখানে একদিন প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের মধ্য থেকে মেয়েটি—মনে করুন তার নাম ‘এ্যানা’, কোনক্রমে প্রাণে বেঁচে বেরিয়ে এল। সে রাতে ওর একটি অভিন্ন-হৃদয় বান্ধবী ওর বাহুবন্ধের মতোই মারা গেল। বান্ধবীর বয়স, ওজন, উচ্চতা, চোখের মণি, চুলের রঙ ওরই মতো এবং সে ছিল একজন অফার্ন; খাঁটি নর্ডিক। এ্যানা ঐ বান্ধবীর আইডেন্টিটি কার্ডখানা হস্তগত করে সে দেশ থেকে পালালো। নতুন শহরে গিয়ে সে ঐ বান্ধবীর পরিচয়ে প্রতিষ্ঠা পেল। চাকরি জুটল একজন বয়স্ক কটর নাৎসী কর্ণেলের সেক্রেটারীরূপে। ক্রমে সে তাঁর স্নেহপাত্রী হল। কর্ণেল ছিলেন বিপত্নিক ও নিঃসন্তান। তিনি এ্যানাকে কন্যাস্বত্ব বরণ করতে চাইলেন। জীবনধারণের তাগিদে এ্যানা বাধ্য হয়ে রাজী হয়ে গেল। তখন হিটলারের রাজত্ব। নর্ডিক রক্ত না থাকলে কোন আর্থ-জার্মান কাউকে দস্তক নিতে পারে না। সুতরাং কর্ণেলের আবেদন পেয়ে নাৎসী বড়কর্তারা হুকুম দিলেন এ্যানাকে ডাক্তারী পরীক্ষা করাতে হবে।

এ্যানা এল মেডিকেল-বোর্ডে। বান্ধবীর ডায়েরী তার কণ্ঠস্থ; সব কথাই জানা। মেডিকেল বোর্ড খোঁজ নিয়ে দেখলেন, এ্যানার দেওয়া জবানবন্দী নিচুঁল, যদিও তাদের পৈত্রিক গ্রামটি বোমা বর্ষণে নিশ্চিহ্ন। এবার ওর রক্ত পরীক্ষা করানো হল—খোদায় মালুম, ইহুদী ও নর্ডিক রক্তের কী ফারাক তাঁরা পরীক্ষা করলেন—মোট কথা সেখানেও বাধল না। তৃতীয় পরীক্ষা দৈহিক। মেয়েটির রত্নজ রোগ আছে কি না দেখা দরকার।

ডাক্তারের আদেশে এ্যানাকে বিবস্ত্র হতে হল। একজামিনেশন টেবিলে শুয়ে পড়তে হল। হাজার ক্যান্ডেল-পাওয়ার ব্যতির আলোয় বিবৃত-জঘন্য মেয়েটির কথা লিখতে বসে লেখক যে পরিবেশ রচনা করেছেন তা করুণরসে আঙ্গুত। আমরা শুনতে পেলাম প্রধান পরীক্ষক কোঁতুক করে বলছেন, Hey! Come and see the eighth wonder of the world!

আটদশজন ছাত্র ছুটে এল দৃশ্যটা দেখতে। একজন সাহস করে বললেন, অষ্টম আশ্চর্যটা কী স্যার?

ডাক্তার বললেন, Can't you see? Here's a girl, aged twentytwo, and she is yet a virgin!

এ্যানার চোখ দিয়ে তখন জল গড়িয়ে পড়ছে। তার মনে পড়ছে বোসেফের একটা কথা—ওদের এক গোপন সাক্ষাতকারের স্মৃতি। ও স্পষ্ট শুনতে পেল বোসেফের কণ্ঠ: Not tonight Anne! I must marry you first!

কী বলবেন? এ রচনা অগ্নীল? এ বর্ণনায় বৌনতা কোথায়? এতো কারুণ্য-জাহ্নবীতে ভরা কোটাল!

দ্বিতীয় কথা—শিল্পী যে ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রসসৃষ্টি করেছেন, সেই রস যেন ঐ শিল্পের মাধ্যমে দর্শক আনন্দান করতে পারে। যেমন সদ্য-আলোচিত কাহিনীতে কথাশিল্পী ঐ কুমারী মেয়েটির বস্তুগত কাতর হয়েছিলেন—বাইশ বছরের একটি কুমারী মেয়ে তার কৌমার্যকে সুগোপনে রেখেছে, সে জানে না বোসেফ ইতিমধ্যে গ্যাস-চেম্বারে গেছে। সে বরণ আশা করে বসে আছে, স্বুদ্ব শেষে বোসেফ ফিরে আসবে, তাকে গ্রহণ করবে—যে সম্পদ সে তার দেহ-মনে এতদিন সন্মোহনে রেখেছে তাই দিয়ে অর্ঘ্য ধালা সাজিয়ে সে তার প্রেমাস্পদকে বরণ করে নেবে। তার সেই গোপন

বাসনাটি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল ডাক্তারবাবুর হৃদয় রসিকতায়। এই বেদনার্দ্ৰ ভাবটি যদি পাঠকের মনে সংক্রামিত হয়—যৌনতা অতিরিক্ত যে করুণ রস, তা যদি পাঠক মনে সঞ্চারিত হয়ে একটি অনুরগন সৃজন করে, তবেই ঐ হাজার বাতির আলোয় উদ্ভাসিত বিবৃত-জঘনার বর্ণনাটি সার্থক। নচেৎ তা পনোঁগ্রাফী।

তৃতীয় কথা : শিল্পবস্তুতেই যেন দর্শক, পাঠক বা শ্রোতার—রসগ্রহীতার মানসযাত্রা সীমিত না হয়। সে যেন ঐ ইঙ্গিত সম্বল করে নিজে নিজেই নতুন কোনো মানসদিগন্তের দিকে অভিসারী হতে পারে। শিল্প সম্বন্ধে এটাই বরং সাম্প্রতিক চিন্তা।

এই তিনটি মানদণ্ডে যদি মধ্যযুগীয় ঐ শিল্পকলাকে বিচার করি তাহলে বলব : অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা রসোত্তীর্ণ ও সার্থক। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে নয়। যেমন, কোনার্কের ষোড়-যৌনাচার দৃশ্যগুলি নয়, খাজুরাহো কোনার্কের অধিকাংশ বিকৃত কামের পরিকল্পনাগুলি নয়। তাতে যৌনতা ছাড়া আর কিছুই নেই। এ্যানা যেমন যৌনতার পথে আমাদের অন্য এক তীরে পৌঁছে দিতে পেরেছিল, তারা তা পারেনা। সে মূর্তিগুলির মুখভাবে দৈহিক আনন্দ লাভের বাঞ্ছনা পৰ্ব্বস্ত নেই—শুধুই এ্যানাটিম ; তাও হৃদয়।

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, বছর দুই পূর্বে একটি প্রখ্যাত বাঙলা সাপ্তাহিকে খাজুরাহো বিষয়ে একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল—খাজুরাহো মন্দিরে একটি নৃত্য অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে। সে প্রবন্ধে মন্দির ও নৃত্যদৃশ্যের সঙ্গে একটি পশুমৈথুন দৃশ্যের আলোকচিত্রও ছাপা হয়েছিল। পত্রিকাটি বহুল বিক্রীত এবং লেখক স্বনামধন্য বলেই এ-কথার উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি। প্রবন্ধের সঙ্গে ঐ পশুমৈথুন দৃশ্যের প্রাসঙ্গিকতা ছিল কি ছিল না, সে প্রশ্ন তুলছি না। আমার বক্তব্য প্রথমত—এ-ক্ষেত্রে যেন ধারণা করা না হয় যে, খাজুরাহোতে ঐ জাতীয় পশুমৈথুন চিত্র বস্তুতঃ ছড়ানো। আমার ধারণায়, তা হাজার-করা একটিও নয়। বোধকারি, পত্রিকার নিজস্ব আলোক চিত্র শিল্পী বহু পরিশ্রমে সেটি খুঁজে পেয়েছেন।



চিত্র : ১০

পশুমৈথুন ॥ ইরোটিকা সংগ্রহশালা ॥ নেপল্স

দ্বিতীয় কথা—বুঁচি নয়, রসের বিচারেও সেটি ছাপানোর উপযুক্ত নয়। পশুমৈথুন একটি কাম-বিকার। সুতরাং বুঁচির সমর্থন তাতে না থাকারই কথা ;

কিন্তু রসের বিচারে তা সার্থক হতে পারে। তুলনা করুন, নেপল্স সংগ্রহশালার আর একটি পশুমৈথুন-দৃশ্যের সঙ্গে। সেটিকে আমি পনোঁগ্রাফী পর্যায়ভুক্ত বলব না (চিত্র—১০) বলব সার্থক শিল্পসৃষ্টি। কারণ এটি যৌনতা-অতিরিক্ত

এক শিম্পভাবনার দ্যোতক। এখানে পুরুষটি মানুষ নয় : প্যান। সে অর্ধ-মানব, অর্ধ-অজ। প্রথম যুগে প্যান ছিল একজন গ্রীক দেবতা, পরে একজন উপদেবতা। বনে জঙ্গলে সে ঘুরে বেড়ায়, বাঁশ বাজায় আর আর্কাডিয়া উপত্যকায় ‘নিম্প্‌স্‌’-দের (বনদেবীদের) তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ওর নাম থেকেই ইংরেজিতে pan-pipe ও panic শব্দদুটির জন্ম। গ্রীক শিম্পী ঐ রকম এক অর্ধ-মানব অর্ধ-ছাগের সঙ্গমদৃশ্য রূপায়িত করেছেন—যা আমাদের হিসাবে পশুমৈথুন ছাড়া আর কিছু নয়।



চিত্র : ৯১

প্যান ॥ ইরোটিকা সংগ্রহশালা

কিন্তু শিম্পী তাঁর কম্পনার লাগাম আলগা করে দিয়েছেন। ছাগী সঙ্গমরত ছাগীর ভক্তিতে, অবস্থানে নেই—সেও যেন মানবী। অপরপক্ষে প্যান তার আকৃতিতেই শুধু নয়, ব্যবহারে, ভাবব্যঞ্জনায় অর্ধ মানুষ অর্ধ পশু। লোলিতা উপন্যাসে অবদমিকতাম বৃদ্ধের মানসিক হাহাকারে যেমন যৌনতা-অতিরিক্ত একটা বস্তু আছে এখানেও যেন অন্তরাত গ্রীক শিম্পী আমাদের তেমনই একটি অভিনব রস পরিবেশন করেছেন।

প্যানের মুখটুকু আবার বড় করে এঁকে দেখাতে হল (চিত্র—৯১) লক্ষ্য করে দেখুন, কী আশ্চর্য দক্ষতায় শিম্পী ঐ জীবটির ঐতসন্তাকে রূপায়িত করেছেন। ওর নাসিকাকুণ্ডলে, বিকসিত জিহ্বায়, দৃষ্টিতে, হাস্যে ওর ঐতসন্তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। পশুষ সত্ত্বও সে মানুষ; মনুষ্য সত্ত্বও পশু। সুখানুভূতির সঙ্গে পাশবিকতার সংমিশ্রণে বীভৎস-রসের এ এক অপূর্ব নিদর্শন।

কোনার্ক খাজুরাহাতে কামবিকার দৃশ্যগুলিতে এই জাতের শিম্প-মানসের সাক্ষাত পাইনা বলেই সেগুলি রসোত্তীর্ণ বলতে আমরা আপত্তি। না, সেগুলি ভেঙে ফেলতে নিশ্চয়ই বলব না আমি ;

ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসাবেই সেগুলি থাকবে ; কিন্তু তাই বলে সেগুলিকে সার্থক শিম্পসৃষ্টিরূপে স্বীকার করে নিতেও আমি রাজী নই।

ডক্টর আনন্দ্ বলছেন, “But we have to look at it from within the orbit of a philosophy of salvation through pleasure, and not from a superior standpoint of a Christian or latterday Hindu puritanism. ‘[কিন্তু ওদের বিচার করতে হবে আনন্দের-মাধ্যমে-মুক্তির দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে—খ্রীষ্টানের অথবা আধুনিককালের গোঁড়া হিন্দুর উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়] ৮৪ ॥

প্রত্যন্তরে বলব, গোঁড়া হিন্দু বা কটর খ্রীষ্টানের মতো নয়, নিতান্ত শিম্পসমালোচক হিসাবেই প্রত্যেকটি মৈথুনকে শিম্পপদবাচ্য বলতে পারছি না। এবং আরও বলব : গোঁড়ামীর কিন্তু দুটি প্রান্ত। মুসকরাজ সওয়াল করতে বসে অপরাহস্যের গোঁড়ামীর পরিচয় দিয়েছেন তাঁর গবেষণায়—যেন যা-কিছু ভারতীয় তাই মহান, যা-কিছু প্রাচীন তাই প্রগম্য। যা-কিছু দেবনাগরী হরফে লেখা তাই অদ্রাস্ত সত্য। না হলে ভারতবিদ পণ্ডিত ডক্টর মুলকরাজ আনন্দ্ কোনার্ক-প্রসঙ্গে কিছুতেই লিখতে পারতেন না : ৮৫ ॥ “A hundred Michelangelos may have spent themselves for two generations to achieve a structure...”[শতজন মিকেলান্জেলো দুই পুরুষ ধরে নিরন্তর

পরিপ্রমোদ এমন একটি মহান কীর্তি...]। ডক্টর আনন্দের কাছে আমরা আরও কিছুটা সংযম প্রত্যাশা করি। এ-কোন কুলের ছাত্রের পরীক্ষার খাতায় লেখা প্রবন্ধ নম্ব বে, উচ্ছ্বাসের বন্যাপ্রোতে ভারসাম্য ঠিক থাকবে না। আর কেউ না জানলেও মার্গ-পটিকার সম্পাদকের জানা উচিত—কোনার্ক জগমোহনের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যের তুলনায় মিকেলাঞ্জেলোর ডোভিড, পীতা, মোসেস, সিসুতিন চ্যাপেলের সিলিঙ এবং শেষ বিচারকে এভাবে তুচ্ছ করা কোন শিল্পসমালোচকের পক্ষে অশোভন। সৌরমণ্ডলের এই তৃতীয়গ্রহে সমগ্র মানবসভ্যতার ইতিহাসে কোনও দেশে, কোনও যুগে কোনও শিল্পী একা-হাতে এত বিরাট এবং এমন মহান শিল্পসম্পদ গড়েছেন কি না সন্দেহ।

আমার আপত্তির দ্বিতীয় হেতু ওদের সংখ্যাধিক্য।

জীবনে যৌনপর্যায় অনস্বীকার্য—সৃষ্টির মূল সেখানে নিহিত। কিন্তু জীবন শুধুমাত্র যৌনাচার নয়। শিল্প তো জীবনেরই প্রতিবিম্ব—হয়তো সাজেসটিভ প্রতিফলন। তাহলে মানব-জীবনে যৌনাচারের যতখানি স্থান, যতখানি গুরুত্ব, মধ্যযুগের ঐ শিল্পীরা তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করলেন কোন অধিকারে? এদিক থেকে মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেলের একটি উক্তি স্মরণীয় : Joy of life depends upon a certain spontaneity in regard to sex (জীবনে আনন্দলাভ যৌনাচারের স্বতঃস্ফূর্ততার আংশিকভাবে নির্ভরশীল) তবু স্বার্থহীন ভাষায় তিনি বলেছেন : “ I wish to repeat, as emphatically as I can, that I regard an undue preoccupation with this (sexual indulgence) as an evil (আমি আবার বলতে চাই, যতটা গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব ততটা জোর দিয়েই বলতে চাই যে, আমার মতে যৌনাচারের প্রতি অযথা গুরুত্ব আরোপ করাটাও ভালো নয়)। ৮৬ ॥

মধ্যযুগের ঐ মৈথুনবাদ সম্বন্ধে এটাই বোধ হয় শেষ কথা।

টীকা ও উৎস নির্দেশ

কং	পৃষ্ঠা	সূত্র ও মন্তব্য
১	১	শিল্পকথা, নন্দলাল বসু, পৃঃ ১৯
২	৪	India and the Hindoos, by Ferdinand de Wilton Ward, 1850.
৩	৫	Paradise Lost, J. Milton, Book 1, (lines 392-505).
৪	৫	The Greek Myths, by Robert Graves. Vol 1, p. 109.
৫	৬	The Art and Architecture of India, by B. Rawland, p. 15,
৬	১০	Orissa & Her Remains, by M. M. Ganguly, 1912.
৭	১০	History of Orissa, by Prof. R. D. Banerji, Vol II, p. 401.
৮	১১	অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু মহাশয়ের সংকলিত পুঁথিগুলির ভিতর, এবং বিশেষ করে 'ভুবন প্রদীপে' এ নির্দেশ আমি খুঁজে পাইনি।
৯	১১	'মানসী' পত্রিকা, আশ্বিন - অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন, ১৩২০
১০	১৩	ঐ , আষাঢ়-শ্রাব্দ, ১৩২১
১১	১৪	'Kama Silpa', by F. Leeson, M/s Taraporevala & sons, Bombay, 1962
১২	১৪	Ideals of Indian Art, by E. B. Havel, London, 1911
১৩	১৫	'An Approach to Hindoo Erotic Sculpture', an article published in Marg. Bombay, 1948, by Mr. A. Danielon.
১৪	১৬	Bengal Lancer, by F. Y. Brown. 1930
১৫	১৭	Kama Kalpa, by P. Thomas, Bombay 1959. p. 139
১৬	১৭	The Human Zoo, by Desmond Morris, p, 113
১৭	১৭	Khajuraho Sculpture and their Significance, by Smt. U. Agarwal, Bombay.
১৮	১৮	'An Approach to Hindoo Erotic Sculpture, by Danielon.
১৯	১৮	'Kama Kala', by Dr. M. R. Anand, Geneva. 1958, p. 26
২০	২১	শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তীর অনুবাদ-কবিতা
২১	২১	কোণারকের বিবরণ, অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, ১৯৬০, পৃঃ ৭৭-৭৮
২২	২৭	কৃষ্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহীর মতে ভাস্করেশ্বর দেউলের শিবলিঙ্গটি একটি অশোকস্তম্ভের ভগ্নাংশ [Archaeological Remains at Bhubaneswar, by K. C. Panigrahi, Orient Longman, 1961, P. 187]. অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু এ মত মানেননি [J. B. O. R. S. Vol xv. p. 261]

নং	পৃষ্ঠা	সূত্র ও মন্তব্য
২০	২৮	'Arthavallava Mohanti Memorial Lectures', First series, 1964. by Prof. S. K. Chatterji (Orissa Sahitya Akademi, Bhub.) 1966, p. 56
২৪	৩০	Article by Dr. M. R. Anand in Marg, Special no 'Khajuraho'.
২৫	৩৩	Kama Shilpa, by F. Leeson, p. 52
২৬	৩৫	Arch. Remains at Bhubaneswar, by Dr. K. C. Panigrahi,
২৭	৪৩	'Arthavallava Mohanti Lecture', by S. K. Chatterji, p. 54.
২৮	৪৯	Bhubaneswar, by Smt. Debala Mitra Arch. Survey of India, p. 17.
২৯	৫৩	ভারতশিল্পে মূর্তি, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ২৮
৩০	৫৩	জীমার চিত্রটির পরিচয় দিয়েছেন হরপার্বতীর বিবাহ '। বর্তমান গ্রন্থকারের মতে নামকরণটি প্রমাস্কক —এটি 'গঙ্গাবতরণ দৃশ্য'। বিষ্ণুম ঠামেই বোঝা যায় মিলন নয়, 'বিরহ ও অভিমান' এর মূল উপজীব্য [Art of Indian Asia, by H. Zimmer, Vol II, Plate 257].
৩১	৫৬	এ গ্রন্থে চিত্র : ৩৩-এর ভালো আলোকচিত্র পাবেন Zimmer-এর Vol. II, Plate 114-এ।
৩২	৫৭	মেষদূতম্, কালিদাস
৩৩	৫৭	কুমার সম্ভবম্, ঐ
৩৪	৫৯	চিত্র : ৩৫-এর ভালো ফটোগ্রাফ পাবেন মার্গপত্রিকার কোনারক বিশেষ সংখ্যায়, 1968, প্লেট 56,
৩৫	৫৯	ঐ ঐ Plate 57
৩৬	৬০	শেষের কবিতা, রবীন্দ্রনাথ
৩৭	৬০	'চুষন', ঐ
৩৮	৬১	চিত্র : ৩৮-এর ভালো ফটো—মার্গ, কোনারক সংখ্যা (1968) প্লেট 58.
৩৯	৬২	চিত্র : ৩৯-এর ঐ —Kama Shilpa, by Leeson, Plate 56,
৪০	৬২	চিত্র : ৪০-এর ঐ —মার্গ, কোনারক সংখ্যা, পৃঃ 18,
৪১	৬৬	'প্রিমাতেরা' চিত্রের (৫৭) ঐ —'শাস্ত্রাত্ম চিত্রশিল্পের কাহিনী', বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, এম, সি সরকার, প্লেট-৪৬.
৪২	৬৭	'ভেনাসের জন্ম' (চিত্র : ৫৮)-এর আলোকচিত্র—ঐ প্লেট-৫৩
৪৩	৭১	'The Life & Times of Michaelangelo', Paul Hamlyn, p. 24
৪৪	৭১	Do. Do. p. 51.
৪৫	৭২	'The Nude', Sri Kenneth Clarke.
৪৬	৭৩	Do. Do.
৪৭	৭৭	অজস্তা অপস্কা, নারায়ণ সান্যাল
৪৮	৮২	'উড়িষ্যার মন্দিরে বদ্ধকামমূর্তি', মানসী, ১০২১

নং	পৃষ্ঠা	সূত্র ও মন্তব্য
৪৯	৮২	Preface to 'Notes of Sanskrit Mss, 2nd Series', মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস, 1900
৫০	৮২	'Nepal', Prof. E. Levcoux, Vol. 1, Paris, p. 346
৫১	৮২	'Introduction to Buddhist Eroticism', by Prof. B. Bhattacharji, Ox. U. P., Vide Chapter : 'Influence of Buddhist Tantrism on Hinduism.'
৫২	৮৩	'The Golden Lotus', Vol. II, translated by Clemant Egerton, from original Chinese by Chin Ping Mei, p. 293.
৫৩	৮৪	'Erotic Colour' Prints of the Ming Period' with an essay on 'Chinese Sex-life from Han to Ch'ing Dynasty' 3rd Vol, by Gullik. R, H. Van, 1951.
৫৪	৮৪	'Science & Civilization of China', by Prof. J. Needham, Camb, U. P. Vol 1, 1954 & Vol. II, 1958.
৫৫	৮৫	'Tantrayana Art'—An Album', edited by Prof. S. Saraswati, Asiatic. Soc. 1978
৫৬	৮৫	'Art of Indian Asia', Zimmer, Vol. 1, Plates 610 & 611
৫৭	৮৬	'Through Forbidden Tiber', by H. Foreman.
৫৮	৮৮	Preface to 'The Koka Sastra', by Alex Comfort, written dy W. G. Archer, Tandem, London. p. 24
৫৯	৮৯	'Anangaranga', by Kalyanmalla
৬০	৮৯	Ibid
৬১	৮৯	Ibid,
৬২	১০৭	মেঘদূতম্, কালিদাস
৬৩	১০৮	'History of Coinage of the Chandella Dynasty', by V. Smith, Indian Antiquary (May 1908), p. 137,
৬৪	১০৮	প্রবোধচন্দ্রোদয়, কৃষ্ণমিহ
৬৫	১০৮	'মিথুনাচার ও ভারতীয় ভাস্কর্য',-নারায়ণ সান্যাল, 'প্রমা', এপ্রিল 1979, p. 17-38.
৬৬	১০৮	পদবিভাগ, 'প্রমা', জুলাই, 1979, শ্রীঅসীমকুমার মিহ,
৬৭	১০৯	'Yasantikam & Indian Culture', by K. Tandiques, Sholanpur, 1949
৬৮	১০৯	'Desopadesa & Narmamala of Khemendra', by M. K. Shastri, Kasmera Series of Text & Studies, 1923, p. 24-25.
৬৯	১০৯	'Kaulajnana-nirmaya & Some Minor Texts' of the School of Matsyendranath, Cal. Sans. Soc., 1934, p. 27

নং	পৃষ্ঠা	সূত্র ও মন্তব্য
৭০	১০৯	'The Historical Background of the Temples of Khajuraho' by Herman Goetz, Rooparekha, Vol. XXXVII, 1961, p. 60.
৭১	১১০	Article by Dr. M. R. Anand in Marg, Khajuraho Special Number.
৭২	১১০	বৃহদারণ্যক উপনিষদ ॥ ১।৪।৩ ॥
৭৩	১১১	ঐ ॥ ১।৪।৪ ॥
৭৪	১১১	"Of Kamakala" by Dr. M. A. Anand, Marg, June 57
৭৫	১১২	বৈবাহিকপর্বাদ্যায়। ৩৪। আদিপর্ব, শ্লোক ১৪-১৫ ॥ মহাভারত
৭৬	১১২	ঐ
৭৭	১১২	'Of Kamakala', by Dr. Mulakraj Anand.
৭৮	১ ৩	কামশাস্ত্র. বাৎস্যায়ন ৩।২।৮০
৭৯	১১৩	ঐ ৩।২।৮১.
৮০	১১৪	ঐ ৬।৪।৪৩
৮১	১১৫	Of Kamakala, by M. R. Anand.
৮২	১১৬	Erotic Sculptures of Khajuraho' by Kanwar Lal, Asia Press, Delhi 1970.
৮৩	১১৭	রবীন্দ্রনাথ
৮৪	১২৪	Marg.
৮৫	১২৪	'The Tender Moment' by Dr. M. R. Anand, Marg 1968. p. 54
৮৬	১২৫	'Marriage & Morals', by Bertrand Russel,

[৯৫ পৃষ্ঠার শেষ দিকে অনবধানতায় 'ভেরা তেরেঙ্কোভা'-র নাম উল্লেখ কবেছি। আমি বলতে চেয়েছিলাম 'নাদিরা কোমানোচি'-র কথা—যে মেয়েটি ১৯৭৬-এর মন্ট্রিল অলিম্পিকে জিম্নাস্টিকে অসাধ্যসাধন করেছিল।]

নারায়ণ সান্যাল

প্রবীণ প্রাকার্ষিক

